ব ঙ্কি ম চ ন্দ্র

'জ্যোতিষ্মান হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ।'

—বঙ্কিমচন্দ্র
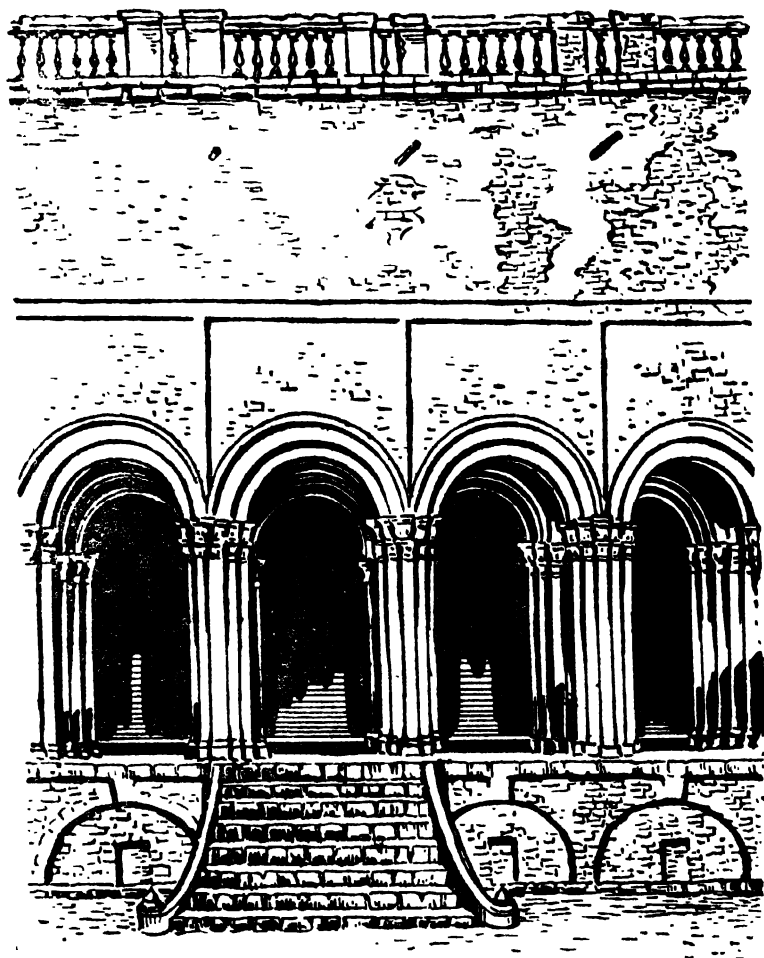
বঙ্কিমচন্দ্র

মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

Bankimchandra, A Bengali biography of
Bankim Chandra Chatterjee *By* : Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৩৬৫

প্রচ্ছদ : সুবীর সেন
আখ্যাপত্রে কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায়-বাটীর ভিতরের ঠাকুরদালান দেখান হয়েছে

প্রকাশক : শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩ এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯
মুদ্রাকর : শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা ৪

অশ্রুতর্পণ ॥

সর্বগুণের আধার, আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র,

অধ্যাপক ত্রিযুগনারায়ণ বাগচির

স্মরণে—

In memory a constant thought,
In heart a silent sorrow.

*

কালের সায়রে বুঝি তুমি ফুটেছিলে
অমৃত-পরাগ-ভরা মর্ত্য-শতদল !—
আপন আবেগে তাই আপনি ঝরিলে।

Bankim Chandra Chatterjee, Obitt 1894

The tears fall first, O mother, on its bloom,
O white-armed mother, like honey fall thy tears ;
Yet even their sweetness can no more relume
The golden light, the fragrance heaven rears,
The fragrance and the light for ever shed
Upon his lips immortal who is dead.

—*Sri Aurobindo*

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি'
নিষ্ফলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি' উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।*

—রবীন্দ্রনাথ

* বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে সাহিত্যসম্রাটের স্মৃতির উদ্দেশে কবির প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্কিমচন্দ্র।

বাঙালীর হৃদয়ে এই নামটি সঙ্গীতের ঝঙ্কার তোলে কেন?

রামমোহনোত্তর যুগের বাঙলায় সর্ববিধ চিন্তাক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র। রামমোহনের পর তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালীর তথা ভারতীয় মনঃপ্রকৃতিতে মানুষের জীবনকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তিনিই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তৈরি করেছেন আধুনিক বাঙালীর মন। জীবন-চেতনায় বঙ্কিম-প্রতিভার চিরন্তন প্রেরণা অনস্বীকার্য। কবি, পণ্ডিত, নব সৃষ্টি-কুশল শিল্পী, বিদগ্ধ দার্শনিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বদেশপ্রেমিক ও সমাজ সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর প্রাণ, তার প্রাণের উৎস। এক প্রমত্তযুগে উদ্‌ভ্রান্ত বাঙালীকে সাহিত্যে, জীবনে ও সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্য তিনি যে-সব নির্দেশ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রেখে গিয়েছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন এবং সম্পূর্ণ অনুশীলন আমরা আজ পর্যন্ত করে উঠতে পেরেছি কিনা তা বিচার্য।

বঙ্কিম-প্রতিভার উত্তর প্রবাহ উনবিংশ শতাব্দী পার হয়ে বিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে—এমনি বইবে চিরকাল। মুখ্যত এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বররুচি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও প্রতিভার একটা ইতিহাস-সম্মত আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে।

৯০ বাগুইআটি রোড
দমদম, কলিকাতা-২৮
আগস্ট, ১৯৬৫

মণি বাগচি

॥ 'জীবনী-জিজ্ঞাসা' পর্যায়ের গ্রন্থসমূহ ॥

মণি বাগচি প্রণীত

রামমোহন * মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ * মাইকেল

কেশবচন্দ্র * রমেশচন্দ্র * রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র * সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শিক্ষাগুরু আশুতোষ

এই পর্যায়ের পরবর্তী গ্রন্থ

নমিতা চক্রবর্তী ॥ বিদ্যাসাগর

*

॥ জীবনী-সাহিত্যে 'জিজ্ঞাসা'র নূতন পরিকল্পনা ॥

জীবনীশতক

প্লেটো থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শতজনের জীবনী ও জীবনাদর্শ-সম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থের লেখক মণি বাগচি। বাঙলা তথা ভারতীয় যে কোনো ভাষায় এইজাতীয় পুস্তকের পরিকল্পনা এই প্রথম।

॥ এক ॥

বঙ্কিমচন্দ্র মহাজন।

মহাজন গুরু।

গুরু পিতৃতুল্য।

বাঙালীর সর্বকালের সেই সাহিত্যগুরুকে প্রণাম করে তাঁর চরিতানুশীলনে প্রবৃত্ত হলাম।

প্রতিভার বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বারো বছর পরে এক স্মৃতিসভায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন : 'বার বৎসর অতীত হইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্যামাঙ্গিনী জননীর অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতদিনে আমরা তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কোনোরূপ আয়োজন আবশ্যক বোধ করি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি যে এতদিন জাগে নাই, তাহা আমাদিগের অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক।'* এর দশ বছর পরে বিপিনচন্দ্র পাল লিখলেন : 'এ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নাই।'

এইরকম আক্ষেপ আরো অনেকেই করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সময় থেকে আজ পর্যন্ত খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিকের কণ্ঠে এই আক্ষেপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবি এবং বিদগ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কণ্ঠে। তাঁর 'বঙ্কিম-বরণ' গ্রন্থে মোহিতলাল লিখেছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জীবনচরিত আজও লিখিত হয় নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান নাই।' দুঃখের বিষয় এবং লজ্জারও বিষয় এই যে, সাহিত্য-সম্রাটের মৃত্যুর সত্তর বছর পরেও এই কলঙ্ক আরো

* চরিত-কথা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

গাঢ় হয়ে উঠেছে; এখনো পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একখানি প্রকৃত জীবন-চরিত—যে জীবনচরিতকে আমরা ইংরেজী রীতি অনুসারে objective and truthful biography বলতে পারি, লেখা হয় নি।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, বঙ্কিম-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয় এবং এ কথাও সত্য যে, রমেশচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বাঙলাসাহিত্যের খ্যাতনামাদের অনেকেই সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কিছু-না-কিছু আলোচনা করেছেন কেউ কেউ তাঁর জীবনের খণ্ড-চিত্রও এঁকেছেন, কিন্তু বড়োই আশ্চর্যের কথা যে তাঁদের মধ্যে কেউই বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লিখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। আশ্চর্যের কথা তো বটেই, এমন কি এটা একটা মস্ত বড়ো রহস্যের বিষয় হয়ে আছে যে, বাঙলাভাষার যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার, তাঁর জীবনের কথা তাঁরই স্বজাতির কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে এ কাজটা করতে পারতেন, এমন কি বঙ্কিম-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো লেখকের দ্বারাও ঐ কাজটি সম্পন্ন হতে পারত। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিম-মণ্ডলীর মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং বয়সে ছোটো হলেও রাজকৃষ্ণ ছিলেন বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। কথিত আছে, তিনি নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই তাঁর সম্পর্কে একখানি জীবনচরিত লিখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের নিষেধ থাকায় তিনি আর এই কার্যে ব্রতী হন নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগেও এই কাজটি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাও হয় নি।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'To know Plato is to know Europe.' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও এই কথাটি প্রযোজ্য; তাঁকে জানা মানেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাকে জানা। জাতির ভাবজীবনের স্রষ্টা তিনি; তিনিই আমাদের জাতীয়তার প্রকৃত উদ্বোধক— এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত বা বিতর্কের অবকাশ নেই। এক কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট বাঙালীর ঋণ অপরি-শোধনীয়, অথচ তাঁর জীবনবৃত্তান্ত আমরা প্রায় কিছুই জানি না; যেটুকু জানি, তা যথেষ্ট নয়। বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কর্মজীবনের ইতিহাস চিত্তাকর্ষক হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তখনকার সাংস্কৃতিক,

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক ইতিহাস বিশেষভাবেই বঙ্কিম-জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি আঘাতসংঘাতময় সে জীবনের ইতিহাস।

সেই ইতিহাস আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে, সুষ্ঠুভাবে লেখা হল না। সত্যিই এ কলঙ্ক রাখবার স্থান নেই। 'এলোমেলো টুক্‌রা টুক্‌রা ঘটনার আভাস এর-ওর-তার স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের সাধ মিটে না।' এ অনুযোগও মিথ্যা নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাসাহিত্যে যে কয়জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রধানত পাঁচজনের প্রতিভায় বাঙলাসাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হয়েছে, বলা চলে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলাসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন-বিষয়ে এই পাঁচজনই নিজেদের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই পাঁচজনই বিবিধ উপায়ে স্বদেশীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্পাদন করে গিয়েছেন। বাঙলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে হলে, এঁদের প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, এঁদের জীবনকথা জানার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। এই পাঁচজন: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত; ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম চারজনের জীবনী লেখা হয়েছে, হয় নি শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের; অথচ তাঁরই প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রসন্ন আলোকেই বাঙালীর চিত্তলোক উদ্ভাসিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি আর সবচেয়ে সার্থকভাবে, উন্মোচিত হয়েছে সাহিত্যের এক নূতন দিগন্ত।

সাহিত্য-জগতের বহির্ভূত হলেও এই প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম উল্লেখ্য। তিনি কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমের সহপাঠী ও নিকট সমসাময়িক। বাঙলার নবজাগরণে কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও চরিত্র অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ এবং প্রামাণ্য জীবনচরিত, ইংরেজী ও বাংলায় রচিত হয়েছে। তাই তো আমাদের মনে কৌতূহল জাগে, কেন আজ পর্যন্ত একখানি তথ্যমূলক ও নির্ভরযোগ্য বঙ্কিম-জীবনী রচিত হল না? এই প্রশ্নটি দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙালীর সম্মুখে রয়েছে, কিন্তু আজো এর উত্তর মেলেনি। ঔপন্যাসিক থ্যাকারে তাঁর জীবনচরিত লিখতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও নাকি বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে বারো বছরের মধ্যে কেউ যেন তাঁর জীবনচরিত না লেখে।

এই নিষেধের কারণ জানা যায় না। থ্যাকারের অনুরোধ পালিত হয়নি; বঙ্কিমচন্দ্রেরও নয়। তাঁর মৃত্যুর আট বছরের মধ্যেই তাঁরই এক ভ্রাতুষ্পুত্র খুল্লতাতের একখানি জীবনবৃত্তান্ত লিখে ফেলেছিলেন। আমরা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্কিম-জীবনী'র কথাই বলছি। বইখানির প্রথম প্রকাশ বঙ্গাব্দ ১৩০৮, অর্থাৎ বঙ্কিমের মৃত্যুর আট বছর পরে। শচীশচন্দ্র বঙ্কিমের অগ্রজ শ্যামাচরণের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। বিপুলায়তন হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার সুধী-সমাজ কিন্তু এই বইখানি সম্পর্কে কখনো উচ্চ অভিমত প্রকাশ করেন নি। জীবনীকারের যে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারশক্তি থাকা প্রয়োজন, 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে তার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক বৃত্তান্ত, তাঁর শৈশব ও ছাত্রজীবনের পরিচয় এবং তাঁর সাহিত্যকৃতির যেসব কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার অনেকগুলিই উপযুক্ত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, বিশ্লেষণের তো বটেই।

বইখানির অন্য একটি ত্রুটিও আছে। শচীশবাবুর 'বঙ্কিম-জীবনী' বঙ্কিমচন্দ্রের বহিরঙ্গ জীবনের প্রকাশমাত্র। এর মধ্যে তাঁর অন্তর্জীবনের পরিচয় অনুপস্থিত। আমাদের মনে রাখতে হবে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজীবনের যে উৎকণ্ঠা তাহা ভাবুকের ভাবসাধনার মত নহে। জীবনের একটি গূঢ় গভীর উপলব্ধি তাঁহার সকল চিন্তা, সকল কল্পনা আচ্ছন্ন করিয়া আছে।' কোথায়, কিভাবে কোন্ বয়সে ইহা অঙ্কুরিত হয়েছিল, 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে তা জানবার উপায় নেই। মনে রাখতে হবে, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও মনীষী—এই জাতিরই প্রাণমন ও দেহগত সংস্কার এবং সাধারণ মানবধর্ম, এই সকলকে তাঁহার দিব্যদৃষ্টি দ্বারা একই ভাব-সত্যের অঙ্গীভূত করিয়া আগত ও অনাগত যুগের একটা সাধনপন্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন।' 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে এই প্রতিভাকে যথাযথভাবে তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ করা হয় নি, বিচার করা তো দূরের কথা। আরো একটি ত্রুটি আছে। বঙ্কিম-প্রতিভার সঙ্গে বঙ্কিম-চরিত্রও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। প্রতিভার সঙ্গে পৌরুষের মিলন যাঁর জীবনে ঘটেছিল, সেই ব্যক্তির জীবনচরিতে চরিত্রানুশীলন না থাকা অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে আর একখানি বইয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

A few Sayings and Opinions of Bankimchandra, খুব বড়ো বই নয়; ১৯০৮ সনে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পরে এটি হুগলী থেকে প্রকাশিত হয়। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং হুগলী কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। সম্পর্কে ইনি বঙ্কিমের ভাগিনেয়, সাক্ষাৎ ভাগিনেয় নন, কেন না যাদবচন্দ্রের কোনো মেয়ে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবনেই তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলীর হাকিম, তখনো তিনি কিছুকাল তাঁর মাতুলের সান্নিধ্যে ছিলেন বলে জানা যায়। কৈলাসচন্দ্রের বইতে বঙ্কিমের কর্মজীবনের বৃত্তান্ত কিছু পাওয়া যায়, তবে বিশেষ ভাবে সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর অভিমতগুলিই এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শচীশচন্দ্র এই বই থেকে কিছু কিছু উপকরণ গ্রহণ করলেও কোথাও তিনি বইখানির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

এরপর উল্লেখযোগ্য আর দুখানি বই আছে, যথা—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' এবং অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র'। প্রথমখানিতে বঙ্কিম-জীবনের বহু প্রামাণ্য তথ্য আছে যা তাঁর জীবনী-কারেরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন। এই গ্রন্থে যাঁদের রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁদের অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে জানতেন। অক্ষয় দত্তগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' ১৯২০ সনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর সুদীর্ঘ-কাল পরে তাঁর সম্পর্কে ইহাই বোধ হয় প্রথম বিস্তারিত আলোচনামূলক বই।

এরপর আছে বঙ্কিম-স্মৃতিকথা। তাঁর সমকালীনদের মধ্যে অনেকেই এর লেখক। বঙ্কিমস্মৃতি-লেখকদের মধ্যে আমরা যাঁদের পাই তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য; যথা,—সঞ্জীবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কালীনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথ। এঁদের প্রত্যেকের রচনাই নির্ভরশীল, তবে এইসব খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত থেকে একটি সমগ্র মানবচরিত্র কল্পনা করা, বা রচনা করা অল্প লোকের সাধ্যায়ত্ত। সকলেই জানেন, আত্মীয় সম্বন্ধেও আত্মীয়ের ভ্রম হয় এবং বন্ধুকেও বন্ধু অনেক বিষয়ে বিপরীতভাবে বুঝে থাকেন। অসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে

জানা আরো কঠিন; দূর থেকে এবং দূর অতীত থেকে তাঁর যথার্থ প্রতিকৃতি নির্মাণ বহুল পরিমাণে কাল্পনিক হতে বাধ্য। প্রমাণে এবং অনুমানে মিশ্রিত করে একই লোকের এত বিভিন্ন রকমের মূর্তি গড়ে তোলা যায় যে সেগুলির মধ্যে কোন্‌টা মূলের অনুরূপ তা প্রকৃতিভেদে ভিন্ন লোক ভিন্নভাবে বিশ্বাস করেন। সুখের বিষয়, বঙ্কিমস্মৃতি-প্রসঙ্গের লেখকদের কোথাও অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি, তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁদের স্ব স্ব স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বঙ্কিম-চরিত্রের উপাদান হিসাবে এগুলি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনী রচনার পক্ষে আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান তাঁর চিঠিপত্র। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের পত্রাবলী থেকে আমরা তাঁদের প্রত্যেকের জীবন সম্পর্কে যেমন বহু তথ্য অবগত হই, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ঠিক তেমন কথা বলা চলে না। কারণ তাঁর প্রকাশিত পত্রাবলীর সংখ্যা খুবই সামান্য। একান্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধব ব্যতীত তিনি কারো সঙ্গে বড়ো একটা পত্রালাপ করতেন বলে মনে হয় না এবং সে সব চিঠির সংখ্যাও কম। তথাপি বঙ্কিম-জীবনানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়ে অবধি আমার মনে হয়েছে, তাঁর সমগ্র পত্রাবলী আজো সংগৃহীত হয় নি।

শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁর জীবনের কাহিনী লিখবেন মনস্থ করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে শেষ জীবনে তিনি ইংরেজীতে তাঁর আত্মচরিতের একটি outline বা ছক তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধু 'পজিটিভিষ্ট' যোগেন ঘোষকে সেটি একদিন দেখিয়েছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কাগজ-পত্রের মধ্যে সেটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাটি আমি হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের মুখে শুনেছি এবং তিনিও তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের একস্থলে এটি উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি মিথ্যা বা অনুমান নাও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে যে-কথা বলেছিলেন তা স্মর্তব্য। জীবনী লেখার বিষয়ে শ্রীশচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে একদিন বলেছিলেন:

'আমার জীবনে অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। একজনের

প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম-প্রমাদ, তিনি জানেন আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ। সকল কথা বলিলে লোকে ভাবিবে, কি-যে-কি-এক-রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হইয়াছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী; কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি। নীতিশিক্ষা কখন হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না।'

বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার এই যে অকপট স্বীকৃতি, এরই সূত্র ধরে আমরা তাঁর জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারি। এই সঙ্গে বঙ্কিমের সেই অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসাও তাঁর জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, যখন তাঁর বয়স অতি তরুণ, তখন থেকেই তাঁর মনে জেগেছে এই বিচিত্র প্রশ্ন: 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ-জন্য অনেক ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক শিখিয়াছি; অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন-জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।'

এই প্রাণপাত পরিশ্রমের ইতিহাসই বঙ্কিম-জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। তাঁর এই জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিত হয়ে আছে তাঁর স্বজাতির কল্যাণচিন্তা এবং বঙ্কিমের জীবনব্যাপী যে সারস্বত সাধনা, তাঁর যতকিছু ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম—সে সবই তো একমাত্র তাঁর স্বজাতির কল্যাণচিন্তায়

নিয়োজিত হয়েছিল। সুতরাং বঙ্কিমের প্রতি আমাদের যে একটি কর্তব্য আছে, তাঁর সম্পর্কে একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা করা যে বিশেষ প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনীয় কর্তব্যপালনে আমরা এতকাল সচেষ্ট হইনি। রামেন্দ্রসুন্দরের অনুযোগের তাৎপর্য ইহাই।

প্লেটো সম্পর্কে এমার্সন লিখেছেন; 'Great geniuses have the shortest biographies...They live in their writings.' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও এই উক্তি প্রযোজ্য। তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর জীবনেতিহাসের উপাদান খুঁজতে হবে। কিন্তু উপাদানের কথা যেমন ভাবতে হবে, তেমনি আমাদের বিবেচনা করতে হবে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁর চরিত্র ও প্রতিভাকে বুঝবার চেষ্টা করব। এইটাই মুখ্য। শেক্‌সপীয়রের জীবনীকার ওয়াল্টার র‍্যালে একটি সুন্দর কথা বলেছেন; 'Every age has its own difficulties in the appreciation of Shakespeare.' কথাটি সকল প্রতিভার পক্ষেই প্রযোজ্য। প্রতিভার বিচার সহজ কাজ নয় এবং এর ধারা যুগে যুগে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। এক যুগের ধারণা পরবর্তী যুগের সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নাও মিলতে পারে, কিন্তু যাঁরা সৃজনীশক্তি-সম্পন্ন প্রতিভা, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বকালেই স্বীকৃত।

বঙ্কিম-প্রতিভার উৎস যাঁরা সন্ধান করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে শেক্‌সপীয়র-প্রতিভার স্বীকৃতি তাঁর মৃত্যুর একশ বছর পরের কথা, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই তিনি শুধু একজন শক্তিশালী লেখক বলে নন, একজন প্রতিভাবান বলেও স্বীকৃত হয়েছিলেন। এর প্রমাণ স্বরূপ, ১৮৮৭ সনে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল:

'Babu Bankim Chandra Chatterji is the first Bengali author of the day. He is now a great power, a great educating power and we all take leave to doubt whether

he or our schools and colleges shape modern Bengali childhood and youth more effectively and decisively.... He is the man of most national importance in the country just now.'

একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত এই মন্তব্যটি বিশেষ-ভাবেই আমাদের প্রণিধানযোগ্য। দেখা যাচ্ছে, তাঁর জীবিতকালেই বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বলা হয়নি, তাঁকেই 'The man of most national importance' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ স্বীকৃতি সমকালীন বাঙলার বিদগ্ধ সমাজেরই স্বীকৃতি ছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ে শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম, এবং কোনো কোনো বিষয়ে প্রধানতম ব্যক্তি বলেই খ্যাত ছিলেন। এ খ্যাতি কেবলমাত্র একজন ঔপন্যাসিকের খ্যাতি নয়, একজন যথার্থ লোকশিক্ষকরূপেই তিনি তৎকালীন বাঙালীসমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, দুই-ই অর্জন করেছিলেন।

এই বক্তব্যটির সূত্র ধরেই আমরা বঙ্কিম-প্রতিভার উৎস-সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে পারি, কিন্তু তৎপূর্বে যে যুগের প্রেক্ষাপটে সেই দেবদত্ত প্রতিভার উদ্ভাসন হয়েছিল, সে যুগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এ আলোচনা অনেকেই করেছেন এবং এই লেখকও অন্যত্র করেছেন, এখানে তাই বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। একদা যাঁর 'নবীনা প্রতিভা' উনিশ শতকের বাঙলার মানসলোক এক নূতন বিভায় অনুরঞ্জিত করে দিয়েছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের সূতিকাগৃহে প্রথম চোখ মেলেছিলেন, তা ছিল একটা রীতিমত বিপর্যয় বা intellectual ferment-এর যুগ। কোনো প্রতিভাকেই তাঁর যুগ থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, তেমনি তাঁর নিকটবর্তী কালের অন্যান্য মনীষীদের থেকেও তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা উচিত নয়।

বঙ্কিমের জন্মকাল ১৮৩৮ এবং যখন তিনি ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ শেষ হয়ে আরো আটটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এযাবৎকাল বঙ্কিমচন্দ্র শহর কলিকাতার নূতন

ভাব-বন্যা থেকে দূরেই ছিলেন, এর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তিনি আসেন নি, কিন্তু এর উত্তাপ তিনি অনুভব করেছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর থেকে কলিকাতায় নবযুগের যে শঙ্খধ্বনি শোনা গিয়েছিল, তার প্রতিধ্বনি নিশ্চয়ই কাঁটালপাড়া, মেদিনীপুর বা হুগলী কলেজে পৌছয় নি। নবজাগৃতির সেই উষাকালে আমরা দেখেছি, হিন্দুকলেজীয় মনোভাব-সঞ্জাত (যে মনোভাবের প্রত্যক্ষ স্রষ্টা ছিলেন ডি'রোজিও আর পরোক্ষ স্রষ্টা ছিল ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা) স্বাধীন চিন্তার যে উত্তাল তরঙ্গ বাঙলার সমাজ-জীবনের দুই তট দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, তার মধ্যে আভাসিত হল 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর বিদ্রোহী সত্তা—তার বিরাট প্রাণ-চাঞ্চল্য।

কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর আদর্শ সেদিন বঙ্কিমের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। পুরাতন সব কিছুকে অস্বীকার করা অথবা নিজের পিতৃপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ প্রাচীন ঐতিহ্যকে নিছক প্রাচীনতার অপবাদ দিয়ে সরাসরি বর্জন করা পশ্চিমী সভ্যতা দ্বারা মোহ-গ্রস্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' এর এই আদর্শের মধ্যে তিনি গঠনমূলক কিছু দেখতে পাননি। তারপর বঙ্কিম যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন, তখন এই উত্তাল তরঙ্গের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়েছে দেখা যায়। পশ্চিমের সভ্যতার উগ্র-ছটায় একদিন যাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে কারো কারো তখন মোহমুক্তি ঘটেছে এবং তাঁরা যেন তখন কিছুটা আত্মস্থ হতে পেরেছেন, খুঁজে পেয়েছেন মানসিক ভারসাম্য। একটা উদ্দাম ঝড় এসেছিল, চলে গিয়েছে; কিন্তু পিছনে সে কি রেখে গিয়েছিল? সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা, আত্ম-অবিশ্বাস আর আত্ম-বিস্মৃতি। এরই মধ্যে থেকে গড়ে তুলতে হবে নূতন শৃঙ্খলা, নূতন জীবনচেতনা।

তখন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর সামনে একদিকে ছিল প্রচণ্ড অনুকরণ-প্রবৃত্তি—ইংরেজের অনুকরণ, ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণ। এই ইংরেজীয়ানা আমাদের দৃষ্টিকে সেদিন আবিল করে তুলেছিল। আর অন্যদিকে ছিল যুগ-যুগান্তর-সঞ্চিত সনাতনী মনোভাব ও সংরক্ষণশীলতা। এই দুইটি বিপরীত ধারার সমন্বয় সেদিন ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথেই বাঙালীর জাতীয় জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম,

এমন মানুষ তখন বাঙলা দেশে দুজনই ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র যাঁরা প্রায় পাঁচ মাসের ব্যবধানে একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ-জীবনের প্রচলিত বিশৃঙ্খলা ও তার বিপর্যয় দূর করে সমাজ, ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতন বনিয়াদ স্থাপন করার সময় তখন এসে গিয়েছে। এই প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যে যে কয়জন সেদিন তাঁদের চিন্তা ও কর্ম একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াসই ছিল সর্বাধিক এবং দূরপ্রসারী। সেদিনকার বাঙলার উচ্ছৃঙ্খল ভাববিপ্লবের স্রোতোমুখ এই দুই মনীষী ও চিন্তানায়ক তাঁদের স্ব স্ব চিন্তা ও কর্ম দ্বারা কিভাবে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই ইতিহাস আজো সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়নি। বঙ্কিম বেছে নিলেন সাহিত্যের পথ, কেশবচন্দ্র ধর্মসংস্কারের। একজন ভাবুক, অপর জন কর্মী। সাহিত্যই ছিল বঙ্কিমের প্রকৃত ক্ষেত্র এবং এরই মাধ্যমে তিনি যেন নবযুগের দ্বারোন্মোচন করে গিয়েছেন, পরবর্তী কালে বাঙালীর মানসিক রূপান্তর সাধনে তার মূল্য কম ছিল না। সেদিনকার বাঙলার অন্যতম চিন্তানায়ক-রূপে বঙ্কিমের কর্মপ্রয়াস আজো অতুলনীয় হয়ে আছে। অতুলনীয় এবং অবিস্মরণীয়।

বঙ্কিম-প্রতিভার উৎস কি ?

স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতি।

তাঁর জীবনেতিহাস আলোচনা করলে তাঁর প্রতিভার প্রধানত এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যথা: (১) তিনি পুরাদস্তুর বাঙালী ও হিন্দু থেকে বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তির আলোকে স্বদেশের ও স্বজাতির চিরন্তনী সাধনাকে পরীক্ষা করে গিয়েছিলেন; (২) তিনি স্বজাতির গৌরবকাহিনী অনুশীলন করতে প্রীতি অনুভব করতেন; (৩) আপন সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা প্রভৃতি গভীর সহানুভূতির চোখে দেখে সেগুলি সংশোধন করতে ইচ্ছা করতেন; (৪) তিনি নিজেকে সমাজের একটি অখণ্ড অংশ জ্ঞান করে নিজের সর্ববিধ বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা নিজের ও পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণসাধনা আকাঙ্ক্ষা করতেন; (৫) তিনি জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং অনুশীলন করতে গৌরব বোধ

করতেন ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মুখ্যত স্বজাতিকে স্বদেশের ভাষায় শেখাতে চাইতেন এবং দেশীয় সমাজের মুক্তির পথ দেশীয় আদর্শের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে ভালবাসতেন এবং (৬) যুগপ্রবর্তক রামমোহন রায়ের মতন তিনি এই সুমহান ও আয়ুষ্মান্ হিন্দু সমাজকে অচল, মৃত বা মৃতপ্রায় মনে করতেন না।

বঙ্কিমকে জানবার ইচ্ছা হয় কেন ?

'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।'

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে ও প্রতিভায় সেই যুগের বাঙালী হিন্দুর আত্ম-জাগরণের প্রয়াসটা বিশেষভাবেই ফুটে উঠেছিল। জাতির সুপ্ত প্রাণ-শক্তি যেন এই যুগন্ধর ব্যক্তিকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করেছিল সেদিন। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী তথা ভারতীয় মন ও প্রকৃতিতে মানুষের জীবনকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এইটাই ছিল বঙ্কিম-প্রতিভার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রক্ষণশীল মনোভাব বা অতীতাশ্রয়ী চিন্তা তাঁকে যথেষ্ট প্রগতিশীল হতে দেয়নি—কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ ধারণা কিন্তু একান্তভাবেই ভ্রান্ত এবং একদেশদর্শী। যথাস্থানে আমরা এর বিশদ আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যে কালে বঙ্কিমের আবির্ভাব হয়েছিল সে কালে দেশের কেউ-ই ইতিহাসের পটপরিবর্ত্তন-জনিত যুগ-সঙ্কট সম্বন্ধে সচেতন হননি। সকলেই একটা নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্মাদনায় বিভোর হয়েছিলেন। অনেকের মনে তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ঐ বিলাতি আদর্শে জীবনযাত্রা, ধর্ম প্রভৃতি সংস্কার করে নিতে পারলেই অর্থাৎ ইংরেজদের আচার-ব্যবহার যতদূর সম্ভব অনুসরণ করলেই ইংরেজের মতন উন্নত জীবন যাপন করতে পারা যাবে। ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তনের ফলে এদেশে সেদিন যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার স্বরূপটা অনেকের কাছেই ঠিকমত উপলব্ধ হয়নি। সে সঙ্কট বিদেশী শাসন ঘটিত বিপদ নয়—এক ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন জাতির সঙ্গে জীবনযুদ্ধের

প্রতিযোগিতা। এই সমস্যা মাত্র একজন মানুষের চিত্তে বজ্রদীপ্তির মতন উদ্ভাসিত হয়েছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র।

আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা ছিল তীক্ষ্ণ আর অধীতবিদ্যা গভীর ও বিস্তৃত। কিন্তু তাঁর ছিল ঐশী প্রতিভা এবং সেই প্রতিভা-সঞ্জাত প্রজ্ঞার বলেই তিনি ঐ যুগ-সঙ্কটের বিষ-বীজটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শুধু প্রত্যক্ষ করা নয়। তার একমাত্র প্রতিষেধক কি, তাও চকিতে আবিষ্কার করেছিলেন। 'একদিকে তিনি দেশের সেই ক্ষীণপ্রাণ, জীবন-বেগবর্জিত, স্বার্থান্ধ তর্ককুশল, ক্ষুদ্রাশ্রয়, মৃত্যুভয়ভীত অথচ আধ্যাত্মিকতা-বিলাসী হতভাগ্য মনুষ্যগুলোকে দেখিয়াছিলেন, অপরদিকে তাঁহার ইতিহাস ও অভিলাষ, তাহার চরিত্র ও অভিসন্ধি, তাহার দুর্জয় লোভ ও অমিতশক্তির দৃপ্ত মূর্তিও দেখিয়াছিলেন; তিনি তাহার পাপ ও পৌরুষ, তাহার ধর্ম ও অধর্ম, তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন—ঐ ইংরেজের জীবনে ও চরিত্রে তিনি এই যুগের বিষ ও বিষঘ্ন ঔষধ দুইয়েরই আভাস পাইয়াছিলেন।'*

আত্মস্থ হয়ে তিনি সমগ্র সমস্যাটি বিচার করলেন। যুগ-সঙ্কটের জন্য তিনি ইংরেজকে দায়ী করলেন না। বঙ্কিমের ছিল প্রখর ইতিহাস-সচেতন মন ও দৃষ্টি (যে মন ও যে দৃষ্টি সে যুগে বিরল ছিল); সেইসঙ্গে বিচারবুদ্ধিও ছিল তেমনি তীক্ষ্ণ। তিনিই তাঁর কালে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজের সঙ্গে যা এসেছে তা আসতে বাধ্য; বহিরাগত এই যে আঘাত, এ ছিল একটা বৃহত্তর যুগ-পরিবর্তনের আঘাত এবং এরই ফলে দেশের মধ্যে দেখা দিয়েছে সঙ্কট। কিন্তু তিনি তাঁর দৃষ্টিতে সঙ্কটমোচনের উপায়ও ঐ বহিরাগত জাতির চরিত্রের মধ্যেই পেয়েছিলেন। যে জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র, সেই তাঁর অতুলনীয় স্বজাতিবাৎসল্য ছিল ইংরেজ-চরিত্র পর্যবেক্ষণেরই ফল। ইংরেজজাতির এই গুণটা বিশেষভাবেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভকাল থেকেই। কিন্তু তার ফলে বঙ্কিমের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হল না। তিনি তাঁর ভারতীয় সংস্কারে অনুভব করলেন যে ইংরেজের স্বজাতির প্রেম একটা passion বা চিত্তের প্রবল আবেগ মাত্র। তিনি তাকেই তাঁর স্বকীয় চিন্তায় শোধন করে নিয়ে তাকে একটা নূতন ব্যঞ্জনা

* বঙ্কিম-বরণ : মোহিতলাল

দিলেন—বললেন দেশবাৎসল্য ধর্ম। ‘সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না।’

এই বিচিত্র বোধই বঙ্কিম-প্রতিভার উৎস।

এবং ইহাই তাঁর সমগ্র জীবনের ধারণা-বিন্দু।

এই সত্যটিকে সামনে রেখেই বঙ্কিমের চরিত্র ও তাঁর জীবনের ইতিহাস আলোচনায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু তৎপূর্বে সেই আলোচনার দৃষ্টিকোণ বা approach সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হবে। এইটাই মুখ্য। জীবনীকারের উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে কার্লাইলের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করব। তাঁর প্রতিপাদ্য বীরপূজা বা মহামানব মতবাদ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে কিন্তু জীবনচরিতকারের দায়িত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তাই আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কার্লাইল বলেছেন, ‘The biographer really works in a personalised history. Whether his approach be historical or psychological, the biographer's great object is to recreate lives, to weigh souls and to catch that will-o'-the-wisp known as the humam spirit.’ ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের যে উদ্ভাসন, সাধারণ মানুষের কাছে যা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, জীবনীকারকে সেই জিনিসই ফুটিয়ে তুলতে হয় এবং যিনি যে পরিমাণে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত এই ব্যক্তিসত্তাকে তাঁর অনুভবের মধ্যে রেখে চরিতানুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তিনিই সেই পরিমাণে সার্থকতা লাভ করেন।

কার্লাইলের উক্তির সমর্থন পাই হেসকেথ পিয়ার্সনের একটি কথার মধ্যে। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের এই প্রখ্যাত জীবনীলেখক বলেছেন: ‘The biographer needs something more than the bare facts. He must seek out character and personality and then portray them with as much care as the artist uses at his ease. He must first prove and then reconstruct the subtle mysteries of human behaviour, apply light and shades, and touch up his insight with sympathy and understanding.’

কার্লাইল ও পিয়ার্সনের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি দুইটি স্মরণে রেখে যদি কেউ বঙ্কিম-চরিত রচনায় অগ্রসর হন, তাহলে সর্বাগ্রে তাঁকে বঙ্কিম-জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হবে; তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম রেখাগুলি শিল্পীর দক্ষ তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনাবলীর উপর বেশি রঙ না চাপিয়ে, বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ জীবনের রহস্যকেই উদ্ঘাটিত করতে হবে। কাহিনী অপেক্ষা তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে সহানুভূতি এবং যথাযথ বিচার-বিবেচনার সঙ্গে তাঁর কালের সমাজ-জীবনের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে হবে। এ কাজ নিঃসন্দেহে সুকঠিন। বিশিষ্ট মার্কিন কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গ আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনচরিত রচনায় এই রীতি গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আজ আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন; তাঁর এবং আমাদের মধ্যে এখন দুস্তর সময়ের ব্যবধান। এই ব্যবধান বা অন্তরালকে অতিক্রম করে তাঁর প্রতিভার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারলে বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বকে আমরা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারব। এই নিগূঢ় উপলব্ধি ভিন্ন বঙ্কিম-জীবনী রচনা বৃথা কিম্বা তাঁর জীবনব্যাপী ধ্যান-ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বিপুল এবং বিচিত্র। তাঁর সমগ্র রচনার কেন্দ্রস্থলে একটি অমূর্ত ভাবশরীরী বঙ্কিমকে পাওয়া যায়, যেখান থেকে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও জীবনবোধ তীব্র জ্যোতির মতন তাঁর চরিত্র ও প্রতিভার চারদিকে বিচিত্র শিখায়, বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে। শেক্সপীয়রের মতোই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির যাবতীয় রহস্য দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্কিম-চরিত লেখককে সেই দর্শনশিখরের সন্ধান নিতে হবে সকলের আগে।

বঙ্কিমের প্রতিভার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে তা 'আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যা কিছু অভাব ছিল, সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।' এবং এই থেকেই তিনি বাঙলাসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই একটা আদর্শ স্থাপন করে যেতে পেরেছেন। তাঁর জীবনী রচনাকালে তাঁর এই আদর্শ-সৃষ্টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। তাঁর সমকালীন ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, বাঙলাসাহিত্যের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তখন কোনো উচ্চ আদর্শ ছিল না,

আদর্শবোধও ছিল না। বঙ্কিম-প্রতিভার এই সংশয়াতীত মহত্বের কথা-ই তাঁর জীবনেতিহাসের বারো আনা অংশ। এইজন্যই রমেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলেছেন।

জাতির জীবনে সেদিন যুগান্তরের যে সমস্যা বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তারই সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র চিত্ত যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। জাতির জাতিত্ব বজায় রেখে এই নবযুগের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। বঙ্কিম-সাহিত্যে সেই লোকোত্তর সাধনার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। বঙ্কিম-প্রতিভা তাই প্রতিভামাত্র নয়—তদতিরিক্ত কিছু, যা সাহিত্যজগতে সচরাচর সুলভ নয়। 'তাঁহার বাণী একটা বড়ো চরিত্রের মতোই—যেমন সবল তেমনই বলিষ্ঠ, যেমনই সুবলয়িত তেমনই অসন্দিগ্ধ। বাণীর এমন দৃঢ়তা ও সুস্পষ্টতা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।'

এ জিনিস তিনি কোথায় পেয়েছিলেন?

প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্ব-সমাজ এবং পরোক্ষভাবে মানুষের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান—ইহাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সারস্বত-সাধনার নেপথ্য প্রেরণা। মোহিতলাল যথার্থই বলেছেন: 'জাতির সমষ্টিগত আত্মরক্ষার উদ্যম যেন সেই একটি মানুষের মধ্যে পূর্ণশক্তি ধারণ করিয়াছিল—তাই বঙ্কিম-প্রতিভাকে দৈবী-শক্তির স্ফুরণ বলিতে বাধা নাই। তাঁহার যত কিছু চিন্তা, তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম—একমাত্র স্বজাতির কল্যাণচিন্তাতেই সার্থক হইয়াছে। আত্মভাব বা আত্মচিন্তার প্রচার-চেষ্টা তাঁহার মধ্যে অনুপস্থিত। স্বজাতি, স্ব-সমাজ ও স্বদেশ—এই তিনে এক বা একে তিন ভিন্ন তাঁহার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না।'

এই দৃষ্টিকোণ ভিন্ন বঙ্কিম চরিত রচনা নিষ্ফল।

আদর্শবাদী বঙ্কিমকে সন্ধান করতে হবে তাঁর বিপুল রচনাবলীর মধ্যে, অন্যের লেখা স্মৃতিকথার মধ্যে নয়। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমের জীবন সাধারণ জীবন নয়। তাঁর জীবন একটা জাতির মর্মকথা ও সাধনার ইতিহাস। অরণ্যকে জানলে যেমন তার এক একটি গাছের কথা খুঁটিয়ে জানার প্রয়োজন হয় না, তেমনি কোনো দেশের একজন লোকোত্তর প্রতিভাকে জানতে পারলে

বা বুঝতে পারলে আর কিছুই জানার থাকে না। য়ুরোপে এমনি একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন ভলতেয়ার, যাঁর সম্পর্কে ভিক্টর হুগো বলেছেন : 'To name Voltaire is to characterize the entire eighteenth century.' কারণ তিনিই তাঁর দেশের পক্ষে একাধারে ছিলেন নবজাগরণ, সংস্কার-উত্তম ও অর্ধেক-বিপ্লব। উনিশ শতকের বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রও ঠিক তাই ছিলেন। সুতরাং সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের epitome বা সংক্ষিপ্তসার বঙ্কিমচন্দ্র—এই সত্যটি মনে রেখেই আমাদের বঙ্কিম-চরিত আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাববিলাসী ঔপন্যাসিক—এমন উক্তি কোনো কোনো সমালোচক তাঁর জীবনকালেই করেছিলেন। এ উক্তি কিন্তু আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কেন, সে বিচার যথাস্থানে করব, এখানে আপাতত শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, উপন্যাসই বঙ্কিমের সৃষ্টির ক্ষেত্র। এখানেই তিনি একজন খাঁটি শিল্পী। তাঁর শিল্পের উৎস জীবন-জিজ্ঞাসা—quest for life—এবং এই দিক দিয়ে বাঙলাসাহিত্যে তিনিই একক। বঙ্কিমের জীবনদৃষ্টি যাঁরা গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, জীবনকে উপেক্ষা করে কেবল তার খণ্ডরূপের রসোদ্ঘাটনই তাঁর সাহিত্যের ধর্ম ছিল না। জীবন ও জগতের যে রূপ তিনি আত্মগোচর করেছিলেন, তাই-ই বীজরূপে অঙ্কুরিত হয়ে 'সপল্লব শাখাকাণ্ডে একটি বৃহৎ সুঠাম বৃক্ষের আকার' ধারণ করেছিল। এই গাছের মূল কখনো মৃত্তিকার আশ্রয় ত্যাগ করেনি, এর শীর্ষদেশ কখনো শূন্য ব্যোমকে আকাঙ্ক্ষা করেনি। বঙ্কিমের সৃষ্ট জগৎ তাই যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি জীবন্ত। সে জগৎ সুন্দর, তার আছে একটা নীতি বা ধর্ম। সেই নীতির পূর্ণ লীলার বিগ্রহ যে-মানুষ—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ—তাকে অতিক্রম করে কিম্বা উপেক্ষা করে কোনো অলৌকিক স্বপ্ন বা পরলোকের চিন্তাকে শিল্পী বঙ্কিম প্রশ্রয় দেন নি কোনোদিন। তাই তো তিনি বাস্তব ও আদর্শের, কল্পনা ও প্রত্যক্ষের সমন্বয়-সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবনের যে রূঢ় ও বাস্তবরূপ মানুষকে চিরদিন উদ্‌ভ্রান্ত করেছে, সেই বিরাট দুর্জ্ঞেয় দুঃসহ বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ও শক্তি দুই-ই বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। বঙ্কিম-চরিত লেখককে এই তথ্যটিও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

দেশকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গের চেয়ে বড়ো মনে করতেন।

এই কথাটাই তিনি নানাভাবে সারাজীবন ধরে আমাদের বুঝিয়ে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—ইহাই তাঁর স্বজাতিকে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান। এ কথা সত্য যে তাঁর আবির্ভাবকালে দেশপ্রেম প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেষ্টন অনেকখানি সৃষ্ট হয়েছিল এবং বাঙলাসাহিত্যের ভিতর দিয়েও দেশপ্রেম বিস্তারলাভ করছিল। কিন্তু তার মধ্যে বিদেশী চিন্তার স্পর্শ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে পাবনীধারা ভগীরথের মতন সাধনা করে নিয়ে এলেন, তা একান্তভাবেই বাঙলার তথা ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য থেকেই উদ্গত। রামমোহনের মতোই তাঁর ছিল ঐতিহাসিক মন ও অনুসন্ধিৎসা—তাই তো তিনি তাঁর ধ্যানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন দেশকে। কেবলমাত্র intellectual বা মনীষাগত ধারণা নয়, কিম্বা ভৌগোলিক দৃষ্টি নয়, বঙ্কিমচন্দ্র দেশভূমিকে যথার্থ মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। এইখানেই বঙ্কিম-প্রতিভার মৌলিকত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর স্বজাতির জন্য এইটাই ছিল সাহিত্যগুরুর একমাত্র কাজ। তাঁর জীবনচরিত আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বদেশের জন্য তাঁর এই বৃহৎ অবদানের কথাও উল্লেখ করতে, বিচার করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝতে হলে তাঁর আবির্ভাব-কালকে বুঝতে হয়। যে রকম সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ শৈশব থেকে বর্ধিত হয়, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবেষ্টন ভবিষ্যতে তার জীবনের গতিপথকে নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে বঙ্কিমের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর চারদিকের আবেষ্টনটা কেমন ছিল। এ কথা ইতিহাস-সম্মত সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলা সমাজে একটা বড়ো রকমের বিপ্লব ঘটেছিল। এই বিপ্লবের জন্য বাঙলাদেশ অনেক আগেই প্রস্তুত ছিল। সমাজ একটি প্রাণবন্ত বস্তু। সমাজ স্বনিয়মেই ভাঙে-গড়ে, ওঠে-পড়ে। কোনো একজন মানুষকে সমাজের ভাঙা-গড়া প্রক্রিয়ার বিশ্বকর্মা বলে নির্দেশ করা চলে না। ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মবিরুদ্ধ। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন নিয়মিত হয় কি না, এ প্রসঙ্গ এখানে তুলব না। তবে এই কথাটা বলব যে কেবলমাত্র

লোকোত্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যেই সমাজের ভাঙা-গড়ার, ওঠা-পড়ার ক্রম বা পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের বিক্ষিপ্ত ভাবপুঞ্জ একজন না একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে আশ্রয় করবেই এবং ইতিহাসের প্রয়োজনে কখনো কখনো ইহা একাধিক প্রতিভার মধ্যে সংহত হয়ে ওঠে। তখন দেখা যায় যে, সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের রচনায় ও রসনায় ভাব পায়, ভাষা পায়। সমাজহৃদয়ের গুপ্তবেদনা তাঁদের হৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করে, সমাজদেহের মর্মস্থলের অলক্ষ্য ব্রণ তাঁদের নিপুণ বিবেচনাশক্তির কাছে ধরা পড়ে। এইরকম এক বা একাধিক ব্যক্তি দ্বারাই সমাজ তার কাজ করিয়ে নেয়, কাউকে দিয়ে বেশি কাজ করায়, কাউকে দিয়ে কম কাজ করায়। সুতরাং উনিশ শতকের বাঙলায় নবযুগের একমাত্র প্রবর্তক বলে কোনো একজনকে ঘোষণা করা চলে না। এই বিষয়ে দাবী সকলেরই আছে—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সমকালীন বাংলার খ্যাতনামাদের সকলকেই আমরা এই সম্মান দিতে পারি। রামমোহনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কেননা একটি প্রবল বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে এবং সেই সভ্যতার বাহক যে রাজশক্তি তার সংঘাতে এদেশে যে অন্তর্বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রথম মূর্ত প্রকাশ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়—তাঁর সময়ে আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় লোকই বা কে ছিলেন?

একটা কথা আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ শুনে আসছি—‘অচলায়তন সমাজ’। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এই কথাটির স্রষ্টা। কথাটি বিচার্য। সমাজ আসলে একটি organic বস্তু এবং যেহেতু তার মধ্যে সর্বদাই প্রাণ থাকে, প্রাণের স্পন্দন থাকে, সেই হেতু ইহা সর্বদাই সচল ও গতিময়। ইহা যদি সত্যই নিশ্চল হত, তাহলে মানবসভ্যতার ধারা কস্মিনকালেও প্রাগৈতিহাসিক যুগকে অতিক্রম করতে পারত না। স্থাণুত্ব সমাজের ধর্ম নয়, সজীবতাই ইহার প্রকৃতি। অবস্থানুসারে, পরিবেশ অনুসারে এই সজীবতার হ্রাস-বৃদ্ধি মাত্র পরিলক্ষিত হয়। তাই ইহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য যে সমাজে যখন নবযুগ আসে, তখন তা কখনো কেবলমাত্র একজনকে আশ্রয় করে সমাজের বাইরে থেকে হঠাৎ আসে না। ‘Unless something is involved within the invisible cells of the social organism, how something else can evolve out of it?’

শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তিটি বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত। সমাজের জাগরণ বা ক্রম-অভিব্যক্তির মূলে থাকে দুর্নিরীক্ষ্য যে প্রক্রিয়া, সেই এভল্যুশনকে (Evolution) মানতেই হবে। কোনো সমাজেরই কোনো প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উল্কা-পিণ্ডের মতন নক্ষত্রলোক থেকে ছুটে আসেন না। সমাজের অভ্যন্তর থেকেই তাঁরা উদ্ভুত হন, তাই তো সামাজিক বিক্ষিপ্ত ভাবপুঞ্জ একসময়ে তাঁদের মধ্যে সংহত হয়ে নূতন দিগন্ত রচনা করে।

তাই নবযুগ যখন আসে, তখন তা বাইরে থেকে কাউকে আশ্রয় করে আসে না, আসতে পারে না—তা প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মক্রমে সমাজ-মানসের ধর্ম, নীতি, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্রচিন্তা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সংস্কার-প্রয়াস ইত্যাদি সকল দিক থেকে ফুটে উঠতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস আলোচনা করবার সময় এই তথ্যটি আমাদের মনে রাখা দরকার। জাতীয় জীবনের নানা বিভাগেই তাঁর প্রতিভা ফলপ্রসূ হয়েছে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্, ধর্মপ্রচারক ও নীতিশিক্ষক। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে বঙ্কিমের স্থান উচ্চে—কত উঁচুতে তার সঠিক ধারণা আমরা বোধহয় আজো করে উঠতে পারি নি। এক ঘোরতর বিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করেও এবং তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থেকেও, তিনি হিন্দুসমাজের প্রাণের স্পন্দন যথার্থ অনুভব করতে পেরেছিলেন—যেমন পেরেছিলেন একদিন রামমোহন।

তাঁর জীবনে আমরা দেখি যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকেই রামমোহন হিন্দু-ধর্ম ও সমাজকে সমালোচনা করেছেন ও সংস্কৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। রামমোহনকে এক জায়গায় অত্যন্ত ভুল বোঝা হয় এবং অনেকসময়ে ভুল বোঝানো হয়। তাঁর জীবনেতিহাস আলোচনা করে আমরা কি দেখতে পাই? তিনি কি হিন্দুসমাজত্যাগী ছিলেন? না—তিনি কখনো হিন্দুসমাজ ত্যাগ করেন নি। তাঁর সময়কার প্রচলিত গোঁড়ামি, কুসংস্কার প্রভৃতি রোধ করার জন্য তিনি প্রচার করলেন অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ, স্থাপন করলেন ব্রহ্মসভা—কিন্তু কখনো নিজেকে হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন না। বিবেকানন্দ যখন রামমোহনকে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ নেতা বলে ঘোষণা করলেন, তার অনেক আগেই দেখা যায় দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ থেকে নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং মহর্ষি রাজাকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে তাঁকে একেবারে হিন্দুসমাজ থেকে আলাদা করে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের বেদীর ওপর স্থাপন করেছেন। এর ফল কিন্তু দেশের পক্ষে ভাল হয়নি। বিশাল হিন্দু-সমাজ যেমন একদিকে রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারল না, তেমনি দেখা যায় যে, যে নির্ভীক রামমোহন পুরোহিত-তন্ত্র ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যতখানি সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, ততখানি অভ্রান্ত সত্যদৃষ্টির প্রমাণও তিনি দিয়েছিলেন প্রতীকোপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, সেই রামমোহনের অনুগামী হয়েও দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাগণ এ বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে পারলেন না। মূর্তিপূজা ব্যতীত দার্শনিক মতের দিক থেকেও রামমোহনের সঙ্গে পরবর্তী ব্রাহ্মনেতাদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তথাপি এ কথ সত্য যে, রামমোহনের যুগ নিষ্ফলা যুগ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগেরই একটি উৎকৃষ্ট ফল, (যদিও রামমোহন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি) এবং আমার বিবেচনায়, তিনি তাঁর সমসাময়িক বাঙলার চিন্তাশীল হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেহের বিস্তার এবং মনের প্রসারের প্রত্যেকটি স্তরে হিন্দু ও বাঙালী ছিলেন।

যুগপ্রবর্তক রামমোহন স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ ছিলেন। 'তাঁহার কাছে সমস্যাগুলি সমস্ত মানুষের সমস্যারূপে উপস্থিত হইয়াছে, এবং বিশ্বমানবের তরফ হইতে সেই সমস্যা মিটাইবার আয়োজনও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে।' বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে বাঙলার এবং বাঙলাকে নিজের বলে জেনেছিলেন। বাঙলার যে অংশে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষও সেই অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের আপনার; বাঙালী যে অনুপাতে বিশ্বমানবের অংশ, বিশ্বমানবও ঠিক সেই অনুপাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়। বাঙালী এবং হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছিল মনের প্রসারতা আর দৃষ্টির স্বচ্ছতা। এইজন্যই তো যুগপ্রতিনিধিদের মধ্যে তিনিই প্রধানতম বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এবং এই কারণেই তো বাঙলার সর্বসাধারণের উপরে প্রভাব বিস্তারে তিনিই অগ্রবর্তী হতে পেরেছিলেন। এহেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংকীর্ণ হিন্দুত্বের অভিমানের অভিযোগ আদৌ বিচারসহ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মে, চিন্তায় ও জীবনচর্যায় যদি প্রাণের বিস্তারই না থাকবে তাহলে মিথ্যা হয়ে যেত

তাঁর জীবনের সৃষ্টিধর্মিতা। জাতির আত্মবিকাশের পথ রামমোহন উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার উজ্জীবন ও চিত্তমুক্তির সাধনায় রামমোহন-পরবর্তীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দানই বোধ হয় বেশি। কারণ তাঁর ছিল অভিনব জীবনদৃষ্টি। তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পূজারী। উনিশ শতকের নব-জাগরণকে তার ঈপ্সিত পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এইরকম একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাবের সেদিন বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙালী সমাজের, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের নিখুঁত চিত্র আছে রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে আর যোগীন্দ্র-নাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত গ্রন্থে। প্যারিচাঁদ মিত্রের রচনাতেও আমরা এর কিছু পরিচয় পাই। বাঙলাসাহিত্যের পাঠক মাত্রেই এগুলির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। কিন্তু তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উদ্দাম মানসিকতার যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আমরা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের রচনার মধ্যে পাই, তা সচরাচর পঠিত বা আলোচিত হয় না। প্রতাপচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সম-সাময়িক ছিলেন। আমার বিবেচনায় প্রতাপচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ আর সকলের বিশ্লেষণ থেকে একটু স্বতন্ত্র রকমের, হয়ত কিছুটা একদেশদর্শী, তথাপি তাঁর মতামত বিচার্য। তাঁর লেখা কেশব-জীবনীর* প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন :

'য়ুরোপীয় শিক্ষার সংস্পর্শেই 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মধ্যে একটি আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষিত হতে থাকে। পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাসে তাদের আর বিশ্বাস রইল না। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিমাপূজায় বিশ্বাসের লেশমাত্র রইল না। স্বধর্মে অনুরাগ নষ্ট হওয়ার অর্থ তার ধর্মবোধেরই আত্যন্তিক বিনষ্টি—ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণ এটা তখনো বুঝতে পারেননি। ইংরেজী শিক্ষিত যুবকেরা ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারের বন্ধন থেকে মুক্ত হল। কিন্তু ফলে হল কি ? সংশয় ও নৈতিক অনাচারের স্রোতে তারা গা ভাসিয়ে দিল। ...দুই-একটি যুবক ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন দ্বারা মৌলিক চিন্তার বিকাশ করতে পারে নি—তাদের হৃদয়ে কোনো গভীর ভাবের সঞ্চার করে নি। বরং বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্তির প্রবৃত্তি বেড়ে গিয়েছিল, যুবকগণ সংশয় দ্বারা আবিষ্ট হয়ে

* P. C. Mozoomdar : *The Life and Teachings of Keshab Chandra Sen*

পড়েছিলেন—তাদের চিত্ত থেকে নৈতিক বন্ধন খসে পড়ছিল।...সাহেবী খানা-পিনায় আসক্তি, পাশ্চাত্য সমাজের অসংযত আচার, সামাজিক নিয়মবন্ধনের উচ্ছেদ ও অতিরিক্ত মদ্যপান শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষণরূপে গণ্য হয়েছিল। চরিত্রদোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল।'

উদ্ধৃতি আর দীর্ঘ করে লাভ নেই। প্রতাপচন্দ্র এখানে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দোষের কথাই শুধু উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর যে একটি অন্য দিকও আছে সেটা তিনি বিচার করেন নি। পরবর্তী অধ্যায়ে এর উল্লেখ করব। হিন্দুকলেজ স্থাপিত হওয়ার দুই দশকের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু তরুণদের জীবনে যে বিপর্যয় এসেছিল তাকে denationalisation বলে কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন। শেক্সপীয়র বা মিলটন যাঁদের কণ্ঠস্থ ছিল তাঁরা মাতৃ-ভাষায় নিজেদের নামটা পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। কিন্তু সেদিন প্রথম বিপর্যয়ের সংঘাত জাতির জীবনে যে সমূহ ক্ষতি এনে দিয়েছিল তা হল চরিত্রের অবনতি। প্রতাপচন্দ্র স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন: 'Impurity of character among the educated became proverbial.' কিন্তু যুগবিপর্যয় আমাদের জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে নিঃশব্দে যে সর্বনাশ সাধন করে চলছিল তারই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তখনকার খ্রীস্টান পাদ্রিগণ। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যাঁকে বলা হয় 'The Prince of Hindu converts') যে নিছক ধর্মের তাগিদে তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্ম বর্জন করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেননি, সে কাহিনী জানা যায় জর্জ স্মিথের লেখা আলেকজাণ্ডার ডাফের জীবনচরিত থেকে।

বঙ্কিমের জন্মকালে বাঙলায়* যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, মুখ্যত তার ছিল দুইটি ধারা, যথা—রামমোহনী ধারা ও হিন্দুকলেজীয় ধারা। ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙালীর মনে যাতে তার প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ জন্মে, মেকলে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তার ওপর ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য, তার শক্তি ও সভ্যতা বাঙলার সমাজ-জীবনকে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। বাঙলাদেশে তখন যে মানসিক রূপান্তরের সূত্রপাত হয়েছিল (যাকে প্রতাপ-চন্দ্র 'নৈতিক বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেছেন।) তার সকল অংশ যে

ইংরেজের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি, তা নয়। দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় সভ্যতার সংঘাত এর জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী ছিল। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে তখন বাঙালী দেখেছে শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীকরূপে। সুতরাং এই সভ্যতার মোহ অতিক্রম করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। মোহগ্রস্ত হন নি শুধু রামমোহন, যিনি ইংরেজী শিক্ষাকে আবাহন করেছিলেন আর মোহগ্রস্ত হন নি বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি সেই শিক্ষা বিপুল পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন।

যাই হোক, বাংলার সমাজ-জীবনে এই সাংস্কৃতিক সংঘাতের ফল হয়েছিল সাংঘাতিক। এর সামাজিক কুফলের কথা প্রতাপচন্দ্র উল্লেখ করেছেন; সাহিত্যে এর প্রতিক্রিয়ার চিত্র পাওয়া যায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল-জীবনীতে। তিনি লিখেছেন: 'হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙলায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙলা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে বা থাকিতে পারে তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। সাধারণ দোকানদার ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ আছে—এইমাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্তকবির 'প্রভাকর' তখন বঙ্গসাহিত্যের একাংশে জ্যোতি দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্যশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। বাঙলা ভাষায় কথাবার্তা বলা এবং বাঙলায় পরস্পরকে পত্র লেখা অগৌরবকর বলিয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মিল।'

বাঙলার সমাজ-জীবনের এই পরিবেশেই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। এই সামাজিক পটভূমির কথা পরে আরো বলব। তাঁর জন্মের আগে থেকেই বাঙলায় একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়ে গিয়েছে—এঁরাই তখনকার ভদ্রলোকশ্রেণী। বঙ্কিম ছিলেন এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর উপর প্রগতিশীল বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব যেন ইতিহাসের নেপথ্যবিধানেই এসে গিয়েছিল। এই নেতৃত্বের সূচনা করে গিয়েছিলেন রামমোহন আর এই নেতৃত্বের পরিপূর্ণতা দেখা যায় রামমোহন-পরবর্তী যুগের বিভিন্ন যুগ-প্রতিনিধিদের কর্মপ্রয়াস ও চিন্তার মধ্যে। এই প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কারণ মাইকেলের পর একমাত্র তাঁরই মানসভূমি নূতন যুগের নূতন রসে নূতন বার্তায় সবচেয়ে বেশি করে অভিষিক্ত হয়েছিল।

॥ দুই ॥

তাঁর পিতৃপুরুষের পরিচয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়াকুলীনদিগের পূর্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায় বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।'

এই কাঁটালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি।

তিনি এই রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র। রামহরির পিতা রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কাঁটালপাড়ার ঘোষাল বাড়ির 'ঘর-জামাই' ছিলেন এবং চাটুয্যে-বংশের কাঁটালপাড়ায় বসবাস তাঁর সময় থেকেই আরম্ভ হয়। দেশমুখো গ্রাম কোন্নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। সূর্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর—বঙ্কিম-সাহিত্যে কোন্নগর নামটি এইভাবে অক্ষয় হয়ে আছে। কাঁটালপাড়ার খ্যাতি শুধু বঙ্কিমের জন্মভূমি বলে নয়। তাঁর জন্মের বহু আগে থেকেই গঙ্গাতীরস্থ এই অঞ্চলটি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই প্রসিদ্ধির মূলে ছিল এখানকার সন্নিকটবর্তী ভট্টপল্লী-অঞ্চলে সংস্কৃতচর্চা। কাঁটালপাড়ার প্রধান আকর্ষণ তখন রাধাবল্লভ আর এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার উৎসব। এই রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলরাম ব্রহ্মচারী নামে একজন বৈষ্ণবসাধক; ইনিই তাঁর অগ্রজ নারায়ণ ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে বিগ্রহটি লাভ করেছিলেন। নারায়ণ অথবা বলরাম, কারো কোনো স্থায়ী আস্তানা ছিল না এবং অগ্রজের মৃত্যুর পর বলরামকেও দীর্ঘকাল বিগ্রহকে ঝুলিতে নিয়ে দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত।

এ-কাহিনী নবাবী আমলের এবং নদীয়ার রাজা তখন কৃষ্ণচন্দ্র। কথিত আছে, নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে বলরাম ব্রহ্মচারী অবশেষে কাঁটালপাড়ায় এসে উপস্থিত হলেন এবং এইখানেই নবাব আলিবর্দির আদেশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারীকে কাঁটালপাড়ায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বিঘা জমি দান করেন। ব্রহ্মচারী হয়ত মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাব-সরকারে বিগ্রহ-স্থাপনের জন্য জমি প্রার্থনা করে থাকবেন। ইহা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, কেননা নবাবী আমলের বাঙলায় নবাবের কাছ থেকে দেবোত্তর কি ব্রহ্মোত্তর হিসাবে প্রাপ্ত জমিতে বহু স্থানে এইভাবে বহু হিন্দু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রহ্মচারীর জীবনকালে অবশ্য বিগ্রহের মন্দির নির্মিত হয়নি; শিষ্য রঘুদেব ঘোষালকে তিনি মৃত্যুর পূর্বে ঐ বিগ্রহ ও নবাব সরকার থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর জমি দিয়ে যান। বলে যান—'রঘুদেব, প্রথম যেদিন আমি এই কাঁটালপাড়ায় আসি তখন ঐ সাহাদের পুকুরে মাধবী গাছের তলায় রেখেছিলাম এই রাধাবল্লভ-বিগ্রহ। এ অতি জাগ্রত বিগ্রহ। তোমাকে আজ এই বিগ্রহ দান করলাম। তুমি একটি মন্দির তৈরি করে রাধাবল্লভকে সেই মন্দিরে স্থাপন করে এঁর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করো।'

রঘুদেব ঘোষাল তাই করেছিলেন।

রঘুদেবের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবসৈন্যের রসদদার ছিলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর যাবতীয় বিষয় একমাত্র দৌহিত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে যান। রাধাবল্লভের মন্দির ও বিগ্রহ এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাতামহের বিষয় পাওয়ার পর থেকেই কাঁটাল-পাড়ার চাটুয্যেরা কালক্রমে গণ্য-মান্য হয়ে উঠলেন। কাঁটালপাড়ার এই রাধাবল্লভ-বিগ্রহ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন:

'বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আমাদের বাড়ি হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটি ষ্টেসন হইতে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ী প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁহাদের বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্যভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে।...অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়।

রথখানি পিতলের, বেশ বড়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটি মেলা হয়।'

এই রথের মেলা ছিল কাঁটালপাড়ার প্রধান আকর্ষণ। তাঁর বাল্য ও শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র এই মেলা দেখে আনন্দ পেতেন; বঙ্কিম-সাহিত্যে তাই রথের মেলাও অক্ষয় হয়ে আছে 'রাধারাণী' গল্পে। গ্রাম-বাঙলার পরিচয় যাঁরা রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বাঙলা দেশে বর্ধিষ্ণু এমন একটি জনপদ ছিল না যেখানে একটি করে বিগ্রহ না থাকত। পারিবারিক বিগ্রহ হলেও, একেই কেন্দ্র করে গ্রামের ও গ্রামের আশেপাশের ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আবর্তিত হত। সমগ্র গ্রামটির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে একান্নবর্তীভাব প্রধানত গড়ে উঠত এইরকম একটি পারিবারিক বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই। যে মেলার কথা শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন, ঐ রকম মেলা সেকালের বিগ্রহ-অধ্যুষিত বাঙলার প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যেত। বারমাসে তের পার্বণ আর বছরে একবার করে মেলা—এর ভিতর দিয়ে গ্রাম-বাঙলার জীবন-প্রাচুর্য যেন উপচিয়ে পড়ত। রামমোহনের পিতৃপুরুষের ভিটায় বিগ্রহের পূজার সমারোহ ছিল এবং সেই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে মেলা বসত, পার্বণ হত। এই সংস্কারের মধ্যেই বর্ধিত হয়েছিলেন রাধানগরের রামমোহন, কাঁটালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র।

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'পরমারাধ্য' পিতা। তিনি 'তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, মহিমামণ্ডিত তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন।' যাদববাবুরা তিন ভাই—কাশীনাথ, যাদবচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ। অগ্রজ কাশীনাথ ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা যাদবচন্দ্র—কাঁটালপাড়ার চাটুয্যে বংশের এই দুজনই সর্বপ্রথম সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। দুজনেই নিমক-মহালের দারোগা ছিলেন; যাদবচন্দ্রের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে অতিবাহিত হয়েছিল। আঠার বছর বয়সে (১৮১৭ সনে) তিনি কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন এবং একাদিক্রমে বিয়াল্লিশ বছর চাকরি করার পর ১৮৫৭ সনে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভ করেছেন। অবসরকালে তাঁর পেনসন্ ছিল মাসিক দুইশত পঁচিশ টাকা।

অবসর গ্রহণের পরেও তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। সাতাশী বছর বয়সে যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। চাটুয্যে পরিবারে জয়নারায়ণের পর তাঁর মতন পরমায়ু আর কেউ পাননি। চাকরির একুশ বছর পরে পদোন্নতি হয় এবং তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মকালে যাদবচন্দ্র ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই কাঁটালপাড়ার চাটুয্যেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। চাকরি জীবনে সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী হিসাবে সরকারি মহলে যাদবচন্দ্রের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তাঁর পিতার এই গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পেয়েছিলেন। আর পেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব। যাদবচন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি ও রাশভারি মানুষ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মায়ের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর জীবনীকার শুধু উল্লেখ করেছেন, তিনি 'কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন।' বঙ্কিম-চন্দ্রের মায়ের স্বভাব খুব মিষ্ট ছিল ; তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছিল একটা স্বাভাবিক কারুণ্য ও মমতা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি কিন্তু পিতার প্রকৃতি অনুসারেই গড়ে উঠেছিল। মায়ের আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কোনো গুণই তিনি বা তাঁর কোনো সহোদরই লাভ করেননি। তাঁর জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব আদৌ ছিল না। তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উল্লেখ করেছেন। 'মা ছিলেন সেকেলের উপর আর একটু বেশী ; কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি।'

শিক্ষা যাদবচন্দ্রের কাছেও বিশেষ কিছু হয়নি, কারণ তিনি থাকতেন বিদেশে। যাদবচন্দ্রের চারিপুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। তাঁর চারিপুত্রই কৃতবিদ্য ও সাহিত্যরসিক ছিলেন এবং কর্মজীবনে সকলেই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাদবচন্দ্র স্বয়ং সুশিক্ষিত ছিলেন—ফার্সিতে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজীও অল্প-বিস্তর জানতেন। ইংরেজী শিখবার আগ্রহ তাঁর ছিল, কিন্তু সুযোগ হয়নি। নিজের জীবনে যে সাধ পূর্ণ হয়নি তা তিনি স্বীয় পুত্রদের জীবনে সফল করেছিলেন। তাঁর চারি পুত্রকেই তিনি ইংরেজী শিক্ষায় সুপণ্ডিত করে তুলেছিলেন, তবে এ বিষয়ে যাদবচন্দ্রের বিশেষ দৃষ্টি ছিল তাঁর তৃতীয় পুত্রের উপর। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-কালেই পিতার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তাঁর এই পুত্র থেকেই

বংশের নামযশ বৃদ্ধি পাবে আর এই পুত্রই একদিন স্বীয় প্রতিভার আলোকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

বঙ্গাব্দ ১২৪৫, ১৩ই আষাঢ়।

ইংরেজী ১৮৩৮ সন ২৬শে জুন।

ঐ দিন, রাত ন'টার সময়ে কাঁটালপাড়ার চাটুয্যেদের অন্দর মহলে হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। আষাঢ় মাসের রাত হলেও 'আকাশ তখন নির্মল ও মেঘশূন্য ছিল।' শঙ্খধ্বনি শুনে প্রতিবেশিদের দুই-একজন বর্ষিয়সী মহিলা ছুটে এলেন। চাটুয্যে-বাড়ির মধ্যমা গৃহিণী আসন্ন-প্রসবা ছিলেন, এ তাঁদের জানা ছিল। সূতিকাগারের কাছে এসে শুনলেন মেজকর্তার আর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। চাটুয্যে পরিবারে যাদববাবুকে তখন মেজকর্তা বলা হত। তখন রাধাবল্লভের নাটমন্দিরের কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য সবেমাত্র ঠাকুরকে 'শয়ান' দিয়েছেন। বাড়ি থেকে একজন ছুটে এলেন নির্মাল্যের জন্য। বহুদিন থেকেই এ বাড়িতে এ প্রথা চলে আসছিল—নবজাতক ও প্রসূতিকে সর্বাগ্রে রাধাবল্লভের নির্মাল্য স্পর্শ করাতে হবে।

তখন পুরমহিলা ও প্রতিবেশিনিদের কলরবে চাটুয্যেদের অন্দরমহল মুখরিত হয়ে উঠেছে। সকলের মুখেই শুধু একটি কথা—চাঁদের মতন ফুটফুটে ছেলে হয়েছে, ছেলের খুব সুলক্ষণ। বর্ষিয়সীদের মধ্যে একজন বললেন—মেজকর্তার বরাত ভাল, পরপর তিনটিই ছেলে। সূতিকাগৃহের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একজন দাইকে জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁগা, পো-পোয়াতি আছে ভালো? ভিতর থেকে উত্তর এলো—নবজাতকের অস্ফুট মৃদু কাকলি—উঁঞা, উঁঞা। বাইরে থেকে নবজাত শিশুর উদ্দেশে উপবীত-হাতে যাদবের মধ্যম খুল্লতাত বৃদ্ধ জয়নারায়ণ জানালেন নিঃশব্দ আশীর্বাদ। কাঁটালপাড়ায় সেদিন আষাঢ়ের মেঘমুক্ত নির্মল রাত্রিতে যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্ররূপে যে ক্ষণজন্মা শিশুটি জন্মগ্রহণ করল এবং যার জন্মক্ষণে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছিল, তখন কে জানত, ইতিহাসেরই এক মাহেন্দ্রক্ষণে উনিশ শতকের বাঙলার আঙিনায় আবির্ভূত হলেন একটি অদ্বিতীয় প্রতিভা?

বঙ্কিমের জন্মের পূর্বে বাংলার বিভিন্ন স্থানে আর যে-সব ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে যাঁদের মনীষার আলোকে উনিশ শতকীয় নবজাগরণ সার্থক হয়েছে নানা দিক থেকে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য হলেন এই কয়জন, যথা—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ। আর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের বৎসরে আমরা যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল। নবযুগের বাংলার ইতিহাসে এঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ম ও চিন্তা দ্বারা নিঃসন্দেহে এক-একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে গিয়েছেন।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমি রচিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যেই। এই সময়টাকে ঐতিহাসিকগণ বাঙলার নবজাগরণের উদ্যোগপর্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। ছোটো-বড়ো অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে এই পঁচিশ-ত্রিশ বছর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সেই যুগের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকখানি গড়ে উঠেছিল সেইসব ঘটনার মাধ্যমেই। সেগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এসব ঘটনার কেন্দ্রভূমি ছিল শহর কলিকাতা—এখানেই তখন নূতন একটি সমাজ গড়ে উঠছিল। নূতন ও পুরাতনের সংঘাত এই শহরের সমাজ-জীবনকে তখন যতখানি আলোড়িত করেছিল, সমগ্র গ্রাম-বাঙলার সমাজ-জীবনকে ঠিক ততখানি আলোড়িত করতে পারেনি। ইতিহাসের নিয়মই এই যে, কোনো একটা নূতন চিন্তা এবং সেই চিন্তা-সমুদ্ভূত আদর্শ এবং আলোড়ন সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে প্রসারিত হওয়া সময়-সাপেক্ষ। সন-তারিখের উল্লেখ না করে আমরা

এখানে শুধু কালানুক্রমিকভাবে ঘটনাগুলির উল্লেখ করব—কেননা, উনিশ-শতকের বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করে থাকেন তাঁদের অনেকের কাছেই ইহা একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ।

উনিশ শতকের প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, মধ্যযুগীয় চাল-চলন, সামন্তযুগের মেজাজ আর ক্ষয়িষ্ণু নবাবী আমলের বহু সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার প্রাধান্য বাঙলাদেশে পুরোমাত্রায় রয়ে গিয়েছে। বিত্ত-কৌলীন্যই ছিল সেই সন্ধিক্ষণের একমাত্র মানদণ্ড এবং এর ফলে তখনকার সংস্কৃতি এই নব-অভ্যুদিত সামাজিক আভিজাত্যের পদতলেই স্থান পেয়েছিল। আভিজাত্যের সামাজিক অভিব্যক্তিও ছিল বিকৃতরুচি বিত্তবানদের উৎকট বিলাসিতা দ্বারা চিহ্নিত। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক এই বিকৃতির স্রোত মন্দীভূত হতে থাকে উনিশ শতকের সূচনায়, যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল। ঠিক এই সময়েই উইলিয়ম কেরি শ্রীরামপুরে এসে গিয়েছেন, নব্যবঙ্গের প্রথম দীক্ষাগুরু মহামতি ডেভিড হেয়ার এসেছেন কলিকাতায়। ঠিক এই সময়েই নূতন জীবনস্রোতকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন রামমোহন রায়—উনিশ শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি থেকেই তিনি কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বহুবিধ সংস্কার-কর্মেরও সূচনা হয়। সেইদিন থেকেই পুরাতন জীবনপ্রবাহের পাশাপাশি একটি নূতন জীবনস্রোত, বলিষ্ঠ ও সুস্থ জীবনস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। বাঙলার সমাজ-জীবনের উদয়াচলে রামমোহনের চিন্তা ও কর্মকে কেন্দ্র করে যে নব সূর্যোদয় দেখা দিল, উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রকৃত মাঙ্গলিক সেই শুভক্ষণেই রচিত হয়েছিল। 'দি কুইল' পত্রিকার স্তম্ভে বাঙালীর সাংবাদিক প্রতিভার প্রথম উন্মেষ দেখা দিল; রামমোহন প্রকাশ করলেন 'বেদান্তগ্রন্থ', স্থাপন করলেন 'আত্মীয় সভা'; স্থাপিত হল হিন্দু কলেজ—ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম বিদ্যালয়। তখন উনিশ শতকের প্রথম সতর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজ। নবীন জীবনের প্রস্তুতির জন্য সমগ্র মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চলেছিল নানা দিকে। স্থাপিত হল 'স্কুল সোসাইটি' যার লক্ষ্য ছিল দেশের নানা জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা। সেই একই সঙ্গে গঠিত হয় 'স্কুল

বুক সোসাইটি'। এইভাবে মানস-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় সমুন্নতির ভিত্তি জাতীয় ভাষার গঠনের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছিল। এলো সেই সঙ্গে সাময়িক পত্রের যুগ—দেশীয় ভাষায় একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'দিগ্‌দর্শন', সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গাল গেজেটি', 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি যুগান্তকারী পত্র-পত্রিকা।

রামমোহন স্থাপন করলেন এ্যাংলো হিন্দু স্কুল; এর ঠিক পাঁচ বছর আগে স্থাপিত হয়েছে হিন্দু কলেজ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা ছিল রামমোহনের। এবং তিনিই এই বিষয়ে অন্যান্যদের (এই অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডেভিড হেয়ার, বিচারপতি হাইড ইস্ট এবং রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) প্রয়াসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু রামমোহনকে সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল, কারণ হিন্দু-প্রধানরা চাইলেন যে, পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র হিন্দুছাত্রদের প্রবেশাধিকার থাকবে। অসাম্প্রদায়িক ও উদার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী রামমোহনের পক্ষে তাই শেষ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব হয়নি। এর চৌত্রিশ বছর পরে হিন্দু কলেজের নিয়ন্ত্রণে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল।

এর পরেই দেখা যায় যে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য লর্ড আমহার্স্টের নিকট লেখা রামমোহনের সেই ঐতিহাসিক পত্রখানিকে উপলক্ষ করে উনিশ শতকের বাংলার যুগ ও জীবনগতি যেন পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। ঘটনার পর ঘটনা জাতির নিস্তরঙ্গ জীবনে আবর্তের পর আবর্ত সৃষ্টি করতে থাকে। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রথম প্রেস-অর্ডিনান্স প্রত্যাহারের দাবী ধ্বনিত হল; সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হল; উত্তরকালে এই কলেজকে কেন্দ্র করেই বিদ্যাসাগরের প্রতিভা অসাধ্যসাধন করেছিল। এলো সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন—জাগ্রত বাঙলার প্রথম সমাজসংস্কারের দুন্দুভি এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বেজে উঠেছিল সেদিন। এই আন্দোলনের ফলে বর্বর সতীদাহ প্রথা চিরদিনের মতন বন্ধ হয়ে যায়। এই একটিমাত্র সমাজসংস্কার সেদিন নবজাগরণকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে

দিয়েছিল। জ্ঞানের অবতার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনের এই সংস্কার প্রয়াসকে বিপ্লব আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, 'উনিশ শতকের নবজাগরণে রাজার এই সংস্কার আন্দোলনটির গুরুত্ব সমধিক।' সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই এলো ধর্মসংস্কার—রামমোহন প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মসমাজ; রাধাকান্ত দেব ধর্মসভা। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার আদর্শ প্রচার করে এবং বেদান্ত উপনিষৎ বাঙলাভাষায় অনুবাদ করে রামমোহন যা করেছিলেন, সেদিনকার সামাজিক পরিবেশে তাকেও বৈপ্লবিক ব্যাপার বলে অভিহিত করা যায়। যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন নবযুগের চালচিত্র।

এইভাবে সমাজ-জীবনের কূপমণ্ডুকতা যতই বিলীয়মান হচ্ছিল, শিক্ষিত নাগরিক বাঙালীর জীবনবোধ ততই প্রখর ও প্রবল হয়ে উঠছিল। এইভাবে যখন উনিশ শতকের প্রথম তিনটি দশক একে একে উত্তীর্ণ হল, তখন সংবাদ-সাহিত্য প্রচেষ্টার সার্থকতম নিদর্শন হিসাবে আবির্ভূত হল 'প্রভাকর'—কবি ঈশ্বরগুপ্তের অক্ষয় কীর্তি। বাঙলার নব-অভ্যুদিত সংস্কৃতি-সাহিত্যের উপরে 'প্রভাকর'-এর কিরণবর্ষণ ব্যর্থ হয়নি; কারণ এই 'প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠাতেই রঙ্গলালের কবিকৃতির বিকাশ আর বঙ্কিম-দীনবন্ধুর কৈশোর-প্রতিভার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে করা যাবে। 'প্রভাকর'-এর সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা দিল 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা; স্থাপিত হল 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'। পরবর্তী ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল রামমোহনের মৃত্যু, ইংরেজী শিক্ষায় মেকলিয় যুগের সূচনা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদায়ী আইন এবং কলিকাতায় প্রথম গ্রন্থাগার 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী' স্থাপন।

এই ছিল বঙ্কিমের জন্মকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির রূপরেখা। উনিশ শতকের এই সময়টাকে আমরা রামমোহনের যুগ এবং 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর যুগ বলে অভিহিত করতে পারি। এই দুটি যুগের চরিত্র কিন্তু আলাদা। তবে একস্থলে এই দুই যুগের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়—সেটা হল নবীন ও প্রবীণের সংঘর্ষ। সমাজদেহের প্রাণশক্তি যখন হ্রাস পায় তখন সংঘর্ষের দ্বারাই গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাঙলার সমাজজীবন স্তিমিত হয়ে এসেছিল নানা কারণে

এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল এই ধারা চলতে থাকে। তারপর একটি বহিরাগত শক্তিশালী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কালক্রমে সেই স্তিমিত জীবনস্রোতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠতে থাকে। তখনই দেখা দিল নবীন ও প্রবীণের বিরোধ। আদর্শের সংঘাত-জনিত এই যে বিরোধ, এরই একটি ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রগণ যাঁরা ইতিহাসে বিদ্রোহী 'ইয়ং বেঙ্গল' বলে অভিহিত হয়েছেন।

সেদিনের বাঙলার সামাজিক বিপ্লবের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু-কলেজ। এই বিপ্লবের গুরু ছিলেন ঐ কলেজেরই তরুণ শিক্ষক হেনরি ল্যুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং সেইজন্য তাঁর মতের অনুগামী ছাত্রদের 'ডিরোজিয়ান' বলা হত। 'ইয়ং বেঙ্গল' এর চরিত্র ও কর্মধারার বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েও এঁরা সেদিন, আচরণগত উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মন্ত্রের উপাসক হতে পেরেছিলেন। নবযুগের পক্ষে এইটুকুই প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বৎসরেই এঁরা মিলিত হয়ে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। বাংলার নবজাগরণের প্রস্তুতিপর্বে এই সভার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'-র গুরুত্বের সঙ্গে তুলনীয়। এদেশে স্বাধীনচিন্তার মাঙ্গলিক রচনা এবং সেই সঙ্গে মানুষ ও সমাজের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে যুক্তি-বুদ্ধি সমর্থিত ধারণা—এই সভারই বিশেষ দান ছিল।

এইভাবে শহর কলিকাতা যখন রামমোহনের চিন্তাধারা এবং 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর ভাবধারার ফলে আধুনিক যুগজীবনের মহাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে, সেই নব সংস্কৃতির সূতিকাগারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইহা ঠিক রামমোহনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরের ঘটনা। তাঁর জন্মকালের যে সব ঘটনাবর্তের পরিচয় আমরা দিলাম তার প্রত্যেকটিরই ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও উত্তরকালে যাঁর লোকোত্তর প্রতিভা সমগ্র বাঙলার সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করবে, এক সংঘাতমুখর পটভূমিকাতেই তাঁর আবির্ভাব স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্র একান্তভাবেই সংস্কারযুগের সন্তান। তিনি উনিশ শতকের মানুষ—যুক্তিবাদ ও স্বাধীনচিন্তার উপাসক।

॥ তিন ॥

—বলো স্বরে অ, স্বরে আ।

—অ, আ।

—না, বলো স্বরে অ, স্বরে আ।

—কেন পণ্ডিতমশাই, শুধু অ-আ বললে হয় না?

পাঁচ বছরের বালক বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব শিক্ষা, আমরা কল্পনা করতে পারি, এইভাবেই আরম্ভ হয়েছিল। কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে তাঁর হাতেখড়ি হয়। বহুকাল হল বাঙালীর সংসার থেকে এই প্রথাটি লোপ পেয়েছে, ফল কিন্তু ভাল হয়নি। দৌহিত্রের হাতেখড়ির দিন বঙ্কিমের মাতামহ, বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যাদব চট্টোপাধ্যায়ের সৌভাগ্যের সূচনা করে তাঁর তৃতীয় পুত্রের জন্ম হয়েছিল। সেইজন্য এবার চাটুয্যে বাড়িতে এই হাতেখড়ি উপলক্ষে একটা ছোটোখাটো উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। বালকের অন্নপ্রাশনের সময়ও অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়েছিল। কথিত আছে, কুল-পুরোহিত গঙ্গাবারি-ধৌত মেঝের ওপর রামখড়ি দিয়ে প্রথম দুটি স্বরবর্ণ লিখে বালককে বললেন, ভাল করে দেখে নাও, আমি মুছে দিলে তোমাকে ঠিক ঐরকম লিখতে হবে। পারবে ত? বালক ঘাড় নাড়ে। অক্ষর লেখা হল, জল দিয়ে মুছে দেওয়া হল। তারপর বালকের হাতে খড়ি তুলে দেওয়া হল। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ বালকের দক্ষিণ করের অঙ্গুলি-ধৃত সেই ঈষৎ স্থূল ও দীর্ঘ খড়িখণ্ডটির উপর। বালকের সাবলীল হস্তচালনায় মুহূর্তমধ্যে মেঝের উপর স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর দুটি সুডৌল আকারে ফুটে উঠল। হাত একটুও কাঁপল না। সকলের সকৌতূহল দৃষ্টির সম্মুখে চেলী-চন্দনে সজ্জিত পঞ্চম বর্ষীয় সেই বালক কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করল না নিজেকে। অলক্ষ্যে থেকে বীণাপাণি কি তাকে সাহায্য

করেছিলেন? হয়তো করেছিলেন, কারণ সেদিন যে বালক স্বচ্ছন্দভাবে খড়ি উঠিয়ে নিয়ে অ আ লিখেছিলেন, উত্তরকালে তিনিই তো ততোধিক স্বচ্ছন্দভাবে বাঙলাভাষার গঠনে এবং বাঙলাসাহিত্যের সৃষ্টির কাজে আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তাঁর স্বজাতির নিকট 'সাহিত্য-সম্রাট' বলে সম্পূজিত হয়েছিলেন।

দৌহিত্রের সেই কৃতিত্ব দর্শনে চমৎকৃত হয়ে তার মাতামহ সেইখানেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—'কালে এই বালক বংশের ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবে।' সেদিন হয়ত ভবনীচরণের এই কথায় অনেকেই প্রত্যয় করতে পারেন নি, কিন্তু যেহেতু তাঁর ফলিতজ্যোতিষে অসাধারণ দখল ছিল সেইজন্য বালকের ললাট দেখেই তিনি যে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তা অনেকের বোধগম্য হয়নি। বলেছি, তাঁর মাতামহ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। এই মাতামহের কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শাস্ত্রানুরাগ লাভ করেন নি, তাঁর মৃত্যুর পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত বহু সংস্কৃত পুঁথিরও তিনি অধিকারী হয়েছিলেন। শুধু পাওয়া নয়, সেগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বহুযত্নে পড়ে স্বীয় বিশাল শাস্ত্রজ্ঞতার ভিত্তিস্থাপন করেন। মাতামহকুল থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফলিতজ্যোতিষ বিষয়ক অনেক গ্রন্থও ছিল। শেষজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এরও কিছু আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ফলিতজ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন বলে জানা যায়।

হাতেখড়ি হওয়ার পর গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় রামপ্রাণ সরকারকে যাদবচন্দ্র পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। জনশ্রুতি এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনেই বাঙলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেন এবং শৈশবেই তিনি মেধাবী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তখন 'বর্ণপরিচয়' ছিল না, 'শিশুবোধক' ছিল। প্রথমভাগের বানান শিখতে তাঁর বেশিদিন লাগে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন ছ'বছর তখন যাদবচন্দ্র মেদিনীপুরের ডেপুটি কালেক্টর। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বৎসরে তাঁর এই পদোন্নতি হয়। '১৮৩৮ সালে জানুয়ারী মাহায় আমি ডিপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইলাম।'* এখানে তিনি ইংরেজী স্কুলে তাঁর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রকে ভর্তি করে দেন। কথিত আছে, এই স্কুলের

* আত্মজীবনী: যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিম-জীবনী গ্রন্থে সন্নিবেশিত

প্রধান শিক্ষক টীড্ সাহেব কোনো একসময়ে যাদবচন্দ্রকে বলেছিলেন: 'Mr. Chatterjee, your third son is a very brilliant boy. He outshines all other boys in his class in English.' ইংরেজীতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ে সত্যই একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং ইংরেজী রচনায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা অনেক ইংরেজের ঈর্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সহোদর পূর্ণচন্দ্র তাঁর অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই; আমার জ্ঞানে ত নহে। তাঁহাকে একজন প্রাইভেট টিউটর সকাল ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। তিনি ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতেই বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। এখানে তখন একটি হাই স্কুল ছিল; টীড্ নামে একজন বিলাতি সাহেব উহার হেড মাস্টার ছিলেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডবল প্রমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।'*

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে স্বীয় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁর শৈশব-শিক্ষার কথা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন: 'এই সময়ে আমাদিগের পিতা মেদিনীপুরে ডেপুটী কা৾ক্টরী করিতেন। আমরা সকলে (অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র এই তিন ভাই) কাঁটালপাড়া হইতে তাহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন।' এই ঘটনার আট-দশমাস পরে যাদবচন্দ্র আবার তিন পুত্রকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। 'সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল।' তারপর আবার কাঁটালপাড়া। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বাল্যের এইসব ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলে উল্লেখ করেছেন। 'যাহারা গভর্ণমেণ্টের উচ্চতর চাকরি করেন,

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষাবিভ্রাটে পড়িতে হয়।'

তাঁর বাল্যজীবনে, হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, বঙ্কিম-চন্দ্রের শিক্ষালাভ যে একটানা হতে পারে নি তা তাঁর নিজেই উক্তিতেই জানা যায়। উত্তরকালে স্বীয় শৈশবজীবনের শিক্ষাবিভ্রাটের কথা স্মরণ করেই তিনি লিখেছিলেন, 'বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। একদিকে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্তনে বিদ্যাশিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিকে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের বিদ্যাশিক্ষার আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব।' বঙ্কিমচন্দ্রকে যে এই দ্বিতীয় বিপদে পড়তে হয়েছিল সেকথা তিনি নিজেই অকপটে বলেছেন। বাড়িতে তখন অভিভাবক বলতে কেউ নেই; পিতা বিদেশে, সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। তখন অভিভাবক বলতে মধ্যম ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র। আর তিনি তো তখন বালক। এমন অবস্থায় কুসংসর্গ দোষ খুবই সম্ভব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি।

এরপরেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখতে পাই হুগলী কলেজের ছাত্ররূপে। তখন তাঁর বয়স সাড়ে এগার বছর। ২৮শে অক্টোবর, ১৮৪৯ সনে তিনি এই কলেজে ভর্তি হন এবং ১২ই জুলাই, ১৮৫৬ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে ছয় বছর নয় মাস এখানে তিনি অধ্যয়ন করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন হুগলী কলেজের ইংরেজী বিভাগ—কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল; স্কুল বিভাগের ছিল দুটি ডিভিসন—সিনিয়র ও ও জুনিয়র। প্রথমটিতে ছিল তিনটি শ্রেণী, দ্বিতীয়টিতে চারিটি; প্রত্যেক শ্রেণীর দুটো করে সেকশন। এর থেকে বোঝা যায় তখন দেশে ইংরেজী শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর ছেলেরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল সরকারী চাকরিলাভের সুযোগ।

তখন সমাজ-কাঠামোয় একটা মৌলিক রূপান্তর সাধিত হতে চলেছে। সেই রূপান্তরের পথে বাংলাদেশে উদ্ভূত হয়েছে একটি নূতন শ্রেণী—বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মকালে এই নবরূপান্তরের প্রক্রিয়া প্রায়

সম্পূর্ণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইংরেজের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনেই সৃষ্ট হয়েছিল এই নূতন শ্রেণী। এদের স্বরূপ-পরিচয় দিয়েছেন মেকলে সাহেব তাঁর সেই শিক্ষা-বিষয়ক বিখ্যাত প্রস্তাবটির মধ্যে। তিনি লিখেছিলেন: "We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect.' ইংরেজ আচরিত সামাজিক আদর্শ ও চালচলন রীতিনীতির অনুকরণই ছিল এই নূতন শ্রেণীর মানুষের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তাঁর রচনার বহুস্থানে এর নজির পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষিত হয়েও, ইংরেজী শিক্ষিত এই নূতন বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর জীবনধারণের মধ্যে পুরাতন সমাজের ভাবাদর্শ কিছুমাত্র দেখতে পান নি। ইংরেজী শিক্ষার উপর তাঁর যেমন অনুরাগ ছিল, তেমনি বীতশ্রদ্ধ তিনি ছিলেন সরকারী চাকরির উপর। আবার চাকরির মধ্যে ডেপুটিগিরির প্রতি তাঁর ছিল প্রবল বিতৃষ্ণা। এই ডেপুটিগিরিকে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুতর দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনা বলে মনে করতেন। 'চাকরিতে মানুষ আধমরা হয়।'—তাঁর সুদীর্ঘ চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা-মণ্ডিত এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের অন্তর্জীবনের উপর অনেকখানি আলোক-সম্পাত করে।

আমরা দেখেছি এক বিচিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। এই পরিবেশের সঙ্গে তাঁর জীবনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। পিতা যাদবচন্দ্র সরকারী চাকুরে ছিলেন; স্বল্প বেতনের চাকরি থেকে পরবর্তীকালে তিনি ডেপুটি কালেক্টারের পদে উন্নীত হন। চাটুয্যে পরিবারের অন্যান্যেরাও রাজসরকারে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং স্বীয় পারিবারিক স্বচ্ছল পরিবেশের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাল্য ও শৈশবজীবনে ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির নব-রূপায়ণের প্রভাব অনুভব করেছিলেন। শৈশবেই দুই-একটি ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগও তাঁর ঘটেছিল। শৈশবে মেদিনীপুরের পিতার কর্মস্থলে অবস্থান কালে

ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক টীড্ সাহেব ও তাঁর পত্নী বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মলেট সাহেবের বাংলোতেও বঙ্কিমচন্দ্রের যাতায়াত ছিল। তাঁদেরই সুপারিশে তাঁর ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, এই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থেকে বালক বঙ্কিমের মনে ইংরেজ-চেতনা ও তাদের অনুকরণ-প্রেরণা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। সে যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজ-প্রীতির যে আদর্শ উৎকটভাবে দেখা দিয়েছিল (পরিবেশ-প্রভাবে এটা সেদিন অনিবার্য ছিল), প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

এইবার হুগলী কলেজের প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিভিসনে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। কাঁটালপাড়া থেকে একটা ডিঙ্গি নৌকা চড়ে গঙ্গা পার হয়ে তিনি প্রত্যহ হুগলী যাওয়া-আসা করতেন। মাসিক বেতন দুই টাকা। সেকালেও অবৈতনিক ছাত্রের ব্যবস্থা ছিল, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বৈতনিক ছাত্র ছিলেন। এখানে যাঁর হাতে তাঁর ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয় তাঁর নাম নবীনচন্দ্র দাস। বঙ্কিমের সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলেজের ১৮৫০-এর বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, প্রথম বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ পারদর্শিতার জন্য একটি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। হুগলী কলেজে তখন দেশীয় শিক্ষকদের মধ্যে দুজন খুব খ্যাতনামা ছিলেন—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্ সাহেব ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। ব্রেন্যাণ্ড সাহেব পড়াতেন অঙ্ক ও ভূগোল আর গ্রেভস সাহেব সাহিত্য ও ইতিহাস। গ্রেভস ছিলেন প্রধান শিক্ষক। মোটের উপর, হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্র উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র হুগলী কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। এঁরা দুজনেই তাঁদের সময়ে কলেজের 'সেরা' ছাত্র বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার বিবরণে যে তথ্যটা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সেটা হল এই : কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বাঙলা রচনা অভ্যাস করেছিলেন

কি না? যতদূর জানা গিয়েছে তাঁর সময়ে হুগলী কলেজে বাঙলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে একথা সত্য যে তাঁর ছাত্রাবস্থায় বাঙলাভাষার চর্চা করা ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ আপনাদের অগৌরবের বিষয় বলেই মনে করতেন। সেকালে যাঁরা বাঙলা ভাল জানতেন না তাঁদের বেশির ভাগই ইংরেজীতে দক্ষ ছিলেন। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে দেখা যায় যে, কি ইংরেজী, কি মাতৃভাষা কোনোটাতেই ছাত্রগণ তেমন দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। তখন বাঙলাভাষায় পাঠযোগ্য বই অবশ্য বেশি ছিল না; সম্ভবত এই কারণেই বাঙলাভাষা অনাদৃত ছিল। কেবল যে বাঙলা ভাষায় ভাল বই ছিল না, তা নয়; ঐ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত শিক্ষকও সর্বত্র মিলত না। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের সেই উক্তিটি স্মরণ হয়: 'আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গালী পণ্ডিত ছিলেন তিনি এক সময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া কাটাইতাম।'* কিন্তু বাঙালীর সৌভাগ্যক্রমে, হুগলী কলেজে বাঙলা শিক্ষা ভাল হত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। এখানে পাঠ্যতালিকার মধ্যে 'ভারতচন্দ্র' পড়ান হত।

১৮৫৩, এপ্রিল মাস।

বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে তেইশজন কলেজের পরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। তখন তাঁর বয়স ষোল বছরও উত্তীর্ণ হয় নি। পিতা যাদবচন্দ্র এই সংবাদে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। এই সময়ে তাঁর ছাত্রজীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা—কবিতা লিখে পারিতোষিক লাভ। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার কবিতা প্রতি-যোগিতায় যোগদান করে তিনি ঐ পারিতোষিক (এর পরিমাণ ছিল কুড়ি টাকা) পেয়েছিলেন। রংপুরের জমিদার রমণীমোহন রায় ও কালীচরণ রায় চৌধুরী কর্তৃক ইহা প্রদত্ত হয়। বঙ্কিমের জীবনে এই ঘটনাটির গুরুত্ব সামান্য নয়। সেই গুরুত্ব বুঝতে হলে ঈশ্বরগুপ্ত তথা 'প্রভাকর' প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়।

* আত্মচরিত: রাজনারায়ণ বসু

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর'

এই 'প্রভাকর'-এর পাঠশালায় ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সম্রাটের প্রথম হাতেখড়ি। কবি ঈশ্বরগুপ্তকে তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের গুরুর মর্যাদা দিয়েছেন, যদিও পরবর্তী কালে তিনি কাব্যচর্চা থেকে বিরত ছিলেন এবং গুপ্তকবির মতেরও অনুবর্তী ছিলেন না। বাঙলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্তের স্থান কোথায় তা বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নির্দেশ করে গিয়েছেন। ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়িতে 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকা আসত; তার মধ্যে যে কবিতাগুলি বালক বঙ্কিমের ভাল লাগত, সেগুলি তিনি কণ্ঠস্থ করতেন। শুধু কণ্ঠস্থ করা নয়, আবৃত্তি করে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের শোনাতেন। কবিতা আবৃত্তিতে তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। তিনি নানা লোকের মুখে শুনে বহুতর সংস্কৃত শ্লোকও সুন্দর আবৃত্তি করতে পারতেন। কাঁটালপাড়ায় তখন হলধর তর্কচূড়ামণি নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করতেন। চাটুয্যে বাড়িতে পণ্ডিতমশাইয়ের যাওয়া-আসা ছিল। তিনি বঙ্কিমের স্মরণ-শক্তি ও আবৃত্তি-দক্ষতা দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। কথিত আছে, এই প্রবীণ পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠগৃহে বসে তাকে মহাভারতের নানা উপাখ্যান শোনাতেন। 'কৃষ্ণচরিত্র'-র ভিত্তি কি তখনই রচিত হয়েছিল?

বঙ্কিম যখন হুগলী কলেজের ছাত্র তখন একবার দোলযাত্রার সময় তিনি হলধর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, ভাগবতে লিখেছে শ্রীকৃষ্ণের ষোলো শ গোপিনী ছিল আর তিনি তাদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন? একথা কি সত্যি? চূড়ামণি মহাশয় চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলের মুখে এই প্রশ্ন শুনে যেমন ব্যথিত, তেমনি বিস্মিত হলেন। মুখে বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে পরে দেব। এখন বুঝবার চেষ্টা করলেও তুমি তা বুঝতে পারবে না; তবে এইমাত্র জেনে রাখ যে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শপুরুষ ও আদর্শচরিত্র। পণ্ডিতের এই উক্তি—'শ্রীকৃষ্ণ আদর্শপুরুষ ও আদর্শচরিত্র'—বঙ্কিমচন্দ্রের মনে চিরদিন জাগরূক ছিল। পরিণত বয়সে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে নানা যুক্তি-সহকারে তিনি ঐ মত প্রতিপাদিত করতে চেষ্টা করেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন সাহিত্য-সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন সম্রাট। 'সংবাদ প্রভাকর' তাঁরই কাগজ—দৈনিক ও মাসিক দুই আকারেই ইহা প্রকাশিত হোত। 'প্রভাকর'-এ তখন অনেকেই কবিতা লিখে পাঠাতেন—সেটা কবিতারই যুগ ছিল। লেখকদের মধ্যে বেশির ভাগই স্কুলের ছাত্র। ঈশ্বরগুপ্ত সেই ছাত্রমণ্ডলীর গুরু ও উৎসাহদাতা ছিলেন। 'প্রভাকর'-এর প্রভায় তখনকার বাঙলার মানসলোকের একাংশ সত্যই আলোকিত হয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্তের মতন দুঃসাহসী কিন্তু সৃজনশীল প্রতিভা, বাঙলাদেশে বেশি জন্মায় নি। তাঁর দুঃসাহসিকতার অবিস্মরণীয় নিদর্শন তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর'—বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিকপত্র। প্রথমে সাপ্তাহিক-রূপে 'প্রভাকর'-এর আবির্ভাব হয় ১৮৩১, ২৮শে জানুয়ারী। এই পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিল পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবারের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্য। এর প্রায় সাত-আট বছর পরে (১৮৩৯, ১৪ই জুন) 'প্রভাকর' দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিস্মৃতপ্রায় এই পত্রিকার প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা ইতিহাসে লেখে না, কিন্তু সেদিনের বাঙলার গণচেতনায় ঈশ্বরগুপ্ত তথা 'প্রভাকর'-এর প্রভাব ছিল অবিসম্বাদিত। 'প্রভাকর'-এর মাধ্যমে বাঙালীজীবনে ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ দান স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল প্রত্যক্ষ, তীব্র এবং সুস্পষ্ট। মধুসূদন, রঙ্গলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধ ঈশ্বরগুপ্তের স্বাজাত্যবোধেরই ক্রমপরি-ণাম বলে মনে করা অন্যায় হবে না।

এই 'প্রভাকর'-এর পাঠশালাতেই বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর কাব্যচর্চার হাতে-খড়ি। সে কাহিনী সুপরিচিত। হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র আর হুগলী কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন পরস্পরের অপরিচিত ছিলেন—'প্রভাকর'-এ প্রকাশিত স্ব স্ব কবিতার মাধ্যমেই এঁদের আলাপ; সে আলাপ উত্তরকালে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য। ঈশ্বরগুপ্তের নিকট কবিতা লিখতে শিখলেও, বঙ্কিম কখন তাঁর অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন নি; তিনি দীনবন্ধুর মতন গুপ্ত-কবির ভাব-শিষ্য ছিলেন না। তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য তাঁরই ছিল। ইহাই প্রতিভার লক্ষণ। কথিত আছে, ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলেছিলেন, তোমার

লিখবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখে গদ্য লিখবে। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর এই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন, ষোল বছরের পর থেকে তিনি কবিতা রচনায় ছেদ টেনে দিয়েছিলেন।

হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত শিখেছিলেন কাঁটালপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট। পুঁথি বগলে করে তিনি তাঁর চতুষ্পাঠীতে প্রতিদিন পড়তে যেতেন। চার বছর ধরে তিনি তাঁর কাছে ব্যাকরণ ও সাহিত্য, কাব্য পড়েছিলেন। চার বছরে দশ বছরের পাঠ শেষ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় পাশ করে মাসিক আট টাকা বৃত্তি পেলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এবার তিনি কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে উন্নীত হন। '১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী হইতে তেরজন সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষা দেন—একমাত্র বঙ্কিমই বৃত্তিধারী এবং তিনিই একাকী হুগলী কলেজ থেকে সে বৎসর সকল বিষয়ে সর্বোত্তম দক্ষতা দেখাইয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করিয়া থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন।' একমাস পরে তিনি ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করেন এবং ১৮৫৬, ১২ই জুলাই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করে আইন পড়বার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় এলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। শুরু হয় তাঁর ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় পর্ব। পিতা যাদবচন্দ্র তখন চাকরি থেকে সবেমাত্র অবসর নিয়ে কাঁটালপাড়ায় বাস করছিলেন। যাদবচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল যে তাঁর প্রথম দুইটি পুত্রের ন্যায় তৃতীয় পুত্রও হাকিম হয়। কাঁটালপাড়ায় চাটুয্যে পরিবার তখন যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে—বিত্তবান হিসাবেও তাঁরা খ্যাত হয়েছেন। যাদবচন্দ্র ভাবলেন বঙ্কিম যদি হাকিম হয় তবে সেই প্রতিপত্তি ও খ্যাতি আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন হিন্দু কলেজ সবেমাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এই কলেজের আভিজাত্য স্বতন্ত্র। এই কলেজ থেকে আইন পাশ করতে পারলে পুত্রের হাকিমি লাভ অবধারিত—যাদবচন্দ্র নিশ্চয়ই মনে মনে এই কথা ভেবে থাকবেন।

হুগলী কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ

পড়তে এলেন তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অতিক্রান্ত হয়ে আরো ছয়টি বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন আঠার বছর চলছে। তাঁর জন্মের পর থেকে উনিশশতকের বাঙলায় এই আঠার বছরের মধ্যে দেখা যায়, নবজাগরণের প্রস্তুতি-পর্ব অনেকখানি শেষ হয়েছে। বঙ্কিম-জীবনের প্রেক্ষাপট হিসাবে এই সময়কার ইতিহাস আমাদের একটু জানা দরকার এইজন্য যে, তখন তাঁর সেই বয়স যে বয়সে মানুষের মনে ছাপ পড়ে, মানুষ অল্প-স্বল্প চিন্তা করতে শেখে এবং বুঝতেও শেখে।

এই সময়কার প্রধান ঘটনা দৈনিকরূপে 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর প্রকাশ। এরই সমকালীন ঘটনা তত্ত্ববোধিনী সভা ; এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবজাগরণের ইতিহাসে এই সভা এবং চার বছর পরে প্রকাশিত এর মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (যার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত) অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এর বহু-বিষয়াভিমুখিতার জন্য। 'সমকালীন বাংলার নাগরিক সমাজ-জীবনে জ্ঞান-চিন্তা, ধর্ম-স্বাদেশিকতা, সাহিত্য-বিজ্ঞান এক কথায় আনুপূর্বিক জীবনবোধের শ্রেষ্ঠ পরিবাহক ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় যার সূচনা, আমরা দেখতে পাব, ঊনত্রিশ বছর পরে, তারই সার্থক পরিণতি 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হয় এই সময়ে (১৮৪৯) এবং যুক্তিবাদী নির্মল জ্ঞানচর্চার প্রসারের জন্য জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রকাশিত হয় পরের বছরে রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যুগ্ম-প্রয়াসের ফলে। একবছরের ব্যবধানে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ, ঘটনা হিসাবে উল্লেখ্য। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক মিশনারিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন, মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ইংলণ্ডে রামমোহন-পরবর্তীযুগের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু এবং বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিষয়ক প্রথম পুস্তক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রকাশ ও বেথুন স্কুল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক। এই দশকের শেষ ভাগের রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে 'কালা কানুন বা Black Act-এর

কথাও উল্লেখ্য। মফঃস্বলের বিচারালয় থেকে শ্বেত-কৃষ্ণ বিচার-বৈষম্য দূর করবার জন্য সরকার একটি আইনের প্রস্তাব করেন; কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিরোধিতার ফলে খসড়া অবস্থাতেই এই আইনটি প্রত্যাহৃত হয়। পঞ্চম দশকের প্রথমভাগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—প্রবীণ ও নবীনপন্থীর মিলনভূমি ছিল এই সমিতি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সূচনা তখন থেকেই। পরবর্তী ছয় বছরের ঘটনাগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখ্য, যথা—কলিকাতা-বর্ধমান রেলপথ স্থাপন; স্যর চার্লস্ উডের প্রসিদ্ধ 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার, বিদ্যাসাগরের উদ্যমে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে মডেল স্কুল স্থাপন এবং বিধবা-বিবাহের আইন পাশ, কলিকাতায় প্রথম বিধবা-বিবাহ এবং তুমুল আন্দোলন। রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনের পর বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় সমাজ-সংস্কার। এত বড়ো আলোড়ন বাঙলার হিন্দুসমাজে ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি, পরেও না।

আর এই সময়ের মধ্যে (১৮৩৯ থেকে ১৮৫৬) বাঙলা দেশে যেসব মনীষি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন এই কয়জন, যথা—রমেশচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নবীনচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন ('ইণ্ডিয়ান মিরর') আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত গুপ্ত। এঁদের মধ্যে অনেকেই উত্তর-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিধির মধ্যে এসেছিলেন। বাংলার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে এঁদের অনেকেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং এঁদের অনেকেরই চিন্তা ও কর্ম দ্বারা নবজাগরণ সার্থকতা লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলিকাতায় পড়তে এলেন তখন বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের যুগ চলেছে।

—বাঁকা তা'হলে কলকাতা থেকেই পড়বে?

—হ্যাঁ, শ্যামাচরণ। আমি তাই স্থির করেছি।

—প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কি পড়বে ?

—আইন। কালেক্টর সেভিল সাহেব আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে বাঁকা যেন আইন পড়ে। আজকাল আইন পাশ করলেই বিনা নমিনেশনে ডেপুটির চাকরি অবধারিত।

—জজিয়তিও তো পেতে পারে। ডেপুটি নাই বা হল ?

—বাঁকা হাকিম হয়, এই আমার ইচ্ছা। জজিয়তি পেতে বিলম্ব হবে। তা ছাড়া মুন্সেফী করতেই ওর অর্ধেক জীবন কেটে যাবে, কি লাভ ?

শ্যামাচরণ আর তর্ক করলেন না।

পিতা যখন বর্ত্তমান তখন কনিষ্ঠের ভবিষ্যতের কথা তিনি আর বেশি ভাবতে চাইলেন না। ঠিক হল বাঁকা (ছেলেবেলায় বাড়িতে সবাই বঙ্কিম-চন্দ্রকে ঐ নামে ডাকতেন) কলিকাতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হবেন।

—কিন্তু বাঁকা থাকবে কোথায়, বাবা ?

—বাসা ভাড়া করে থাকবে। উমাচরণকে বলেছি একটা বাসা ঠিক করে দেওয়ার জন্য।

—সঙ্গে যাবে কে ?

—বাণেশ্বর ঠাকুর আর মুরলী।

উমাচরণ রায় ছিলেন চাটুয্যে বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক। কর্তারা বিদেশে থাকতেন, বৃদ্ধ উমাচরণই এই সংসারের যাবতীয় বিষয়ের তদারকি করতেন। অবশেষে একদিন পিতা-মাতা এবং অগ্রজের পদধূলি গ্রহণ করে ও গৃহদেবতা রাধাবল্লভের আশীর্বাদ নিয়ে নবীন যুবক বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া থেকে কলিকাতার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সঙ্গে চলল পাচক বাণেশ্বর আর নবনিযুক্ত ভৃত্য মুরলী। ঠিক হল সঞ্জীবচন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়ে কনিষ্ঠকে দেখে আসবেন। এই মুরলী বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবন পর্যন্ত তাঁর ভৃত্যের কাজ করেছিল। সে ছিল খুব বিশ্বাসী ও সেবাপরায়ণ। রবীন্দ্রনাথের যেমন বনমালী, বঙ্কিমচন্দ্রের তেমন এই মুরলী।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

সাটক্লিপ সাহেব তখন এই কলেজের প্রিন্সিপাল।

আগে যেখানে সিটি কলেজ ছিল তার পশ্চিমদিকে অবস্থিত নিজ তেতলা বাসা-বাড়ি থেকে ভৃত্যকে দিয়ে ছাতা ধরিয়ে গোলদীঘির ধার দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে আসতেন। সহপাঠীরা দেখেন—'সুন্দর সুশ্রী গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশেপাশে একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমাজ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা বলেন না। তৎকালীন সংস্কৃতাধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে তাঁহার অনুরোধে তিনি আমাদের রেজেষ্টারী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন, তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন মহাশয়। কৃষ্ণকমল বলিলেন, আচ্ছা। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদীঘির ধার দিয়া ছাতা ধরাইয়া সটানে সমানে চলিয়া গেলেন।'

এই বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরই সহপাঠী অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, কেশবচন্দ্র সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি। উত্তরকালে এদের অনেকেই স্বনামধন্য হয়েছেন। এঁরা সকলেই আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং সকলে ১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এইসময়ে একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে এবং আমাদের এইরকম অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর ছাত্রজীবনের এই ঘটনাটি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে শাসক জাতির প্রতি বিরাগের ভাবটা প্রথম জেগেছিল। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তাঁরই সহাধ্যায়ী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে রামচন্দ্র মিত্র নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বাঙলা ব্যাকরণ ও অন্যান্য বাঙলা বই পড়াতেন। বাঙলা পাঠ্য ছিল—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'। এই অধ্যাপক মহাশয় একবার ক্লাসে বাংলা কম্পোজিশন (composition) সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

'ভাল ভাষায় প্রকৃতি বর্ণনা করতে গেলে 'সুশীতল সমীরণ' এই দুটি কথা লিখতে হবে। তবে যেখানে সাধু ভাষা মনে না আসে সেখানে 'ঠাণ্ডা বাতাস' বসিয়ে দেবে। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের কাছে এই গল্পটি বলে কৌতুক উপভোগ করতেন। বলতেন, কেশব সেন রাম মিত্রের বেশ নকল করতে পারত।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পটি এই: 'একদিন রাম মিত্র আমাদের কয়েক-জনকে বটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাগানের মধ্যে যে একটা গাছের ঘর আছে সেইখানে তাঁর দলবল নিয়ে তিনি যেমন প্রবেশ করেছেন, অমনি সেখানে উপস্থিত একটা রুক্ষ মেজাজের ইংরেজ রেগে তাঁকে সম্ভাষণ করলে—Who the devil are you? তিনি ভীত হয়ে বললেন—Professor Ramchandra Mitra, Professor Presidency College. উত্তর হল—Damn your Professor. তখন তিনি ছেলেদের নিয়ে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, Let us forget and forgive, Let us exercise the Christian virtue of forgiveness. * বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর অধ্যাপকের এই আচরণে বা কথায় খুশি হতে পারেননি, সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্তন হয় ১৮৫৭ সনের মাঝামাঝি। পরের বছর বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। ১৮৫৮, ৫ই এপ্রিল পরীক্ষা গৃহীত হবে, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র আইন-পড়া ছেড়ে দিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। পরীক্ষার তখন মাত্র দুই মাস বাকী। মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের মত ছিল না এই পরীক্ষা দেওয়াতে, কেন না তাঁর বিবেচনায় এত অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হওয়া অসম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্রের আপত্তি টিকল না, বঙ্কিমচন্দ্র অনন্যমনা হয়ে প্রস্তুত হতে লাগলেন। এই দু-মাস তিনি তাসখেলা একেবারে বন্ধ রেখেছিলেন। শৈশব থেকেই এটি তাঁর প্রিয় ব্যসন ছিল। অনেক ছাত্রই পিছিয়ে গেলেন, পিছলেন না বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ তেরজন ছাত্র। তাঁরা পরীক্ষার্থী হলেন—প্রথম বি. এ. পাশ করার গৌরব লাভের জন্য সকলেরই সমান আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল।

* আমার বাল্যকথা: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁরা পরীক্ষার্থী হলেন, অধ্যক্ষ কলেজ থেকে সিণ্ডিকেটে তাঁদের নাম পাঠিয়ে দিলেন। পরীক্ষার দিন তিনজন উপস্থিত হতে পারলেন না—পরীক্ষা দিলেন দশজন (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, 'The blessed ten'.)। মে মাসের মাঝামাঝি পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল যে, দশজনের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন পাশ করেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র এবং যদুনাথ বসু। যদুনাথ ছিলেন কলেজের সাধারণ বিভাগের একজন ছাত্র; বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান আর যদুনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু এঁদের কেউই সম্পূর্ণভাবে পাশ-করা বি. এ. নন; ছয়টি বিষয়ের মধ্যে এঁরা পাঁচটিতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আর ষষ্ঠ বিষয়ে সাত নম্বরের জন্য অকৃতকার্য হন। সিণ্ডিকেটের বিশেষ সুপারিশে সাত নম্বর 'গ্রেস' দিয়ে এঁদের পাশ করান হয়। গ্রাপেল সাহেব ইংরেজী ও ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন আর বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। হেমচন্দ্র পরের বছরে সসম্মানে বি. এ. পাশ করেন। এই বি. এ. পাশ করার ঘটনাটি নিয়ে মাইকেল খুব কৌতুক করতেন আর হেমচন্দ্রকে তিনি—'A real B. A.' বলতেন।

স্বীয় ছাত্রজীবনের কথা উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন: 'আমি আপন চেষ্টায় যাহা কিছু শিখিয়াছি। ছেলেবেলা হইতে কোন শিক্ষকের নিকট কিছু শিখি নাই। হুগলী কলেজে একটু আধটু শিখিয়াছিলাম ঈশানবাবুর নিকট। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখন ভাল লাগিত না।'* বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র আবার পূর্বের ন্যায় আইন পড়তে থাকেন, কিন্তু আইন পড়া শেষ হওয়ার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। সুতরাং তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ: শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাধনা, ১৩০১

॥ চার ॥

তখন বাংলার ছোটোলাট হ্যালিডে সাহেব।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের শেষ পর্বে যে বিরাট রাজনৈতিক ঘটনার ফলে এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয় এবং ভারতবর্ষ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে সেটি হল সিপাহী বিদ্রোহ। তিনি যখন কলিকাতায় পড়তে এলেন তখন তো বিদ্রোহের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; শহরের অবস্থা তখন রীতিমতো বিপজ্জনক। যুবক বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সেই বিস্ফোরক পরিবেশের মধ্যে স্থির, নির্বিকারচিত্তে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন। কথিত আছে, প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের অধ্যাপক মণ্ট্রিয়ো সাহেব (ইনি তখনকার দিনে একজন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ছিলেন) একদিন যখন কথায় কথায় ক্লাসে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এই মিউটিনিতে ইংরেজ যদি হেরে যায় তাহলে দেশের অবস্থা কি হবে? এর উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিক্ষককে বলেছিলেন, 'যদি একদিনের জন্যও মনে করতাম, তোমাদের রাজত্ব যাবে, তাহলে তোমার আইন-কেতাব সব গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতাম।' তারপর এক বছরের মধ্যেই যখন বিদ্রোহ দমিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, যে-জাত মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে এত বড় ব্যাপক উন্মত্ত বিদ্রোহ দমন করতে পারে, সে জাত শক্তি এবং কৌশলে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সেই ইংরেজের অধীনে এইবার শুরু হল তাঁর কর্মজীবন তখন শাসন নীতিতে একটা পরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছে। শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত বংশের বাঙালী হিন্দুদের উচ্চতর এবং দায়িত্বজনক শাসনকার্যে নিয়োগ করা সম্বন্ধে শাসকবর্গ উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। ইংরেজের শাসনযন্ত্রের বহু মাল-মসলা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণীদের মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করা

হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম গ্রাজুয়েট, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেমন করে ইংরেজের শাসনযন্ত্রে বাঁধা পড়লেন সে কাহিনী বড়ো চিত্তাকর্ষক।

হ্যালিডে তখন বাংলার ছোটোলাট।

বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুবামাত্র তাঁরই নির্দেশে চীফ্-সেক্রেটারি একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। পরীক্ষার ফল যখন প্রকাশিত হয় তিনি তখন কলিকাতার বাসায় অবস্থান করছিলেন এবং ঐ ঠিকানাতেই চীফ্-সেক্রেটারীর পত্রখানা এসেছিল। দৈবক্রমে ঘটনার দিন সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চিঠিখানা পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র সেটি অগ্রজের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'দাদা, তুমি কি বলো? দেখা করতে যাব? কিন্তু কিজন্য এই তলব, তা তো অনুমান করতে পারছি না।'

—আমি কিন্তু জানি সাহেব তোমায় কি বলবেন?

—কি?

—চাকরি নিতে অনুরোধ করবেন। একজিকিউটিভ সার্ভিস।

সঞ্জীবচন্দ্রের অনুমান মিথ্যা হয়নি। নির্দিষ্ট দিনে বঙ্কিমচন্দ্র এলেন চীফ্-সেক্রেটারীর দপ্তরে। তিনি তাকে শিষ্টাচারের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—'Would you accept the post of a Deputy Magistrate, Mr. Chatterjee?' সাহেব ভেবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র কৃতার্থ হবেন এই প্রস্তাবে। তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। 'If you have any hesitation, please tell me.' তখন এই কথার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বললেন—'I cannot say anything Sir, without consulting my father.'

—What higher post do you expect than this?

—Whatever your offer might be, I cannot accept it without consulting my father,

—Very well, you go home and consult your father.

পিতা যাদবচন্দ্র সব কথা শুনে পুত্রকে ঐ পদ গ্রহণের নির্দেশ দান করলেন; বললেন, 'এই অল্পবয়সে একজিকিউটিভ সার্ভিসে প্রবেশ করলে অল্পদিনের মধ্যেই

তোমার পদোন্নতি সুনিশ্চিত।' কিন্তু চাকরি নিতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র মুখ ফুটে এই কথা তাঁর পিতাকে বলতে পারলেন না। পিতার আদেশে তাঁকে সরকারি চাকরি নিতে হল। বঙ্কিমের চাকরি-জীবনের কোনো সঠিক ধারাবাহিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে কালীনাথ দত্ত, নবীন-চন্দ্র সেন ও ভূদেব-পুত্র মুকুন্দদেব সামান্য যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন আর সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে যা জানা যায় তার থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, 'বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠ দুঁদে ডেপুটি ছিলেন। স্বাধীনচেতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল; উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীরা অন্যায় করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। মামলার ন্যায়বিচারে তাঁহার সুনাম ছিল; সকলে সর্বত্র তাঁহার বিচার-কৌশলের উল্লেখ করিত। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতাকে পুলিশের লোক এমনই ভয় করিত যে, পারত পক্ষে তাহারা তাঁহার এজলাসে মকদ্দমা দিতে চাহিত না।'

বঙ্কিমের জীবনচরিত-আলোচনায় তাঁর তেত্রিশ বছরের চাকরি-জীবনের ইতিহাস বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে চাকরি করার ফলে তাঁকে বাংলার (তখন বাঙলা প্রদেশ বলতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে বোঝাত।) বহুস্থানে বদলী হতে হয়েছিল, বহু রকম লোকের সংশ্রবে আসতে হয়েছে এবং বাঙলার বহু সামাজিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। কর্মজীবনে তিনি সাধারণের সংস্পর্শে এসে স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞান লাভ করেন। এইসব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্য-প্রতিভা দুই-ই পরিপুষ্ট হয়েছিল, বলা চলে। সুতরাং বঙ্কিমের চিন্তাধারা ঠিকমত বুঝতে হলে তাঁর কর্মকাল ও কর্মস্থল সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। তিনি যদি শুধু ডেপুটি বঙ্কিম হতেন তাহলে অবশ্য এ প্রশ্ন উঠত না। এই একই কারণে আমাদের কাছে কৃতবিদ্য সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের চাকরিজীবনের ইতিহাস প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হয়। প্রয়োজনীয় মনে হয় দীনবন্ধুর জীবন। সরকারী রেকর্ডস্ থেকে এইসব বিবরণ সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। ডেপুটি হিসাবে সাব-ডিভিসনের এজলাসে বসে ধান-কাটা বা বৌ-চুরির মামলাই যে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিষ্পত্তি করতে হত তা নয়, সেই সময় কোথায় কখন তাঁকে দুর্ভিক্ষের রিলিফ কাজের তদারকি করতে হয়েছে, তিনি কি ধরণের

Administrative report প্রতি বছর সদরে লিখে পাঠাতেন, সেই সব তথ্যগুলি আমাদের কাছে নিশ্চয়ই মূল্যবান। রমেশচন্দ্র জেলা হাকিম হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সরকারী কাজের ফাঁকে কিভাবে সমগ্র বাঙলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর জীবনচরিত পাঠকমাত্রেই সে কথা অবগত আছেন। চাকরিতে যতই বিতৃষ্ণা থাক, বঙ্কিম-চরিত্র বুঝতে হলে তাঁর ডেপুটি জীবনের ইতিহাস জানতেই হয়। মানুষ বঙ্কিমের অনেকখানি পরিচয় মিলবে এরই মধ্যে।

'ক্যালকাটা গেজেট' (এই পত্রিকায় সরকারী নিয়োগ-বদলীর সব খবর প্রকাশিত হত।) থেকে জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র কুড়ি বছর বয়সে চাকরিতে নিযুক্ত হন ৭ই আগষ্ট, ১৮৫৮ আর চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১। যশোরে তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ, আলিপুরে শেষ; তখন তিনি প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। চাকরিজীবনে তিনি আটটি জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বদলি হয়েছিলেন, যথা—যশোহর, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা মুর্শিদাবাদ, মালদহ, হুগলী, হাওড়া ও কটক। যশোরে—খুলনা ও ঝিনাইদহ, মেদিনীপুরে—নেগুঁয়া ; ২৪ পরগণায় বারুইপুর, বারাসত, ডায়মণ্ডহার্বার ও আলিপুর ; মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর এবং কটকে—জাজপুর ও ভদ্রক। এর মধ্যে ১৮৮১ সনের শেষভাগে পাঁচমাসের জন্য তিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সহকারী সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন। আজীবন তিনি হাকিমিই করেছেন, কেবলমাত্র দু'বার কিছু দিনের জন্য বিভিন্ন রকমের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, যথা—পে-কমিশন আর মালদহে রোড-সেস্। এছাড়া একবার তিনি একমাসের জন্য রাজসাহীর কমিশনারের পার্সনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, আর একবার প্রায় তিনমাস বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্শনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্টের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চাকরিজীবনে মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে পনের-ষোলটি জেলা ও মহকুমা শহরে অবস্থান করেছেন। বলা বাহুল্য কাজকর্ম ব্যপদেশে নানা স্থানে এই প্রকার ভ্রমণ তাঁর বৃথা যায়নি ; কারণ তিনি এইসব স্থানের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ, সমাজ, বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ

পর্যবেক্ষণ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য-কর্মে সেসব অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবেই আভাসিত হয়েছে।

এইখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে খুলনা, বহরমপুর ও মালদহ এই তিনটি কর্মস্থলের স্মৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। খুলনায় এক অশান্ত পরিবেশের মধ্যেই বঙ্কিমের কল্পনায় আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যে প্রথম যৌবন-প্রতিমা 'দুর্গেশনন্দিনী' তিলোত্তমার আবির্ভাব; বহরমপুরে তাঁর অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সূচনা আর মালদহে শিরঃপীড়ার আক্রমণ। দুর্গেশনন্দিনী ও 'বঙ্গদর্শন'-এর কথা পরে বলব, এখানে মালদহের ঘটনাটি উল্লেখ করব। ১৮৭৪ সনের ২৫শে অক্টোবর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় দেড়বছর কাল মালদহে রোড-সেসের কার্যে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে বদলি হয়ে আসার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নি, একাই এসেছিলেন। যে বাড়িতে ছিলেন, সেখানে নাকি পূর্বে নরবলি দেওয়া হত। একদিন রাত্রে এক কুঠুরিতে বসে আছেন, এমন সময় কে যেন এসে বাইরে থেকে খুব জোরে দরজা ঠেলতে লাগল। চারদিক নিস্তব্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়নে নিমগ্ন ছিলেন। অত রাতে দরজা ঠেলার শব্দে চমকে উঠে, 'কে রে? কে রে?'— বলে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। উত্তর নেই। চাকরেরা তখন খুঁজে দেখল, কেউ কোথাও নেই। পরের দিন এজলাসে রায় লিখতে লিখতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে মস্তিষ্কের পীড়ার সূত্রপাত। এ রোগ আর সারেনি এবং এরই ফলে তাঁর প্রকৃতিতে এক দারুণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। তিনি চিরকাল কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত শান্ত। কিন্তু মালদহের এই ঘটনার পর থেকে তিনি সামান্য কারণে রেগে যেতেন। *

প্রতাপাদিত্যের যশোর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্মস্থল।

তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে। প্রথমবার কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় পিতামাতার পাদোদক সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন বিবাহিত।

* এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন কালীনাথ দত্ত এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' পুস্তকে এটি সন্নিবেশিত হয়েছে।

সেকালের প্রথা অনুযায়ী মাত্র এগার বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল। পঞ্চমবর্ষীয়া সেই বালিকাবধূ পরমসৌন্দর্যময়ী ছিলেন বলে জানা যায়। কথিত আছে, একবার কাঁটালপাড়ার সন্নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে গিয়ে সেখানকার নবকুমার চক্রবর্তীর এই মেয়েটিকে দেখে অগ্রজ শ্যামাচরণের খুব পছন্দ হয় এবং তিনিই উদ্যোগী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এর বিয়ে দেন। কর্মস্থলে যাওয়ার সময় চতুর্দশবর্ষীয়া স্ত্রীকে তিনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে আর দু'বছর পরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তিনি সংসার পাতবেন বিদেশে। নাবালিকা পত্নী তাঁর তরুণ ডেপুটি স্বামীর এই আশ্বাসে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্বাস আশ্বাসই রয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় তখন একদিন বাড়ির এক চিঠিতে জানতে পারলেন যে স্ত্রী জ্বরে মারা গেছেন। ফুটবার আগেই ফুল শুকিয়ে গেল। বিপত্নীক স্বামী নির্জনে অশ্রু বিসর্জন করলেন। 'বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে'—এ বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রেরই শোকসন্তপ্ত মর্মের কথা! বিপত্নীক হওয়ার আট মাস পরে পিতামাতার আদেশে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন। এই রাজলক্ষ্মী দেবীই ছিলেন বঙ্কিমের জীবনসঙ্গিনী। কথিত আছে, দ্বাদশবর্ষীয়া শীর্ণকায়া, রুগ্না রাজলক্ষ্মীকে দেখে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের অপছন্দ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমি ইহাকে বিবাহ করিব।' এই রাজলক্ষ্মী দেবী হালিশহরের প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশের মেয়ে ছিলেন।

যশোরেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হলেন। দীনবন্ধু তখন ডাকবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। দুজনে দুজনকে আগে কখনও দেখেন নি, কিন্তু 'প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় পরস্পরের রচনা পড়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এখন 'এক প্রতিভা অপর প্রতিভার সহিত সাক্ষাৎ আলাপে প্রবৃত্ত হইল; এক বিদ্যুৎ অপর বিদ্যুৎকে আলিঙ্গন করিল।' বন্ধুর দ্বিতীয়বার বিয়ের সময় দীনবন্ধুই উদ্যোগী ছিলেন। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল, তা সাধারণ বন্ধুত্ব নয়; নবীনচন্দ্রের কথায় —সে যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল।

১৮৬০, জানুয়ারি।

বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়াতে বদলি হয়ে এলেন।

মেদিনীপুর জেলায় কাঁথির সন্নিকটেই নেগুঁয়া। তখন মহকুমা এখানেই ছিল, পরে স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায়, মহকুমা কাঁথিতে উঠে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমার হাকিম হয়ে এলেন। এখানকার স্মৃতি তাঁর জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে দুটি ঘটনার জন্য; এখানে থাকাকালীন তাঁর জীবনসঙ্গিনী হয়ে আসেন রাজলক্ষ্মী দেবী—বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী। আবার এইখানেই তাঁর শিল্পী-মানসের সেই সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার জন্মের সূচনা। কথিত আছে, এইখানে সমুদ্রতীরে অবস্থিত চাঁদপুর বাংলোতে এক গভীর রাত্রে এক-জন কাপালিক এবং শুভ্রবসনা এক রমণীর তিনি দর্শন পেয়েছিলেন। এইখান-কার সমুদ্র ও অরণ্যের শোভা দেখেই শিল্পীর মনে কপালকুণ্ডলার বীজ উপ্ত হয়। এইখানেই জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল; তিনি পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইনিই বিষবৃক্ষের রঘুদেব ঘোষাল।

নেগুঁয়াতে বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থানকাল মাত্র ন'মাস; এর পর তিনি খুলনাতে বদলি হয়ে এলেন। তখন তাঁর বেতন একশত টাকা বৃদ্ধি হয়। খুলনা তখন যশোরের অধীন একটি মহকুমা মাত্র। তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় আসেন তখন এইখানেই ঈশানচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ইনি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্তের পিতা ছিলেন। ইনিও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন: 'উভয়ের মধ্যে অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজকর্ম হইতে অবসর লওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন রাজকার্যে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং বঙ্কিমবাবু আমার পিতাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন এবং তাঁহার ঋষিতুল্য আদর্শ চরিত্র লক্ষ্য করিয়া বড় ভালবাসিতেন।' রামবাগানের সংস্কৃতিসম্পন্ন দত্তপরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক তখন থেকেই ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই সূত্রেই উত্তরকালে কৃতবিদ্য রমেশচন্দ্র তাঁর পরম স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন।

নববিবাহিতা কিশোরী পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনার হাকিম হয়ে এলেন তখন এখানে চলেছে ঘোর অরাজকতা—একদিকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, অন্যদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব। দুইটিই তিনি

দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নীলকরের ইতিহাসে আমাদের প্রয়োজন নেই অথবা নীলকর সাহেবদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদের বিস্তারিত বিবরণও আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। কেন না নীল আন্দোলনে তাঁর কোনো ভূমিকাই ছিল না। উনিশ শতকের বাংলার এই প্রথম গণ-আন্দোলনের সঙ্গে দু'জন বাঙালী সন্তানের নাম চিরকালের মতন জড়িত আছে; তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর অপর ব্যাক্ত বঙ্কিম-সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্র। বিষধর নীলকর ভুজঙ্গের করাল মূর্তির ছায়া আমরা কি আজো দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রত্যক্ষ করি না? বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় এসে পৌঁছলেন তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছে।

নীলকরদের মধ্যে তখন মরেল সাহেবের খুব নাম।

ছোটোলাট গ্র্যাণ্ট সাহেব এই মরেলকে একজন 'Model settler' বলে উল্লেখ করেছেন। যশোরের একটি অঞ্চলে একটি নগর বসিয়ে তিনি তার নাম রেখেছিলেন মরেলগঞ্জ। অঞ্চলটি বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাভুক্ত। তিনি খুলনায় এসে দেখলেন মরেল সাহেবের দোর্দণ্ডপ্রতাপ; আদর্শ প্ল্যাণ্টারই বটে—লাঠিয়াল পোষেন, সৈন্য রাখেন; বন্দুক ও সড়কির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এক বছর হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনার চার্জে আছেন, এমন সময় মরেল সাহেব এক দাঙ্গা করে বসলেন। তখন শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ('দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা এরই বর্তমান বংশধর); নামেই ভারতবন্ধু, আসলে এই কাগজটা (ইহা স্থাপিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের কুড়ি বছর আগে ১৮১৮ সনে) ছিল ভারতের শ্বেতাঙ্গ সমাজের বন্ধু। মরেল সাহেব যে দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলেন, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তার যথার্থ বিবরণ প্রথমে প্রকাশিত হয়নি; বরং স্থানীয় হাকিম ও পুলিশের উপর কটাক্ষ করা হয়। দাঙ্গার পর মোকদ্দমা হয়। এই দাঙ্গার তদন্তের ভার ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর। দাঙ্গাটা হয়েছিল খুলনার বড়খালি গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং পুলিশ নিয়ে সেই গ্রামে তদন্তে এসেছিলেন। মরেল সাহেবের লাঠিয়ালরা এই গ্রামে শুধু অবাধ লুণ্ঠন চালায়নি, বহু নিরীহ প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল আর কম বয়সের মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গ্রামটির অধিবাসী সকলেই প্রায় মুসলমান। সেখান থেকে তিনি এলেন মরেলগঞ্জে। এসে দেখলেন, সাহেবেরা পলাতক।

ধরা পড়ল সাহেবের বেতনভোগী বাঙালী লাঠিয়ালরা। বঙ্কিমচন্দ্র একজন সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট বের করে আসামীদের বিচারের জন্য সদরে পাঠালেন, তিনি তদন্তকারী ছিলেন বলে নিজে এই মামলার বিচার করেন নি। জনশ্রুতি এই যে, মরেল সাহেবের পক্ষ থেকে সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে একলাখ টাকা ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, তাঁকে মারবার ষড়যন্ত্র করা হয়। মরেলগঞ্জে নীলকরদের প্রতাপ তিনি চিরদিনের মতন মাটিতে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট বেনব্রিজ সাহেব তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে খুলনার ভারপ্রাপ্ত হাকিমের কাজের প্রশংসা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আবার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়।

শুধু সরকারী রিপোর্টে নয়, অন্যত্র প্রকাশিত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে খুলনা মহকুমায় ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে অত্যাচারী ইংরেজদের উপদ্রব আর চোর-ডাকাতের অত্যাচার দমন করেছিলেন। বাকল্যাণ্ড সাহেব (যিনি একসময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরওয়ালা ছিলেন) লিখেছেন: 'While incharge of the Khulna Sub-division, he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals.'*

আর স্বনামধন্য সমাজসেবক ও ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'নববার্ষিকী'তে লিখেছেন: 'বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুলনার হাকিম থাকাকালীন কিরূপ দক্ষতার সহিত কার্য করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। মরেলগঞ্জের মরেল সাহেবের দৌরাত্ম্য যে ইনি কি প্রকারে নিবারণ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে যে ইঁহার প্রতাপে পলায়িত হিলি সাহেব ও অন্যান্য দুরাত্মা প্রজাপীড়ক কর্মচারীকে ধৃত করিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন তাহা এখানে বলা বাহুল্য। এইমাত্র বলিলেই হইবে যে ইঁহার সময় হইতে খুলনার পাঁচখানার প্রজাগণ নির্ভয় হইয়াছিল—নীলকরগণ যে দেশের রাজা নহে তাহা জানিয়াছিল।' কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও অগ্রজ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন। বাইশ বছর বয়সের

---

* *Bengal under Lieutenant Governors:* C. E. Buckland.

একজন তরুণ হাকিমের পক্ষে এইরূপ নির্ভীকতা ও কর্মদক্ষতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

১৮৬৪, মার্চ মাস।

বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা থেকে বারুইপুর বদলি হয়ে এলেন।

মরেলগঞ্জের দাঙ্গার পর থেকেই হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল—সরকারী মহল ও জনসাধারণের মধ্যে। তাঁর বারুইপুরের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করেছেন মজিলপুর নিবাসী কালীনাথ দত্ত। এই বছরেই নূতন রেজিষ্টারী আইন পাশ হয় এবং এই কালীনাথ দত্ত বারুইপুর রেজিষ্টারী অফিসের হেড ক্লার্ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অন্যতম সতীর্থ ডেপুটি হেমচন্দ্র কর দুজনেরই স্নেহাস্পদ ছিলেন কালীনাথ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ছয় বছর পরে বঙ্কিম-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

'বঙ্কিমবাবু যখন বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়। তখন ইংরেজী ১৮৬৪ সাল। সে বৎসর ৫ই অক্টোবরের সাইক্লোন-ঝড়ে ও জলপ্লাবনে ডায়মণ্ডহার্বার, মুরাগাছা, টেংরাবিবি, গঙ্গাধরপুর, বাইশহাটা, মণিরটাট প্রভৃতি গ্রাম নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে ঝড়ে এদেশের অধিকাংশ বাড়িঘর ভূমিসাৎ হইয়া যায়; পরে কয়েকটি সমুদ্রতরঙ্গ বঙ্গোপসাগর হইতে ব্যাত্যাতাড়িত হইয়া আসিয়া সাগরকুলবর্তী দক্ষিণপ্রান্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দৈবদুর্ঘটনায় এ দেশের বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'*

এই উপলক্ষে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে একটি রিলিফের ব্যবস্থা হয় এবং ২৪-পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সাইক্লোন-বিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফের কাজের সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করেন ও এইজন্য রিলিফ ফাণ্ড থেকে যথোপযুক্ত পরিমাণ অর্থ তাঁর নিকট প্রেরিত হয়। কালীনাথ দত্ত লিখছেন : 'বঙ্কিমবাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি

---

* প্রদীপ, ১৩০৬

কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাইল, চিড়া, লবণ, কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েক থান পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যজাত সঙ্গে আমাকে লোকের অন্নাভাব ও পরিধেয় কষ্ট দূর করিবার জন্য মন্ত্রেশ্বর নদের (হুগলী নদীর) পার্শ্ববর্তী টেংরাবিবি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধরপুরে পাঠান।...ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমবাবু দুর্ভিক্ষকার্যের আধিক্যপ্রযুক্ত অল্পদিনের জন্য ডায়মণ্ডহার্বার মহকুমার ভার গ্রহণ করেন। ডায়মণ্ডহার্বার হইতে আসিয়া বাবু হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের ভার লইলেন। সাইক্লোনে এই দুইটি মহকুমাই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল।'

রিলিফের কাজে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতার কথা 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকা থেকেও অল্পবিস্তর জানা যায়। তিনি বারুইপুরে কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে তার উল্লেখ আছে। তিনি লিখছেন: 'সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গভর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। তিনি অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য সম্পাদন করেন। কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন।...বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।'*

এইবারও ২৪-পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেটের বার্ষিক রিপোর্টে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করা হয় এবং ১৮৬৬ সনের প্রারম্ভে আবার তাঁর বেতন বৃদ্ধি হয়। বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি; এখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলে ঘোষিত হলেন। 'Babu Bankim Chandra Chatterjee alone is capable of performing the works of two Deputy Magistrates.'—২৪-পরগণার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর রিপোর্টে এই মন্তব্য করেছিলেন। ১৮৬৭ সনের জুলাই মাসে মাত্র দেড়মাসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন সরকারী আমলাদের বেতনবৃদ্ধির

* সংবাদ প্রভাকর, ১৮৬৫, ১২ই মে।

জন্য একটি কমিশন বসেছিল। হাইকোর্টের জজ প্রিন্সেপ সাহেব প্রথমে এই কমিশনের সম্পাদক ছিলেন। কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রিন্সেপ সাহেব অবসর নিয়ে চলে যান। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার এখন কাকে দেওয়া যায়? চীফ সেক্রেটারি তখন বঙ্কিমচন্দ্রকেই এই কাজের উপযুক্ত মনে করলেন। একজন বাঙালী হাকিমের পক্ষে সেদিন এটা কম গৌরবের কথা ছিল না। এই কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণার সদর, আলিপুরে বদলি হয়ে এলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুর থেকে বদলি হওয়া সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে। তাঁর জীবনীকার বা তাঁর স্মৃতিলেখকদের মধ্যে কেউই এটির উল্লেখ করেন নি, কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক এই সম্পর্কে অনুসন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছেন যে, ইহা জনশ্রুতি মাত্র নয়, ইহা সত্য ঘটনা। নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বেই তিনি বদলি হতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদিন তিনি এজলাসে বসে কাজ করছেন, এমন সময় কাছারির সামনে তুমুল ঢাকের বাদ্য বেজে উঠল। হাকিম হতচকিত হয়ে পেশ্‌কারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাছারির সামনে ঢাক বাজায় কে? পেশ্‌কার উত্তরে জানাল যে, রায়চৌধুরী বাড়ির লোকেরা ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছে তাঁদের বাড়ীর একটা পূজোর ব্যাপারে। বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললেন—'আমি হাকিম, কাছারিতে বসে সরকারি কাজ করছি, ওরা জানে না? বাজনা বন্ধ করতে বলো।' হাকিমের হুকুমে তখনি বাজনা বন্ধ হল। কথাটা কর্তাদের কানে গেল। এই রায়চৌধুরী পরিবার বারুইপুরের প্রবল প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। তাঁরা হাকিমের এই মেজাজ বরদাস্ত করলেন না। কর্তার আদেশে নায়েব গিয়ে সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে আবেদন জানালেন যে, বারুইপুরের হাকিমকে অবিলম্বে বদলি করা হোক। জমিদারের অনুরোধ রক্ষিত হল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বদলির চিঠি এলো বঙ্কিমের কাছে। সেই চিঠি পেয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। বিস্মিত হলেন বটে, কিন্তু বারুইপুর তাঁকে ত্যাগ করতে হল। কর্মজীবনে এমনভাবে লাঞ্ছিত তিনি আর কোথাও হন নি।

আলিপুরে দুই বছর সাড়ে তিন মাস কাজ করার পর তিনি মুর্শিদাবাদে বদলি হন। আলিপুরে কাজ করার সময়েই তিনি ১৮৬৯ সনের জানুয়ারি

মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এল. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তখন তাঁর পদোন্নতি হয় এবং এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের নাম দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হিসাবে ঘোষিত হল। এইখানেই তিনি কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর বেতন হয় সাতশত টাকা। মুর্শিদাবাদ তখন রাজসাহী ডিভিসনের অন্তর্গত ছিল এবং কমিশনারের সদর-দপ্তর বহরমপুরেই ছিল। বহরমপুরে তাঁর অবস্থানকাল চার বছর সাড়ে চার মাস ছিল এবং শেষের দিকে এক মাসের জন্য তিনি কমিশনারের পার্সন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাজ করেন। তাঁর চাকরিজীবনের এই কর্মস্থলটি তাঁর সাহিত্যজীবনে অক্ষয় হয়ে আছে 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্য। এই সময়ে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তিনি নগ্নপদে নগ্নদেহে উত্তরীয় মাত্র সম্বল করে কাছারীতে এসে বসতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে তখন এখানকার জিলা জজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বেনব্রিজ সাহেব। ইনি পূর্বে যশোরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং সেইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। সেই আলাপ এখন বন্ধুত্বে পরিণত হল এবং যে ঘটনা উপলক্ষে ইহা হয়, এখানে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ, এই ঘটনাটির মধ্যে বঙ্কিম-চরিত্রের একটি বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তখন বহরমপুরে একটি সেনানিবাস ছিল ; কর্ণেল ডাফিন নামে এক উদ্ধত প্রকৃতির ইংরেজ ছিলেন ঐ সেনাদলের কম্যাণ্ডিং অফিসার। এরই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ বেধেছিল। গোরা-ব্যারাকের উঠানের উপর দিয়ে একটা সরু রাস্তা গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কাছারী যেতেন ঐ রাস্তা দিয়ে, কখন পায়ে হেঁটে, কখন বা পাল্কী চড়ে। আরো অনেক লোক এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করত। গোরাদের তাতে প্রবল আপত্তি। একদিন বিকেলে বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কী চড়ে কাছারী থেকে বাসায় ফিরছিলেন। পাল্কীর একদিকের দরজা বন্ধ ছিল। পাল্কী যখন মাঝপথে, তখন পাল্কীর বন্ধ দরজার উপর সজোরে কে যেন করাঘাত করল। চকিতে পাল্কীর দরজা খুলে বঙ্কিমচন্দ্র লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন। দেখেন, সম্মুখে একজন সাহেব। এই সাহেব কর্ণেল ডাফিন। 'Who the devil you are ?'—ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করেন বঙ্কিমচন্দ্র।

সাহেব উত্তর না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে সবলে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর কাছে সাহেবের এই উদ্ধত আচরণ অসহ্য বোধ হল। পরের দিন তিনি কর্ণেলের নামে ফৌজদারীতে নালিশ করলেন। সাহেবের নামে নালিশ করেছে বাঙালী—যেমন তেমন সাহেব নয়, একেবারে মিলিটারি সাহেব। এই সংবাদে বহরমপুরে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তারপর যখন সাহেবের উপর সমন জারী হল তখন সেই চাঞ্চল্য প্রবল হয়ে উঠল। বিচার দেখতে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে শহরের লোক ভেঙে পড়ল। তখনকার দিনে এমন মামলা ছিল অশ্রুতপূর্ব। শ্বেতাঙ্গ মহলে হুলুস্থুল পড়ে গেল। শেষপর্যন্ত জেলা জজ বেনব্রিজ সাহেবের মধ্যস্থতায় এই অপ্রীতিকর ঘটনার অবসান হয়। ডাফিন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অব্যাহতি লাভ করেন। তিনি মোকদ্দমা তুলে নিলেন।

রাজপ্রসাদ নয়, আত্মপ্রসাদই শ্রেষ্ঠতর।

ডেপুটি বঙ্কিমের কাছে বাঙালী সেদিন এই শিক্ষাই লাভ করেছিল।

মুর্শিদাবাদের আর একটি ঘটনা উল্লেখ্য।

তখনকার দিনে বাকি খাজনার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির ভার থাকত ডেপুটিদের উপর। এই ধরণের আঠারটি মোকদ্দমার ফাইল এলো বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। বাদী ও প্রতিবাদী দুইপক্ষই বিত্তবান জমিদার। এক দিকের উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অন্যদিকের গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্যর গুরুদাস সে-সময় বহরমপুরে ওকালতি করতেন। মোকদ্দমা-কয়টি মুলতুবী রাখার জন্য দুইপক্ষেরই উকিল প্রার্থনা করলেন। কারণ আপোষে মিটিয়ে ফেলার কথা হচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। দ্বিতীয়বার শুনানীর দিন আবার সময় চাওয়া হয়। ডেপুটি সাহেবের আপত্তি ছিল না সময় দিতে, আপত্তি ছিল কমিশনারের। প্রথমবার সময় দেওয়াতে কমিশনার সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। কমিশনারের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বারের প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন।

এই সাহস বঙ্কিমচন্দ্রেরই ছিল।

উপরওয়ালা কিসে খুশি থাকবেন এটা তাঁর কাছে বড়ো ছিল না—সাধারণের

সুখ-সুবিধাটাই ছিল তাঁর কাছে বিবেচনার বিষয়। এই সাহস আর তেজ তাঁর ছিল বলেই না তদানীন্তন ছোটোলাট স্যর জর্জ ক্যাম্বেল সেই সময় একবার বহরমপুর পরিদর্শনে এসে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কিরূপ ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, সে কাহিনী সুপরিচিত। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে বসিয়ে রেখে তিনি আগে ডেপুটির সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

বি. এ পাশ করার পর চাকরিজীবনে প্রবিষ্ট হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একে একে ষোলটি বছর অতিক্রম করলেন এই ষোল বছরে নবযুগের রূপরেখা কতখানি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং এই কালের মধ্যে কি কি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বঙ্কিম জীবনের প্রেক্ষাপট হিসাবে আমাদের জানা দরকার। তিনি যখন সরকারি কর্মে প্রবিষ্ট হন তখন তাঁর বয়স ছিল কুড়ি বছর দু'মাস এবং কর্মজীবনে তিনি যখন মুর্শিদাবাদ পর্বে উপনীত হলেন তখন তাঁর বয়স হিসাব মত ছত্রিশ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কনিষ্ঠের বিবরণ মত তখন তাঁর গোঁফের চুল পাকতে আরম্ভ করেছে এবং মাথার অনেকগুলি চুলও পেকেছে। তখন বাংলা সাহিত্যে 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্ণযৌবন এবং বিদগ্ধ সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিপত্য এই সময় থেকেই পরিলক্ষিত হয়।

১৮৫৮ সালে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হল। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতির কবি রঙ্গলালের কাব্যেই প্রথম আভাসিত হল পরাধীনতার জ্বালাবোধ। স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের প্রয়াস ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' এই সময়কার ঘটনা। পরের বছরে নীলবিদ্রোহ বাঙলাকে করল আলোড়িত—সে আলোড়ন জাগিয়েছিল হরিশ্চন্দ্রের লেখনী আর দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক। মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য নীলদর্পণের সমসাময়িক। ১৮৬১-তে প্রকাশিত হল নবযুগের বাঙালীর জীবন-ধর্মান্বিত মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' কাব্য—উদাত্ত জীবনচেতনা ধ্বনিত হল বাঙলা কাব্যে। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু স্থাপন করেছেন 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা', ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পাশ হল নূতন কাউন্সিল আইন।

১৮৬২ সনে ভারতে হাইকোর্ট ও বাঙলা প্রদেশে ব্যবস্থা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু' কাব্যগ্রন্থ এর দু'বছর পরে প্রকাশিত হয় এবং এই সময়েই বিদ্যাসাগর তাঁর মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় স্থাপন করে

বেসরকারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তরের সূচনা করেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে (১৮৬৫) বাঙালীর একাত্মবোধের বিকাশ দেখা গেল। প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে কলিকাতায় স্থাপিত হয় 'দি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এ্যাসোসিয়েশন' আর নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭)। জাতীয় ভাবধারা উদ্বোধনের প্রথম মঞ্চ ছিল এই হিন্দুমেলা। সাপ্তাহিক বাঙলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র আবির্ভাব হয় যশোর থেকে শিশিরকুমার ঘোষের প্রচেষ্টায় (১৮৬৮) ; তিন বছর পরে ইহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় এরপরেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার আবির্ভাব এবং কেশবচন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত ভারত সংস্কার সভা উল্লেখ্য (১৮৭০)। নবজাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই প্রয়াস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন ছিল এই সভার মূল উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল গুপ্তের ইংলণ্ড থেকে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ-নেতৃবর্গ কর্তৃক প্রকাশ্য সভায় তাঁদের সম্বর্ধনা এবং কেশবচন্দ্র কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজকে দৈনিকে পরিণত করা (১৮৭১)। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হল ১৮৭২ সনে; 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। এই বছরের আর দুটি বিশেষ ঘটনা—'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাব ও কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় বিশেষ বিবাহ আইন বা সিবিল ম্যারেজ য়্যাক্ট। এর পরের বছরে বিদ্যাসাগর স্থাপন করেন মেট্রোপলিটান কলেজ। মাইকেল ও দীনবন্ধু তিন-চার মাসের ব্যবধানে মারা গেলেন এই বছরেই (১৮৭৩)। দেখা যায় যে, এই ষোল বছর কালের মধ্যেই স্বদেশচেতনার চালচিত্রটি রঙে ও রেখায়, ভাবে ও আবেগে সুবলয়িত হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভাকে আশ্রয় করে এই চিত্র তার ইতিহাস-নির্দিষ্ট সম্পূর্ণতা পেতে থাকে।

তাঁর বহরমপুর ত্যাগ কালে, সেখানকার উকীল, হাকিম, জমিদার, কেরাণী ও স্কুল-কলেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকবৃন্দ প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত ও ভদ্রব্যক্তিগণ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মানার্থে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশিষ্টরূপ যে আয়োজন

করেছিলেন, তা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সপ্তাহকালব্যাপী এই অভিনন্দনে অগ্রণী ছিলেন দেওয়ান রাজীবলোচন রায় আর বৈকুণ্ঠনাথ সেন। বহরমপুরের নাগরিকদের পক্ষ থেকে এবং স্থানীয় সারস্বত সভার (ডাক্তার রামদাস সেন ছিলেন এর সভাপতি) পক্ষ থেকে তাঁকে দুখানি মানপত্র দেওয়া হয়েছিল। এদেশে কবি ও সাহিত্যিককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ; তিনিই মাইকেলকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধিত করেছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারক হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়, বহরমপুরের অভিনন্দন ছিল পরোক্ষভাবে বাঙলা সাহিত্যকে। বাঙালীর চক্ষে তিনি সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানগরিষ্ঠ প্রথম গ্র্যাজুয়েট বা হাকিম মাত্র ছিলেন না—ছিলেন বাঙালীর প্রিয় ঔপন্যাসিক, ছিলেন বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক ও বাঙলা সাহিত্যমণ্ডলের রাজরাজেশ্বর।

মুর্শিদাবাদের পর বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হয় ২৪-পরগণা, হুগলী, হাওড়া, কটক, যশোর ও মেদিনীপুর, এই কয়টি জেলার বিভিন্ন স্থানে। হুগলীতে তিনি একাদিক্রমে প্রায় পাঁচ বছর ছিলেন। সরকারী মহলে তখন তাঁর যেমন প্রতিপত্তি তেমনি সুনাম। হুগলীর কলেক্টর বঙ্কিমচন্দ্রের উপর জেলার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন, বর্ধমান বিভাগের কমিশনার তাঁর কার্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে কিছুদিনের জন্য পার্সন্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট করে নিয়েছিলেন। হাওড়া-পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলেক্টর বাক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ। সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তখন এই জেলার এ্যাক্‌টিং ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্র চিরকাল পুলিশের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন; তাঁর এজলাসে পুলিশ এলে যেন আর রক্ষা ছিল না—তিনি পুলিশ-চালানি মোকদ্দমাগুলি প্রায়ই ছেড়ে দিতেন। পুলিশের উপরওয়ালা ম্যাজিস্ট্রেট। হাওড়ার পুলিশ একবার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নির্দেশে এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করল। বুড়ির অপরাধ সে গোলপাতা দিয়ে একখানা ঘর তৈরি করেছিল। কোনো দাহ্য পদার্থ দিয়ে মিউনিসিপ্যাল এলাকার ভিতরে ঘর তৈরি করা নিষিদ্ধ ছিল এবং ঐ মর্মে এক নোটিশ জারি হয়েছিল। উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ইংরেজী combustible শব্দটির বাঙলা করা হয়েছিল জলীয় পদার্থ। গোলপাতার আচ্ছাদনযুক্ত-

কুটীরবাসিনী ঐ বৃদ্ধার হাতে যখন ঐ নোটিশ গিয়ে পৌঁছল তখন একজন তাকে তার মর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বলে যে, সে যেন জল দিয়ে তার ঘর না ছায়। বৃদ্ধা কিছুতেই তার কুটীরের আচ্ছাদনে জল লাগাতে দিত না।

এই মামলা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে এলো, তিনি বুঝলেন, বৃদ্ধাকে অনর্থক পীড়ন করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির ইংরেজ সেক্রেটারি-কৃত combustible শব্দটির বিচিত্র বঙ্গানুবাদ দেখে তিনি বৃদ্ধাকে সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহতি দিলেন। রায়ে লিখলেন—'The meaning of the Notice is not explicit. I let go the accused on the ground of the insufficiency of the Notice.' বৃদ্ধার বেকসুর খালাসে বাক্‌ল্যাণ্ড তো রেগে আগুন। তিনি নথি তলব করলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ের উপর তিনি মন্তব্য লিখলেন: 'Bankim Chandra's vanitiy in the knowledge of Bengali language has misled this judgment.' এই মন্তব্য পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখে পাঠালেন: 'You are not my judicial superior officer, and you have no right to criticise my judgment. Unless you apologise to me within one month, I will bring up this matter to the notice of the Commissioner.' কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমা চাইলেন না। কিছুদিন পরে কমিশনার সাহেব হাওড়ায় এলেন; বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। একজন অধীনস্থ নেটিভ ডেপুটি যে এতটা করে তুলবে, বাক্‌ল্যাণ্ড সেটা ধারণা করতে পারেন নি। তাঁকে শেষ পর্যন্ত রায়ের উপর লেখা সেই মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে হয় এবং এজন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। এই বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবই পরে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী হয়েছিলেন। ডেপুটি বঙ্কিম এইভাবেই কর্মজীবনে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। কথিত আছে, ছোটোলাট স্যর অ্যাস্‌লি ইডেনের কানেও এই ঘটনাটি উঠেছিল এবং তিনি এজন্য কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। এই সময়ে যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

এর পর ১৮৮১ সনের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চার মাসের জন্য রাজস্ব বিভাগের সহকারী সচিবের পদে নিযুক্ত হন; স্বল্পকালের জন্য হলেও এই নিয়োগ তাঁর

জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। তাঁর নিয়োগের চার মাস পরেই ঐ পদ অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়, বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলি' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখালেখি হয়। ক্ষুব্ধ শিক্ষিত বাঙালী উচ্চপদের অবলুপ্তিকে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্রের এই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' রচনায় হাত দিয়েছিলেন।

১৮৮৩ সনের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় দ্বিতীয়বার বদলি হয়ে এলেন এবং পরবর্তী বৎসরের শেষভাগে তিনি প্রথমশ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন। কর্মজীবনে ইহাই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ পুরস্কার। তখন তাঁর মাসিক বেতন আটশত টাকা। পাঁচ বছর পরে তিনি আলিপুরে বদলি হয়ে এলেন; বেকার সাহেব তখন ২৪-পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট। তখন জেলার রেভিনিউ বিভাগটি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বার্ষিক বিবরণী দেওয়ার সময় এলো। রেভিনিউ statement ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে উঠল না। ক্রমে রেভিনিউ বোর্ড থেকে তাগিদ এলো। বঙ্কিমচন্দ্র নির্বিকার, তিনি তাগিদের উত্তর দিলেন না। ব্যাপার কি?—জানতে এলেন বেকার সাহেব। 'Is the statement ready?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; কথার সুরে কিছু অপ্রসন্নতা পরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্র এজলাসে বসে উত্তর দিলেন—'No, sir.'

—Why not?

—The clerks are doing their best. You should know that it takes time to prepare the Revenue statement.

ম্যাজিস্ট্রেট তখন স্বচক্ষে আমলাদের কাজ দেখলেন। দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং সব কথা কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন। আলিপুরে একবার একটা মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট থেকে একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার এসে আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন; অপর পক্ষে ছিলেন তারক পালিত; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনতেন। ইংরেজ ব্যারিস্টারের আচরণে সৌজন্যের অভাব ছিল, তা হাকিমের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি টেবিল চাপড়িয়ে, হাত-মুখ নেড়ে নানা ভঙ্গিতে সাক্ষীকে জেরা করছিলেন। হঠাৎ কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন

সাক্ষীকে। সাক্ষী উত্তর দেওয়ার আগেই বিচারকের আসন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বলে উঠলেন—'The question is irrelevant—I disallow it.'

—Irrelevant!

—Certainly irrelevant.

নেটিভ হাকিমের এই কঠোর মূর্তি দেখে সেই সাহেব ব্যারিস্টারের লালমুখ আরো লাল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর ভুল বুঝলেন। উত্তরকালে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে তারক পালিত বলতেন, বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই একজন দুঁদে হাকিম ছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় ভূদেববাবু বলতেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই চাকুরির প্রধান অলঙ্কার। তাঁর ন্যায়পরায়ণতাকে পুলিশের লোক রীতিমত ভয় করত। চাকরিজীবনে তিনি তাঁর উপরওলার বিরাগভাজন হয়েছেন, প্রত্যাশিত প্রোমোশন লাভে বিলম্ব হয়েছে, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ন্যায়পরায়ণতা বিসর্জন দেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক আগে থেকেই এদেশে অনেকেই হাকিমি বা ডেপুটিগিরি করে এসেছেন এবং তখন থেকেই একটা ট্র্যাডিসন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, হাকিমরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং অনেক নির্বোধ হাকিম বঙ্কিমচন্দ্রের আমলেই এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। একবার এজলাসে তাঁকে আসামীপক্ষের এক উকীল বলেছিলেন, 'হুজুর আপনি হাকিম—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।' এজলাস থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যতক্ষণ এজলাসে থাকি ততক্ষণ। তাই বলে আমাকে দুনিয়ার বাদশা মনে করার কোনো হেতু দেখি না। উকীলবাবু তাঁর জীবনে অনেক হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক সওয়াল করেছেন, এবং সকল হাকিমকেই তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলে জ্ঞান করতেন; কিন্তু কখন কোনো হাকিমের মুখ থেকে এমন পরিহাস-স্নিগ্ধ মন্তব্য তিনি শোনেন নি। হাকিমিতে সত্যিই বঙ্কিমচন্দ্রের দারুণ বীতশ্রদ্ধা ছিল। এদেশের হাকিমদের একটি সত্যিকার চিত্র আছে তাঁর 'গর্দভ' প্রবন্ধে; কৌতুহলী পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন।

১৮৯০। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন তিপ্পান্ন বছর। তিনি পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করলেন। দরখাস্ত অগ্রাহ্য হল। পঞ্চান্ন বছরের আগে অবসর গ্রহণের নিয়ম নেই। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হলেও তখন তিনি বেশ সুস্থকায়, সবল ও

বলিষ্ঠ ছিলেন। ইলিয়ট সাহেব তখন ছোটোলাট। দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করলেন। ছোটোলাট ও ছোটোলাট পত্নী দুজনেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। লেডি ইলিয়টের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষ-বৃক্ষ'-এর স্থান-বিশেষ নিজে অনুবাদ করে সেই পাণ্ডুলিপি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।* লাটসাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তেত্রিশ বছর চাকরি করার পর, ১৮৯১, ১৪ই সেপ্টেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের ঠিক বার দিন পরেই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়।†

*বঙ্কিমচন্দ্রের এই পাণ্ডুলিপিখানি লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে বলে শুনেছি।

† এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরী-জীবনের ঘটনাগুলি শচীশচন্দ্র প্রণীত 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে সঙ্কলিত হয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

'চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ।'

'চাকরিই আমার জীবনের একটি বড় বিড়ম্বনা।'

তেত্রিশ বছর সগৌরবে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকার পর ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। প্রথম উক্তিটি করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কাছে, দ্বিতীয়টি চন্দ্রনাথের কাছে। চন্দ্রনাথ বসু যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ নিয়ে ঢাকায় যান, তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং সেই সময় তাঁর কাছে এই উক্তিটি করেছিলেন বাঙলার প্রথম গ্র্যাজুয়েট-হাকিম। এই ধরণের উক্তি তিনি আরো অনেকবার করেছিলেন অনেকের কাছে। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'আমার স্বাস্থ্যনাশের কারণ চাকরির চাপ।' একবার কলিকাতার জনৈক ধনী-সন্তান সরকারি চাকরিপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন একটি সুপারিশ-পত্রের জন্য, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, 'কি দুঃখে তোমাদের মতন ধনী-সন্তান এমন চাকরি গ্রহণ করে। চাকরিতে মনুষ্যত্ব নাশ হয়।' মোট কথা, চাকরি তাঁর কাছে কোনোদিনই সুখপ্রদ বলে বিবেচিত হয় নি, বরং একে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুতর দুর্ভাগ্য মনে করতেন। কেন? রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্য-বলে অনেক অনুগ্রহ বা অনুচিত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, তেমনি যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপযুক্তরূপ সম্মান বা পদোন্নতি লাভ করেন না। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁর প্রতিভার যোগ্য উন্নতিলাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। চাকরি রামমোহনও করেছিলেন, চাকরি বিদ্যাসাগর করেছেন; মাইকেল. ভূদেব, রঙ্গলাল ও দীনবন্ধুকেও চাকরি করতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ যে চাকরিকে তাঁদের জীবনের অভিশাপ বলে মনে করতেন, এঁদের

কারো জীবনেতিহাস থেকে তা জানা যায় না। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল কম স্বাধীনচেতা ছিলেন না। বরং বঙ্কিমচন্দ্র যা পারেন নি, বিদ্যাসাগর তা পেরেছিলেন। ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে বিরক্ত হয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন—ছোটোলাট হ্যালিডের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন নি। এর আগেও তিনি কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের তেজ বঙ্কিমের মধ্যে ছিল না। যে যুগে তিনি হাকিমি করতেন, তখন শাসক-শাসিতের সম্পর্কটা খুবই তীব্র রকমের ছিল; উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীরা তাঁদের অধীনস্থ নেটিভ কর্মচারীদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের কারো মধ্যে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি দেখলে তাঁরা যে খুব প্রসন্ন হতেন, তা নয়। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙালী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যকে তাঁর উপরওয়ালা একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার একটি বিল পাশ করার ব্যাপারে বলেছিলেন, 'Mr. Bhattacharya, I suspect your integrity.' তখন সেই মুহূর্তেই উপর-ওয়ালার এই অশিষ্ট মন্তব্যের প্রতিবাদ করে ক্ষেত্রনাথ চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বান্ধবদের মধ্যে অন্যতম। ইঞ্জিনিয়ার হলেও তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন এবং তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির বৈঠকখানায় সে যুগে মাঝে মাঝে যে সাহিত্য-সভা বসত তাতে ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি অনেকেই যোগদান করতেন। এই ক্ষেত্রবাবুর পদত্যাগ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, 'ক্ষেত্র, অত টাকা মাইনের চাকরিটা ছেড়ে দিলে? অবশ্য আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে হলে এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।'

তাঁর চাকরিজীবনের শেষভাগে এই আত্মমর্যাদা যখন ক্ষুণ্ণ হতে থাকে, তখনি বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণের কথা চিন্তা করেন। কালীনাথ দত্তকে তিনি একবার বলেছিলেন, কোনো উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন চলবার উপযুক্ত আয় হলে তিনি সরকারি কাজ থেকে অবসর নেবেন। 'এত তাড়াতাড়ি অবসর গ্রহণের চিন্তা কেন?'—কালীনাথের এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, তিনি অনেকদিন থেকে অনেক সাহেবকে কাজ শিখিয়ে একরকম মানুষ করে

আসছেন। তাঁরা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানাস্থানে চলে গেলেন। এখন যে সব তরুণবয়স্ক ও কাজে অনভিজ্ঞ সাহেব তাঁর উপর হাকিম হয়ে আসছে, তারা আবার উল্টে তাঁকে কাজ শেখাতে চায়। শুধু তাই নয়। আবার মাঝে মাঝে অন্যায়ভাবে তাঁকে ধমক দিতে চায়।

এই ধমক বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁর কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ে এইরকম দুর্ব্যবহারের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কালীনাথ দত্ত এইরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার ২৪-পরগণার কোনো উদ্ধত ছোকরা ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর নিজ এজলাসের মধ্যেই কর্কশ ভাষায় 'বঙ্কিম' 'বঙ্কিম' বলে ধমক দিয়েছিলেন। প্রকাশ্য এজলাসের মধ্যে এই রকম অশিষ্ট ব্যবহারে রীতিমত বিরক্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলতে বাধ্য হন: 'You should see, I am no longer Bankim, I now represent Her Majesty's Law and Justice. You know I can at once order your arrest and pass sufficient punishment for insulting Her Majesty's Court of Justice.' সাহেবটির ইহাতে বিলক্ষণ শিক্ষা হয় এবং সে অপ্রতিভ হয়ে ফিরে যায়।*

ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর অনুচিত বিদ্বেষ ছিল না। বরং তিনি ইংরেজকে এদেশের উদ্ধারকর্তা বলেই স্বীকার করতেন। আনন্দমঠে সেটা স্পষ্ট। কিন্তু যদি কখনো তাঁর কোনো উর্ধতন কর্মচারী তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করতেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত অভিমানে আঘাত লাগত। ডেপুটি-জীবনে সংঘর্ষটা হত প্রধানত এইজন্যেই। হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট বাক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষটা ছিল এই কারণেই। যাই হোক, আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে যেটা দেখতে পাই সেটা হল এই—তেত্রিশ বছর ডেপুটিগিরি করে এবং অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরে দু-দুটে সরকারী খেতাব লাভ করেও ইংরেজের আইন-আদালত ও ইংরেজের পিনাল কোডের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের খুব আস্থা ছিল না।

চাকরিজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই কি তিনি লিখেছিলেন: 'আইন যে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

থাকে।' ···'অপহরণের স্থায়িত্ব-বিধানের নাম আইন।' আরো লিখেছিলেন : 'আমাদের দেশে ভাল আইন ছিল না। বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে চোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়া, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।' তাঁর তেত্রিশ বছরের হাকিমির অভিজ্ঞতা আরো একটি কথায় অভিব্যক্ত হয়েছে : 'আদালত ও বারাঙ্গনা-মন্দির তুল্য।' আর দেশী হাকিমদের প্রসঙ্গে কমলাকান্তের জবানিতে বলেছেন : 'ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড'···এ পরিহাস নয়, ব্যঙ্গ নয়, তেত্রিশ বছর যাবৎ হাকিমির অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত মর্মান্তিক উপলব্ধি এবং সেদিনও যেমন, আজো তেমনি—ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

প্রথম জীবনে যতটা না হোক, শেষ জীবনে চাকরির উপর সত্যিই তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তিনি যখন দ্বিতীয়বার হাওড়ায় বদলি হয়ে আসেন, তখন ওয়েস্টমেকট সাহেব সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেইসময়ে একটি রেলওয়ে-মোকদ্দমার বিচার করে বঙ্কিমচন্দ্র আসামীদের খালাস দিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের তা মনঃপূত হয়নি।

তিনি সরাসরি হাকিমের এজলাসে এসে প্লাটফর্মের নীচে টুপি হাতে দাঁড়িয়ে বললেন—'Bankim Babu, you have let off the accused in the Railway case ?

—What of that ? চেয়ারে বসেই বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন।

—You ought to have convicted the accused.

—You are uttering what constitutes contempt of court. I now represent Her Majesty.

—You have done wrong, and you ought to be told so.

—I will draw proceeding against you.

তখন বুদ্ধিমান সাহেবের হুঁস হল যে, তাঁর কাজটা ঠিক আইন-সম্মত হয়নি। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে অব্যাহতি লাভ করেন। এইরকম ঘটনা যতই ঘটতে থাকে, কথিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, কোনো দিন হয়ত তাঁকে

চাকরি ছাড়তে হবে। সেই জন্যই তো তিনি আইন পরীক্ষা দিয়ে ওকালতির পথ উন্মুক্ত রেখেছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি যখন হাওড়ায় বদলি হন তখন তাঁর বাসা ছিল কলিকাতায় বৌবাজার-কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে। কলিকাতা থেকেই তিনি প্রত্যহ হাওড়ায় যাওয়া-আসা করতেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম হল, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করে সদরেই থাকতে হবে। হাওড়ায় থাকার অসুবিধা অনেক ছিল; তবু, মনে মনে বিরক্ত হলেও, তিনি এই আদেশ প্রতিপালন করেছিলেন। কিন্তু চাকরির স্বর্ণশৃঙ্খলের ভার যখনই তিনি দুর্বহ মনে করলেন তখনই অবসর নিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের কিছু আগে তাঁকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট করার কথা একবার উঠেছিল। তখন রমেশচন্দ্র দত্ত বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর। কোনো এক সূত্রে এই সংবাদটি তিনি জেনেছিলেন এবং কলিকাতায় এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন যে, অনেক সিবিলিয়ানের চেয়ে তাঁর যোগ্যতা অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আশঙ্কা হয়, ইংরেজ সিবিলিয়ানরা এতে বাধা দেবে। রমেশচন্দ্রের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানদের প্রবল আপত্তির ফলেই ছোটো-লাটের প্রস্তাব আর কার্যকরী হয়নি।

তাঁর চাকরিজীবনের প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ্য। পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা গভর্ণমেণ্টের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বাঙলা সরকারের দু'জন মাত্র সচিব বা সেক্রেটারি থাকতেন; একজনের অধীনে থাকত রেভিনিউ ও সাধারণ বিভাগ, অপরের অধীনে থাকত বিচার বিভাগ, নিয়োগ-বদলি ও পলিটিক্যাল বিভাগ। তারপর ১৮৭৯ সনে অর্থ-বিভাগের (Finance) দপ্তর সৃষ্টি হয়। মেকেঞ্জি সাহেব ছিলেন বাঙলার প্রথম ফিনান্স সেক্রেটারি এবং তাঁর অধীনে রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। একবছর কাজ করার পর রাজেন্দ্রনাথ দীর্ঘকালের জন্য ছুটি নিলেন এবং তাঁর জায়গায় হেমচন্দ্র কর অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হলেন। তিনমাস পরে কর্তৃপক্ষ হেমচন্দ্রের স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করলেন। এই পদের Permanent incumbent ছিলেন উল্লিখিত প্রথম ব্যক্তি রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ঐপদে স্থায়ি হওয়ার কোনো প্রশ্ন ছিল না। অবশেষে

১৮৮২ সনে ঐ পদের অবলুপ্তি হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চার মাসকাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সম্মানিত পদ থেকে তাঁর অপসারণ-প্রসঙ্গে সেই সময়ে একখানি দেশীয় সংবাদপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা নিন্দা ভিন্ন আর কিছু নয়। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পাঠে লোকের মনে তখন এই ধারণা হয় যে, কোনো গর্হিত কাজের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। বাঙালী সম্পাদক তার ইংরেজী কাগজে যা লিখলেন, ইংরেজের কাগজ স্টেটসম্যানে রবার্ট নাইট তার প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন: 'We are informed that no 'charge' of any kind has been made against Baboo Bankim Chandra Chatterjee ..He is a man of high character and attainments, and whatever may be the reason for his transfer, we are glad to be assured that it implies no reflection on him as a public servant.' * কিন্তু উক্ত দেশীয় সংবাদপত্রখানি বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙলা রচনার প্রতি বিদ্বেষবশত তাঁর নামে যে অপবাদ সেদিন রটিয়েছিল, তার ফলে দেশীয় সমাজে তাঁর মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কারণে ঐ কাগজের সম্পাদককে কোনোদিন ক্ষমা করেন নি এবং তাঁর সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন। এই পত্রিকার নাম 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আর শিশিরকুমার ঘোষ তখন এর সম্পাদক ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কি বিদ্যাসাগর, কি মাইকেল এবং কি বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙলার এই তিনজন বরেণ্য সন্তান সম্পর্কে ও তাঁদের স্ব স্ব বৈপ্লবিক বা প্রাগ্রসর চিন্তাধারা সম্পর্কে ইনি বরাবরই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন।

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরিকে বিড়ম্বনা মনে করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে 'প্রথম—তাঁহার মত স্বাধীনচেতার পক্ষে চাকরির নিয়ম নিয়ন্ত্রণ কখনই

* The Statesman, 6. 2 1882

প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। দ্বিতীয়—তিনি মনে করিয়াছিলেন, চাকরি গ্রহণ না করিলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আরো অধিক কার্য করিতে পারিতেন। সাহিত্য-সেবা তাঁহার এতই আকাঙ্ক্ষিত ছিল যে, তিনি তাহাতেই সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবার বাসনা মনে পোষণ করিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, চাকরিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি সুবিধা হইয়াছিল, এমন কি চাকরি মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে, তাঁহাকে সাহিত্য সেবায় সাহায্য করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করেন, তখনো বাঙালীর সাহিত্য-সেবা আর্থিক হিসাবে লাভজনক হয় নাই। কাজেই চাকরির আয় না থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে হয়ত সাহিত্য-সেবার পথ বিঘ্ন-প্রস্তর-কণ্টকিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রকে যে কখন সাহিত্য-সেবার জন্য কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয় নাই, তাঁহার চাকরিই তাহার কারণ বলা যায়।' *

এই বিশ্লেষণ মেনে নিতে বাধা নেই। সাহিত্য-সেবার আগ্রহে 'বঙ্গদর্শন'-এর যুগে বঙ্কিমচন্দ্র যদি চাকরিতে ইস্তফা দিতেন, তাহলে বাঙলা ভাষাকে নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে তিনি যা দিতে পেরেছেন, তা পারতেন কিনা তা বিলক্ষণ সন্দেহের স্থল। তিনি যদি মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন, তাহলে তাঁকে অর্থাভাবে উদ্বিগ্ন হতে হত কিনা সেটাও বিচার্য। চাকরিজীবনেই তো বঙ্কিমচন্দ্রের বেশির ভাগ বই রচিত হয়েছিল, আবার এই চাকরি ছিল বলেই না তিনি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে নবাগত লেখকদের উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন এবং বাঙলার সাময়িক সাহিত্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং এই চাকরিটা তিনি যতই বিড়ম্বনা বা অভিশাপ বলে মনে করুন না কেন, সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা ডেপুটির চাকরি ভিন্ন কতদূর সম্ভব হত, বলা যায় না। তবে চাকরির উপর তাঁর বীতশ্রদ্ধার বিশেষ কারণ বোধ হয় এই যে, রাজসরকারে তিনি সুবিচার পান নি অথবা তিনি তাঁর যোগ্যতার উপযুক্ত পুরস্কারও লাভ করেন নি। তিনি তো প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হলেন প্রায় চাকরির শেষ পর্বে। তাঁর সমসাময়িকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইংরেজিতে দখল তখন আর কোনো

* বঙ্কিমচন্দ্র : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ডেপুটির ছিল না। আবার তাঁর মতো কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায় বিচারক হাকিমও তখন বিরল ছিল বললেই হয়; সরকারি কাজে তিনি কোনোদিন শৈথিল্য প্রকাশ করেছেন, এমন অপবাদ তাঁর কোনো উপরওয়ালার রিপোর্টে পাওয়া যায় না। এ সত্ত্বেও কেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রত্যাশিত প্রোমোশন লাভ করেন নি? ইহার কারণ অনেকে অনুমান করেন—আনন্দমঠ। 'আনন্দমঠ বাহির হইলে সাহেবরা চটিয়াছিল'—ইহা বঙ্কিমচন্দ্রেরই উক্তি। এই প্রসঙ্গে একটি বিচিত্র ইতিহাস আছে। আনন্দমঠ যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র তখন আলিপুরের হাকিম। থাকেন কলিকাতায় ভবানী দত্ত লেনে—স্থানটি কলুটোলার কাছেই। কথিত আছে, এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি হয় এবং সাসপেণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। এই বইখানি উপন্যাস হলেও, তিনি নাকি এর ভিতর দিয়ে রাজদ্রোহ প্রচার করেছেন—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সরকার থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে একটি কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। এবং সেই 'গোপনীয়' পত্রে তাঁকে বলা হয়, যদি 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজ এর স্বপক্ষে সমালোচনা করে তবেই তা সরকারের কাছে গ্রাহ্য হবে।

'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এর তখন যেমন সুনাম, তেমন প্রতিপত্তি। এর সম্পাদক তখন কৃষ্ণবিহারী সেন, ইনি কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বঙ্কিমচন্দ্র দুজনের কাছেই পরিচিত ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি এলেন কলুটোলায় এবং কৃষ্ণবিহারীকে তাঁর বিপদের কথা সব খুলে বললেন। কি রকম বিপদ? জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণবিহারী। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা সরকার এটা জানতে চান এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরার' যদি এই বিষয়ে সমালোচনা ক'রে আমার স্বপক্ষে মন্তব্য করে তবেই তাঁরা সেটা গ্রাহ্য করবেন। দুজনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে সেখানে কেশবচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণবিহারী তখন অগ্রজকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদের কথা জানালেন। তখনো পর্যন্ত কেশবচন্দ্র বা কৃষ্ণবিহারী কেউই আনন্দমঠ পড়েন নি। সেই রাত্রেই দুজনে মিলে পড়লেন বইখানা এবং কৃষ্ণবিহারী লিখলেন একটি সমালোচনা। কেশবচন্দ্র তার দুই-একস্থানে দু'একটি শব্দের পরিবর্তন করে দিলেন। যথাসময়ে সেটি 'মিরারে' প্রকাশিত হল এবং এই সমালোচনার

ফল ভালই হয়েছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের বিপদ কেটে গিয়েছিল সেবারের মতন। এই উপকারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সেন-ভ্রাতাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তখন থেকে 'মিরার'-এর সমালোচনাটিই তিনি আনন্দমঠে ছাপতেন। *

যে বছরে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস সীতারাম প্রকাশিত হয় সেই বছরটি (১৮৮৭) তাঁর জীবনে একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। তখন বাঙলা সাহিত্য, রমেশচন্দ্রের কথায়, বঙ্কিমময় হয়ে উঠেছে। এমন সময়ে বঙ্কিম-প্রতিভা প্রচারে অগ্রণী হলেন এক বিদগ্ধ উৎসাহী সমালোচক। তিনি গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। 'বঙ্গদর্শন'-এর দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'নব্যভারত' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে নবীন সাহিত্যসেবীর দল তখন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ইনি তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন। ইনিই সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিত ভাবে, চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহায়তায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালে বাঙলা সাহিত্যে ইহা একটি অভিনব উদ্যম ছিল, সন্দেহ নেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিষয়ে সমর্থন ছিল; এই প্রসঙ্গে গিরিজাপ্রসন্নকে লেখা তাঁর পত্রখানি উদ্ধৃতিযোগ্য।

সাদর সম্ভাষণম্,

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আপনি যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা যে আমার প্রণীত নর-নারী চরিত্রগুলি আপনাদিগের এতদূর পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ। তবে, আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশার অতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি।...পুস্তকের নাম যাহা নির্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণকান্তের উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম সংস্করণে কয়েকটা গুরুতর দোষ ছিল; দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন করা হইয়াছে।

* বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো জীবনীকার এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন নি, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা কখনো কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। সেন-পরিবারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে এটি শুনেছেন সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তিনিই লেখককে এটি বলেছেন।

পুস্তকের অর্ধেক মাত্র সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, আমাকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল। অতএব অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত না হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাংশে ও শেষাংশে কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ। *

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বছরেই তিনি রাজকার্য থেকে দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করেন এবং অগ্রজদ্বয়ের সঙ্গে উত্তর ভারতে তীর্থ পর্যটনে যাত্রা করেন। তখন তাঁর হৃদয়ে প্রবল ধর্মভাবের উদয় হয়েছে।

১৮৯১। দাসত্বের অবসান হল।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পেছনের দিকে একবার ফিরে চাইলেন—সেই বি. এ. পাশ করার পর থেকে দীর্ঘ এই তেত্রিশ বছর জীবনের উপর দিয়ে কি উদ্দাম ঝড়ই না বয়ে গেছে। বহুমূত্র ব্যাধি ও অল্প একটু হাঁপানি—এ ছাড়া শরীরে তখন আর কোনো অসুখ ছিল না। দেখতে সুস্থকায়, সবল ও বলিষ্ঠ। ছোটোলাট বেকার সাহেবকে অনুরোধ করে ছোটোভাই পূর্ণচন্দ্রকে আলিপুরে বদলি করিয়ে আনেন এবং তাঁকে নিজের কাছেই রাখলেন; জ্যেষ্ঠ জামাতা তো সপরিবারেই ছিলেন। একমাত্র এই কনিষ্ঠের সঙ্গেই সৌভ্রাত্রবন্ধন তাঁর কখনো ছিন্ন হয়নি।

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর বঙ্কিমচন্দ্র অল্পকাল জীবিত ছিলেন, মাত্র দুই বছর ছয় মাস চব্বিশ দিন। অবসর গ্রহণের পাঁচ বছর আগে তিনি কলেজ স্ট্রীটে প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে একটি বাড়ি কিনে সেখানেই বাস করতে থাকেন। কলিকাতায় বাড়ি কেনার দুইটি কারণ ছিল, প্রথম তিনি পৈতৃক বাড়ির অংশ পাননি। '১৮৬৫ সনে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ উপ্ত হয়। যাদবচন্দ্র উইল করিয়া কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যমপুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন।' দ্বিতীয় কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতাকেই তাঁর

বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম খণ্ড, ভূমিকা: গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

শেষজীবনের কর্মস্থল হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তখন সাহিত্য এবং সমাজে তাঁর অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা; কলিকাতা তখন নবজাগ্রত বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অবসর গ্রহণের সাত বছর আগে থেকেই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় নূতন পত্রিকা, 'প্রচার' প্রকাশ করেন। পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশের কাজ কলিকাতায় না থাকলে সুষ্ঠুভাবে হওয়া অসম্ভব—এইসব বিবেচনা করেই বঙ্কিমচন্দ্র শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে বাড়ি কিনেছিলেন। শেষজীবনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হয়েছিলেন (১৮৮৫) এবং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের (তখনকার নাম Society for Higher Training of Young Men) সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৮৯১)। এ ছাড়া তিনি সেণ্ট্রাল টেক্স্ট বুক কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হন। বাঙলার সমাজজীবনে, বিশেষ করে এর সাংস্কৃতিক জীবনে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ চলেছে। বঙ্গসাহিত্যের তখন তিনি একচ্ছত্র সম্রাট। তিনিই ছিলেন তখন সকলের অন্বেষিত ব্যক্তি। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস এইসব বিবিধ কারণেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

১৮৯১। শরৎকাল। সকালবেলা।

তাঁর অবসর গ্রহণের পর একদিনের একটি ঘটনা।

সেদিন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পূর্ণচন্দ্র কাছেই বসেছিলেন। ভৃত্য মুরলী রূপোর গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গেছে; তিনি বসে বসে আয়েস করে ধূমপান করছিলেন। তখনকার বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখলে মনে হবে ইনিই যেন হরিদ্রাগ্রামের সেই জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়। শ্রীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছেন?

—দাসত্বের অবসানে মন ভালই আছে, তবে শরীরটা সুস্থ নয়।

—আগে বলতেন পেন্সন নিয়ে খুব লিখবেন—এখন?

বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ঠোঁটে হাসির ঈষৎ বঙ্কিম রেখা দেখা দিল। বললেন—এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখতে পারলেই আমার হয়। তোমরা লেখ।

—বাইরে কোথাও একটু ঘুরে আসুন না? বায়ুপরিবর্তনে উপকার হতে পারে।

—তাই যাব মনে করেছি! রমেশ মেদিনীপুরে বদলি হয়েছে; তাকে লিখেছি, দিনকতক রঘুনাথপুরের বাংলোয় বাস করব। সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারতে পারে।

—তেত্রিশ বছর তো চুটিয়ে সরকারী চাকরি করলেন। আপনার চাকরি-জীবনের অভিজ্ঞতাটা কি ?

অধরে সেই বঙ্কিম হাসির রেখা। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে সরালেন।

—সত্যি কথা বলব ? রত্নাবলী নাটক পড়েছ তো। মনে আছে, রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সেই উক্তি—'নিষ্পন্ন প্রায়মপি প্রভু প্রয়োজনং ন মে ধৃতিমাবহতীতি কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ'। আমিও ঠিক ঐ জিনিস এই তেত্রিশ বছর প্রতিদিন অনুভব করেছি। ভৃত্যভাবের কষ্ট বড় কষ্ট, বুঝলে শ্রীশ, তা সে যত বড়ো চাকরিই হোক।

বঙ্কিমচন্দ্র তেত্রিশ বছর চাকরি করেছেন।

চাকরিজীবনের মধ্যে সুদীর্ঘ সাতাশ বছর অক্লান্তভাবে সাহিত্য-সাধনা করেছেন; দু'খানি পত্রিকা পরিচালনা করেছেন। শ্রমসাধ্য এই সব বিবিধ কাজের ফলে পঞ্চাশ বছর বয়স থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তিনি দুরারোগ্য হাঁপানি ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। শেষজীবনে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর চিকিৎসার ভার পেয়েছিলেন; কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ বা ঔষধ গ্রহণে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কেমন যেন একটা অনীহার ভাব পরিলক্ষিত হয়। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্পদ, প্রেম—একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনে যা কিছু কাম্য থাকতে পারে, তার কিছুরই অভাব ছিল না বঙ্কিমচন্দ্রের; রাজদত্ত দুটি খেতাবও তিনি লাভ করেছিলেন—মৃত্যুর দু'বছর আগে 'রায় বাহাদুর' এবং মৃত্যুর বৎসরে 'সি. আই. ই'—তবু শেষজীবনে জীবনের ওপর কেন এই বৈরাগ্য এসেছিল? কেন তিনি চিকিৎসার প্রস্তাবে তাঁর উৎকণ্ঠিতা স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'চিকিৎসা করাইতে চাও, কর,—আমি তোমাদের মনে কোন আক্ষেপ রাখিতে দিব না'? তিনি কি বুঝেছিলেন—মৃত্যু সন্নিকট? হয়ত বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাইরের কার্যকলাপ দেখে বোঝা যেত যে, এজন্য তাঁর মনে কোনো উদ্বেগ ছিলনা। তবে শেষজীবনে

তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারীর আত্মহত্যা এবং অগ্রজ দুইজনের মৃত্যুর পর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের শরীর ও মন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল।

তিনি সরকারী খেতাব পেয়েছিলেন রাজকার্যের পুরস্কারস্বরূপ নয়, তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্য। এই প্রসঙ্গে বাকল্যাণ্ড সাহেব লিখেছেন: 'But it was not for his services as a member of the Provincial Service that Bankim Chandra is to be remembered. The titles conferred upon him were gained rather by his reputation in the world of letters than in the public services.* বঙ্কিমচন্দ্রের 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁর বন্ধুজন বিশেষ উল্লসিত হয় নি; সরকারী খেতাবে তাঁর নিজের কোনো মোহ ছিল না।

১৮৯৪। নববর্ষ।

বঙ্কিমের জীবনের শেষ বৎসর।

সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রে উপাধি-বিতরণের তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের নামের উল্লেখ ছিল—তিনি সি আই. ই খেতাব লাভ করেছেন। শ্রীশচন্দ্র এলেন এবং আরো অনেকেই এলেন তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য। বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই শ্রীশচন্দ্র দেখলেন ফরাসের উপর বসে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বসে আছেন যেন নিরাভরণ বিদ্যুৎ, ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো। সে গৌরকান্তি প্রশান্ত মূর্তি ভুলবার নয়। শ্রীশচন্দ্র হেসে বললেন, দু'বছর আগে 'রায় বাহাদুর' হয়েছিলেন, এবার C. I. E—একটা বড়ো উপাধি। বিদ্যাসাগর মশাই এই উপাধি পেয়েছিলেন। সরকার আপনাকে এবার সম্মান দেখিয়েছেন।

—এ সম্মানে আমি কিছুমাত্র গৌরব বোধ করি না, শ্রীশ। মনে আছে, রজনীতে কি লিখেছি? পূর্ণ, বইখানা দাও ত। দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদটা খোল। ঐ জায়গাটা পড় যেখানে অমরনাথ বলছে—সংসারে এমন লোক কে আছে···।

পূর্ণচন্দ্র পড়লেন: 'মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই? যে দুই চারিজন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে।

* *Bengal under the Lieutenant Governors* : C. E. Buckland.

অন্যের কাছে মান—অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—কেবল দাসত্বের প্রাধান্য-চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।'

—শুনলে শ্রীশ, এই আমার প্রাণের কথা। আমি মান চাই নিজের কাছে – আমি খেতাব চাই না, খেলাত চাই না।

হারাণচন্দ্র বললেন, কিন্তু আমি বলব, এ দুটোর একটাও আপনার যোগ্য উপাধি নয়। আপনাকে 'নাইট' উপাধি দিলেও খুব বেশি হত না।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, তা'হলে তো সকলের আগে মাইকেল মধুসূদনকে 'লর্ড' উপাধি দিতে হয়। ওরা সম্মান দেখাল না বলেই তো আমি বঙ্গদর্শনে লিখে ছিলাম—পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লৈখ 'শ্রীমধুসূদন'।

বঙ্কিম-চরিত্রের এই মহানুভবতা আমাদের অনুভূতিতে আজো শিহরণ জাগায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সি. আই. ই উপাধি-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দিত করে একখানি পত্র লেখেন এবং স্বয়ং সেই পত্রখানি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে এসে তাঁর হাতে প্রদান করেন। স্যর গুরুদাসের এই মহানুভবতায় বঙ্কিমচন্দ্র যারপরনাই অভিভূত হন এবং তিনিও তাঁকে একখানি পত্র লেখেন। আচারে ও স্বভাবে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল; তবু স্যর গুরুদাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র যে কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তার প্রকাশ আছে এই পত্রখানিতে; এই চিঠির তারিখ ১৯শে পৌষ, ১৩০০।

'নমস্কারপূর্বক সবিনয় নিবেদন, আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর ঐরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে, 'আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে এবং সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে।' অন্যে এ কথা বলিলে

তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ ; অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক জনসভায় স্যর গুরুদাসই সর্বপ্রথম তাঁকে 'ঋষি' আখ্যায় অভিহিত করেন ; এই কথাটি অরবিন্দের খুব মনে লেগেছিল এবং তখনি তিনি 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি রচনা করেন।

২৬শে চৈত্র, বাংলা ১৩০০ সন।

ইংরেজী ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪।

সেদিন ছিল রবিবার। সেই রবিবারেই অপরাহ্ণ বেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হল। দিনের সূর্য তখন গঙ্গার ওপারে অস্ত যাচ্ছে এপারে নিবল বাঙালীর প্রাণের সূর্য। প্রতিভার দীপ্ত রবি অস্তমিত হল। চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেল বাঙলার প্রাণ-চেতনার বাণীমূর্তি। রমেশচন্দ্র তখন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরু। তিনি লিখেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি চুঁচুড়া থেকে তাঁকে দেখতে এলেন। তখন তাঁর জ্ঞান আছে, কিন্তু সাত দিন আগে থেকেই বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। রমেশচন্দ্র শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াতেই বঙ্কিমচন্দ্র একবার চোখ মেলে তাকালেন, দক্ষিণ হস্তের শিথিল মুষ্টি দিয়ে রমেশচন্দ্রের একখানি হস্ত স্পর্শ করলেন। 'মনে হইল আমার কণ্ঠস্বরে তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন ; কিছু বলিতে চাহিলেন, পারিলেন না। এমন বেদনাদায়ক মৃত্যুর দৃশ্য আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই।'

'সায়াহ্ন ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন।'

বাঙালীর জীবনে এই বিষাদময় দিনটি অক্ষয় হয়ে রইল প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে। বাঙালী সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যু হল, অথচ তাঁর শবানুগমনে মুষ্টিমেয় মাত্র লোকের সমাবেশ হয়েছিল—এ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা।*

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বঙ্কিমের মৃত্যুসংবাদ শহরে প্রচার করেছিলেন বলেই সামান্য কিছু লোক হয়েছিল। এবং যাঁরা নিমতলা ঘাট পর্যন্ত শবানুগমন করেছিলেন, চিতাগ্নি নির্বাপিত হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কেউই অপেক্ষা করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে এই তথ্যটি

* নব্যভারত [১৩০১, প্রথম সংখ্যা, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

মনে রাখার মতো। এই বাঙালীর উন্নতির কথাই কি তিনি সারাজীবন চিন্তা করে গিয়েছিলেন? এরপর স্যর হেনরি কটনের সভাপতিত্বে টাউন হলের শোকসভায় সুরেন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত: 'The name of Bankim Chandra will be remembered, honoured and respected.'—এই উক্তির কোনো মূল্যই ছিল না।

'সায়াহ্ন-ছাব্বিশে চৈত্র—তেরশত সন।'

সেদিন ছাব্বিশে চৈত্রের সেই বিষাদময় অপরাহ্লে, প্রজ্বলিত চিতায় প্রতিভা-প্রদীপ্ত যে শরীর ভস্ম হয়ে গেল, তার ভস্মাবশেষ কি উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসকে সার্থকতায় অনুলিপ্ত করে দেয়নি? 'এ দেশের শেষ গৌরব, শেষ কীর্তি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ আগুন, শেষ প্রভিভার চিতা নিবিল। এদেশের গৌরব করিবার যাহা ছিল, নিমেষের মধ্যে তাহাকে হারাইলাম।'* বঙ্কিমের চিতার চন্দনে বাঙালীর জাগরণের অভিষেক সম্পূর্ণ হল। বঙ্কিমের মৃত্যুতে চিরদিনের মতন নিস্তব্ধ হয়ে গেল সেই কণ্ঠস্বর, অরবিন্দ যাঁর সম্পর্কে বলেছেন: 'The sweetest voice that ever spoke in prose.' যে 'অনিন্দ্যজ্যোতি স্বর্ণতরু' একদা এই বাঙলার শ্যামল মৃত্তিকায় রোপিত হয়ে এরই প্রাণের রসধারায় পরিপুষ্ট হয়ে নিজের মহিমা বিকাশ করেছিল, অকালে সেই তরু আজ মূলোৎপাটিত হল—জীবন-মধ্যাহ্নেই বঙ্কিম-চন্দ্র বিদায় নিলেন। বাঙালী কেঁদে বুক ভাসাল। তাঁর জন্মভূমি সেদিন তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ করেছিল এই বলে:

হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ!
... ...
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারীনরে
ভাতিলে নব বিভায়।†

তাঁর এই কীর্তির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন চিরকাল।

---

* নব্যভারত, ১৩০১, বৈশাখ। † হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ছয় ॥

এইবার বঙ্কিম-চরিত্রের কথা।

এ চরিত্র অত্যন্ত জটিল এবং এই চরিত্রের স্বরূপ বুঝতে না পারলে তাঁর জীবনানুশীলন নিষ্ফল। কারো জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হলে তার খাঁটি চরিত্রটি যথাসম্ভব জানা ও ধরা আবশ্যক। ইংরেজী সাহিত্যে এই কাজ করে-ছিলেন একমাত্র বসওয়েল; তিনি জনসনকে ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রতিকৃতি পরিস্ফুট করা বসওয়েলের পক্ষে অমন সহজ হয়েছিল। চরিত্রই মানুষ—'Character is the man.'—এই কথাটি আমরা ভুলে যাই। তাই আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনকথা রচিত হয়, কিন্তু তাঁদের চরিত্র ক্বচিৎ ঠিকভাবে অঙ্কিত হয়। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার ভিতর দিয়ে মানুষের চরিত্রের নানা দিক যেমন অভিব্যক্ত হয়ে থাকে, তেমনি যাঁরা প্রকৃত সাহিত্য-স্রষ্টা, তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতির অভিব্যক্তি থাকে তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। বঙ্কিম-সাহিত্যে আছে বঙ্কিম-চরিত্রের অভিব্যক্তি। 'ঐ চরিত্রকে যে না বুঝিল, এই সাহিত্যকে কখনই সে সত্যভাবে বুঝিতে পারিবে না।'—বিপিনচন্দ্র পালের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

'যাহার জীবনী লেখা যায়, তাহার দোষগুণ উভয়ই কীর্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয়না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয়না।' এ উক্তি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের; স্বীয় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি এই উক্তিটি করেছেন। প্রত্যেক জীবনীকারের নিকট তাঁর এই কথাটি বিশেষ মূল্যবান বলে গণ্য হওয়া উচিত। বঙ্কিম-চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে এটি বিশেষভাবেই স্মর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন আত্মপ্রচারে বিমুখ ছিলেন। তাঁরই সমকালীয় একজন লিখেছেন: তিনি আত্মপ্রকাশে সর্বদা সংযত ছিলেন। অল্পজ্ঞানী বুদ্ধিহীনদের ন্যায় বাহ্য-প্রকাশপিপাসা তাঁহার কখনও ছিল না।' এর সাক্ষ্য দিয়েছেন

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তিনি লিখেছেন: 'Bankim Baboo's learning was vast, but it was never displayed.' সে যুগে সম্ভবত একমাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীই বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের কঠোর সমালোচক ছিলেন; তবে তিনি তাঁর প্রতিভার পূজাও করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'বঙ্কিমবাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র সেন বা মহেন্দ্রলাল সরকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ ছিলেন না; কিন্তু প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।'* এই উক্তি নিতান্তই একজন নীতিবাগীশের, সত্যদ্রষ্টা কোনো ব্যক্তির নয়। রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় বর্ষীয়ান ব্যক্তিও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এমন বিরূপ ও অশিষ্ট মন্তব্য কখনো করেন নি। এমন কি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও না—যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

বঙ্কিমের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কার্যের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের মূল উপাদান খুঁজতে হবে। যাঁরা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে বিবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে দেখেছিলেন ও নানা দিক থেকে সে জটিল চরিত্রের অপরোক্ষ অনুভূতিলাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁদের ঘটেছিল, বঙ্কিম-মণ্ডলের সাহিত্যরথীদের কেউই এ কাজটা করেন নি, যদিও তাঁদের কেউ কেউ দুই-চারিটি স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান ছিলেন কেশবচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় ও চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্য সান্যাল) পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কেশব-চরিত রচনা করে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সুহৃদমণ্ডলীর মধ্যে কিম্বা তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যদিও বিদগ্ধ ও বিদ্বান ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন, কিন্তু কি জানি কেন তাঁরা সকলেই বঙ্কিম-চরিত রচনায় বিরত ছিলেন।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিম-চরিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন। 'যেসব সামাজিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যেসব জ্ঞান ও ভাবের সংঘর্ষে, যেসব আদর্শের প্রেরণায় তাঁহার অদ্ভুত সাহিত্যসৃষ্টির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—সেই সামাজিক অবস্থার কথা, সেই সংঘর্ষের কথা—সেই যুগ-সন্ধিকালের বিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তাস্রোতের আবর্তের ইতিহাস আমরা জানি। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী

পারিপার্শ্বিক অবস্থাও আমাদের জানা এবং এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই বঙ্কিম-চরিতালোকের মূল জমি। ইহা বুঝিতে পারিলেই বঙ্কিম-চরিত্রের ও বঙ্কিম-সাহিত্যের বিকাশের সূত্রটি ধরা সম্ভব হইবে।

'আবার তাঁহারই জীবিতকালে তাঁহার জীবনের পারিপার্শ্বিক কত বদলাইয়া গিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকালের আর আনন্দমঠের রচনা-কালের মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান আর এই বিশ বছরের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজে যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এই সকল পরিবর্তনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও পরিবর্তিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই দেখা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র কোনোদিন নিজের পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। কোনোদিন তিনি কালস্রোতের পিছনে পড়িয়া থাকেন নাই। ইহাই তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সত্যসত্যই বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া ছিলেন। মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি জীবনের শক্তি ও যৌবনের দীপ্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। জীবন কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার শক্তিতে। যৌবনকালে নয়, রসানুভূতির সামর্থ্যে। এই দুইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুদিন পর্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই দেশের আর দুইজন চিন্তানায়ক এইভাবে আমরণ বাঁচিয়াছিলেন—রামমোহন ও কেশবচন্দ্র।"*

অকপটতা মানুষের চরিত্রের একটি বড়ো গুণ। বঙ্কিম-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই অকপটতা।

'আমার জীবন' গ্রন্থে নবীনচন্দ্র অতি স্পষ্টভাবেই বঙ্কিমের পানদোষের কথা উল্লেখ করেছেন; তাঁর চরিত্রগত অন্য দুই-একটি দোষও সেই সময়ে বহু-লোকেরই জল্পনা ও আলোচনার বিষয় হয়েছিল। কিন্তু ইহা নিতান্তই যুগধর্মের প্রভাব ছিল এবং এজন্য তাঁকে গুরুতর নিন্দাভাজন করার কোনো হেতু নেই। প্রতিভা স্বভাবতই একটু উচ্ছৃঙ্খল; একটু নিয়মবন্ধনে অসহিষ্ণু হয়। মাইকেল-চরিত্র এর সব চেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত, তাই বলে কি মাইকেল-প্রতিভা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে?

*নারায়ণ : ১৩২২, বৈশাখ

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে নিজের জীবনের কথা অকপটে বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বলেছিলেন: 'অন্যায় কাজের মধ্যে মদ খাই, কিন্তু ইহা বলিতে পারি, সেজন্য কখনও কোনও দুর্নীতির কাজ করি নাই। খাইতে বসিলে একটু অপব্যবহার না হয়, এমন নহে।' 'মদে আপনার শারীরিক কোনও অসুখ হয় না?—জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র। উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "না, বরং মদ ধরিয়া শরীর ভাল আছে। সে যেমনই হোক, আমাদের মতন লোকের নিকট হইতে এটা বড় কু-দৃষ্টান্তের কাজ করে। সেবার ডাক্তার গুরুদাস যখন বহরমপুরে ছিলেন, কতকগুলি কলেজের ছাত্রকে মদ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, 'দোষ কি, মহাশয়? অন্যায় কাজ হইলে বঙ্কিমবাবু করিবেন কেন?' গুরুদাস বাবু আমার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমি যেন এটা ত্যাগ করি। দুই একবার ত্যাগও করিয়াছিলাম।"*

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন। উভয়ের ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও, প্রতাপচন্দ্র বঙ্কিম-প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন। তিনিও একসময়ে বঙ্কিমের মদ্যাসক্তির কথা উল্লেখ করে তাঁকে এই কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, 'পারি না প্রতাপ, চেষ্টা করিয়াও পারি না। প্রথম প্রথম আমার পরিবার এজন্য কত অনুরোধ করিতেন, কত কাঁদিতেন, তারপর এখন সব সহ্য হইয়া গিয়াছে। তবে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে, গৃহ ভিন্ন অন্যত্র যেন এই কাজটা না করি।'

চট্টোপাধ্যায়-পরিবারে এই অভ্যাস আর কারো ছিল না। চাকরিতে প্রবিষ্ট হওয়ার সময়েও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এ অভ্যাস দেখা যায়নি। ধূমপান অবশ্য করতেন; এ নেশা তাঁদের পৈতৃক। চার ভাই একসঙ্গে বসে গড়গড়া টানতেন। অতিরিক্ত তামাক খেতেন। তারপর খুলনায় দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম আলাপ হয় তখন তাঁর কাছ থেকেই তিনি মদ খেতে শিখেছিলেন। তবে জীবনের শেষ বয়সে যখন থেকে তাঁর মনে ধর্মভাব জাগরূক হয় তখন থেকে তিনি আর মদ স্পর্শ করেন নি। রাজলক্ষ্মী দেবী

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

কতো সময় ঠাট্টা করে স্বামীকে বলতেন, 'তা হলে সত্যিই মদ ছাড়লে?' ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এর উত্তরে তাঁর স্ত্রীকে কি বলেছিলেন বা কি বলতে পারেন, সেটা আমরা পাঠকদের অনুমানের উপর ছেড়ে দিলাম।

কালীনাথ দত্তকে বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন: 'দেহটা বড়ই অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন হওয়ায় কয়েক বৎসর শুদ্ধ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম।' বোধ হয় তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাত্বিক আহারে দেহশুদ্ধি হয় আর দেহশুদ্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু বঙ্কিম-চিত্তে মালিন্য ছিল বলে মনে হয় না।

তিনি কতদূর অকপট ছিলেন তার একটি সাক্ষ্য দিয়েছেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবীণ ও পরিণত বয়সের বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে চণ্ডীবাবু একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যারা আপনাকে আপনার যৌবনকালে দেখেছে তারা আপনাকে এখন চিনতে পারবে না। সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘ জীবন যাপনের উপযোগী আয়োজনের ত অভাব ছিল না, তবে কেন এমন হইল?' উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন: 'সে আজ কতদিনের কথা, আর এ শরীরের উপর দিয়া কত শত প্রকারের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কত অত্যাচারও হইয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না। বেঁচে আছি, সময় সময় ইহাই আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। কতগুলি অত্যাচার শুনিবেন? প্রথম চাকরির চাপ, চাকরিতে মানুষ আধমরা হয়। তার উপর নিজের সখ—কিছু লেখাপড়ার রোগ ছিল। বঙ্গদর্শনের জন্য যে কত রাত্রি জাগিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। ঘাড়ে ভূত-চাপার মত, আমার বিশ্রামসুখ-লালায়িত অবসন্ন শরীর মনকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিবারাত্র খাটাইয়াছি। ইহার উপর অন্য নানা-প্রকারেরও অত্যাচার শরীরের উপর হইয়াছে। এখন এ বয়সে আর সামলাইবার উপায় নাই।'

চণ্ডীবাবু লিখেছেন: 'বঙ্কিমবাবুর এই অকপটতা আমার হৃদয়ে সমগ্র শ্রদ্ধা ফুটাইয়া তুলিল। দেখিয়াছি অনেক লোক, অনেক বড়লোকও, অনেক সময়ে আত্মগোপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অমর পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের অকপটতা আমার নিকট ঋষিজনোচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল।' বঙ্কিম-চরিত্রের মহত্ত্বের রহস্য ইহাই।

কাঁটালপাড়ার চাটুয্যে বংশের ছেলে হয়েও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে প্রথম যৌবনে যুগের প্রভাবে সাহেবিয়ানার প্রবল ভক্ত ছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন কালীনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন: 'বিলাতি সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া বঙ্কিমবাবুও তৃণের ন্যায় নীয়মান হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কাঁটা-চামচ ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং হাতে তুলিয়া খাওয়াটা অসভ্যতা মনে করিতেন। একদিন তিনি কাঁটা-চামচ হস্তে একটি কৈ মাছ ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া পুনঃপুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইতেছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'কি বিড়ম্বনা। উপায় থাকিতে কি কর্মভোগ।' এই কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে সময়ের স্রোত বিপরীত দিকে ফিরিবার উপক্রম হইতেছিল। এই স্রোতের বশবর্তী হইয়া তাঁহারও সাহেবিয়ানা তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।'

বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যা বলেন নি যে, তাঁর জীবনে তাঁর স্ত্রীর বিলক্ষণ প্রভাব ছিল।

বঙ্কিম-চরিত্রের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাব বা Love of freedom। তিনি চাকরি করতেন। চাকরি করেও এমন স্বাধীনভাবে ও তেজের সঙ্গে চলতেন যে তাঁর উপরওয়ালারা সেটা বেশ অনুভব করতেন। তাঁর কর্মজীবনেই এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। তিনি উপরওয়ালার নিন্দা বা প্রশংসা গ্রাহ্য করতেন না। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন: 'একদিন তাঁহার পরিচিত একজন ভদ্রলোক বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, আপনার যেরূপ সর্বমুখী দক্ষতা, আপনি অমুক কার্যবিভাগে সেরূপ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাতে তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, ঐ বিভাগে আমার দক্ষতা বুঝিতে সক্ষম এমন কোন কর্মচারী আছেন?' *

প্রথম যৌবনে সাহেবি ভাবাপন্ন হলেও, তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়দের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু বঙ্কিমচন্দ্র' ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত; কখনো ভুলেও নামের আগে তিনি 'মিস্টার' (Mr.) কথাটি ব্যবহার করেন নি। কথিত আছে, একদা জনৈক বিলাত-ফেরৎ সিবিলিয়ান

* প্রবন্ধ-লহরী: জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁর 'মিস্টার' নামাঙ্কিত কার্ডখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং কার্ডের তলায় লিখেছিলেন, 'To see Mr. Bankim Chandra Chatterjee'। সেই কার্ড সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছিল ; এবং যিনি ঐটি পাঠিয়েছিলেন তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন যে তার উপর লেখা রয়েছে, 'এখানে মিস্টার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়া কেহ থাকেন না।'

সিবিলিয়ান ভদ্রলোকটি খুব লজ্জিত হন এবং তখন তাঁর হুঁস হয়।

বার্ধক্যে যেমন বিনয়ভাব ছিল, যৌবনে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ছিল আত্মগরিমা। আত্মগরিমা দূষণীয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মগরিমা বা তাঁর মতন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আত্মগরিমা আদরের জিনিস, একথা মানতেই হবে। মাইকেলের মধ্যে ছিল এই আত্মগরিমা। একালে এমনি আত্মগরিমা আমরা দেখতাম নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের চরিত্রে। দেমাক বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল এবং দাম্ভিক অপবাদও ছিল। এ দেমাক ছিল তাঁর আকৃতির, তাঁর প্রতিভার। তাঁর জীবনের পরিমণ্ডলের মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সকলেই এই সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন যে, একটা রাজোচিত মহিমা যেন সব সময় তাঁকে পরিবেষ্টিত করে থাকত। এ আভিজাত্য অন্তরের। এমনি আভিজাত্য একালে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এ জিনিস দুর্লভ।

প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সুশ্রী ও পরম রূপবান। সে রূপের বর্ণনা অনেকেই দিয়েছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে নবীনচন্দ্র সেন যখন প্রথমবার নৈহাটি আসেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে তাঁর মনের ভাব কি রকম হয়েছিল সেই কথা বলতে গিয়ে নবীনচন্দ্র লিখেছেন : 'দেখিলাম এক একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সুসজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতি ক্ষুদ্র, নাতি বৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল। নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক, ঈষৎ হাসিযুক্ত ; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের জোড়া—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিমগ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ ও সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্যন্ত একটি সামান্য পিরাণ এবং পরিধানে নয়নসুকের ধুতি। দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি সুন্দর, সতেজ ও প্রতিভান্বিত বোধ হয়।' * অনুরূপ বর্ণনা ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ও দিয়েছেন। †

---

* আমার জীবন : নবীনচন্দ্র সেন † সাহিত্য, ১৩১৯, পৌষ

এ যেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই কোনো একখানি উপন্যাসের একটি নায়কের বর্ণনা। এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বালক-বয়সে (১৮৭৬) রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত কুঞ্জে' কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলন-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বপ্রথম দেখে তাঁর আকৃতিগত অনুপম সৌন্দর্যে কিরূপ মুগ্ধ হয়েছিলেন তার বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এবং অন্যত্র তিনি এইভাবে দিয়েছেন: 'সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকান-পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল।...মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। ...প্রথম দর্শনে সেই-যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।'*

সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশবাসীও আজ পর্যন্ত তাঁর রূপের এই প্রতিভা বিস্মৃত হতে পারেন নি। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসতে তাঁর প্রথম বঙ্কিম-দর্শনের স্মৃতি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: 'সেই যে বিচারক বঙ্কিম-চন্দ্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সৌন্দর্যের তেমন বিজলী-লীলা, আর কখন কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতায় সিংহ-সৌন্দর্য ও চুঁচুড়ায় ভূদেব-রূপ দেখিয়াছি, তাহা মানবীয় সাধারণ সৌন্দর্য বলিয়াই মনে হয়। জনসমাজের নেতৃস্থানীয় কেশবের সৌন্দর্য দেখিয়াছি, তাহা প্রতিভার পরাক্রমপুষ্ট, হৃদয়-মন-মাতান সৌন্দর্য সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সে স্থির গম্ভীর সৌন্দর্যরাশিও বিরল বটে, তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথও সুপুরুষ। কিন্তু বঙ্কিমের সে সিংহ-বিক্রমমণ্ডিত পৌরুষ-ভাবময় সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে রূপের দেমাক বড়ই স্বাভাবিক।'†

চন্দ্রনাথ বসুও বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখেন পূর্বোক্ত মরকতকুঞ্জে ঐ কলেজ

---

* আধুনিক সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

† বঙ্কিম-প্রসঙ্গ: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

রিয়্যুনিয়নের অনুষ্ঠানে। তাঁর সেই বঙ্কিম-দর্শনের স্মৃতি তিনি এইভাবে লিপি-বদ্ধ করেছেন : 'আমি এই রিইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। মরকতকুঞ্জে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতেছিলাম, বিদ্যুৎকেও সেই প্রকার অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; আর একবার করমর্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম; হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে।'*

বঙ্কিম-চরিত্রের এই উষ্ণতা বঙ্কিম-প্রতিভার সঙ্গে মিলেমিশে আজো কি বাঙালীর অন্তরে সতেজ নেই? এই অনুষ্ঠানের ঠিক ষোল বছর আগে এই মরকতকুঞ্জেই সে যুগের বাঙালী জীবনধর্মের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ বাণীকার মধুসূদন-চরিত্রের এমনি উষ্ণতার স্পর্শ আমরা একদিন অনুভব করেছিলাম। প্রতিভা ও চরিত্রের মধ্যে এই রকম উষ্ণতা সাধারণত বিরল; রেণেসাঁর ইহাই একটি অভিব্যক্তি। মধুসূদনের প্রতিভা ও চরিত্রে যেমন, বঙ্কিম-চরিত্র ও প্রতিভার মধ্যেও তেমনি সেই একই উষ্ণতার অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি।

অন্তরের ঐশ্বর্য ছিল বলেই না বাইরের এই প্রদীপ্ত সৌন্দর্য বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর প্রথম যৌবনে একটু গর্বিত করে তুলেছিল। শুধু তিনি কেন, চাটুয্যে বাড়ির সকলেরই একটু অহঙ্কার ছিল। যে যুগে ডেপুটিগিরি চাকরির প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর ছিল একটা লোলুপ দৃষ্টি, সেই যুগে মফঃস্বলের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে পিতা এবং তাঁর চারিপুত্র হাকিম—এজন্য তাঁদের গর্ববোধ করার কারণ যথেষ্ট থাকতে পারে; তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতর প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন এই বংশেরই সন্তান; বাংলাসাহিত্যের কলা-কৌশল-মণ্ডিত প্রথম উপন্যাস লিখেছেন এই বংশেরই একজন সন্তান। সুতরাং তিনি যে ঈষৎ দাম্ভিক হবেন, ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং এই বিষয়ে তিনি যে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন

---

* প্রদীপ, ১৩০৫

তা তাঁর নিজের মুখেই প্রকাশ পেয়েছিল। অক্ষয় সরকার যখন নবীনচন্দ্রের সামনে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন: 'আপনাদের দেমাকে দেশটা টলটলায়মান। চাটুয্যেদের অহঙ্কার দেশে একটা প্রবাদের মত দাঁড়াইতেছে।' তখন তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন: 'নবীন! কথাটা ঠিক। এই অহঙ্কারটুকু না থাকিলে মরিয়া যাইতাম।'

ইহাই তো পুরুষের কথা।

ইহাই তো পৌরুষ-ভাবময় সৌন্দর্য।

ইহাই তো সংগ্রামী জীবনের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সংগ্রামপূর্ণ। যে চরিত্রে সংগ্রাম নেই, সেই চরিত্রে সৌন্দর্য নেই। বিদ্যাসাগর এর আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু বঙ্কিম-চরিত্র আলোচনা করে দেখা যায় যে, গর্বিত হলেও তিনি তথাকথিত দাম্ভিক ছিলেন না। তিনি যে তাঁর চারদিকের জনসাধারণ থেকে বিদ্যাবুদ্ধি-প্রতিভাবলে কতদূর উন্নত তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। এই আত্মগরিমা-জ্ঞানের সঙ্গে একটু মিশেছিল তাঁর মেজাজের স্বাভাবিক রুক্ষতা (যার সূচনা হয় মালদহে)। তিনি সহজেই চটে যেতেন। প্রথম বয়সে তিনি সর্বসাধারণের অভিগম্য ছিলেন না—তিনি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন না। যার তার সঙ্গে প্রথম দর্শনেই বন্ধুত্ব করবেন, সে প্রকৃতির মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব অর্জন করতেন, এবং অর্জন করলে তা আজীবন রক্ষা করতে জানতেন। শেষ বয়সে স্বভাবের রুক্ষতা অনেকখানি কমেছিল।

আবার বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে আমরা এও দেখতে পাই যে, অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি কখনো বিনয়, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হতেন না। সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান জ্ঞাপন তাঁর চরিত্রের আর একটি মহৎ গুণ ছিল। তাঁর জীবনে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এখানে শুধু একটির উল্লেখ করব। বিজয়লাল দত্ত যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনচরিত লিখবার সংকল্প করেন, তখন তিনি এই বিষয়ে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাছে তখন অপরিচিত ছিলেন বললেই হয়, তথাপি সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রস্তাবে এতদূর

সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি প্রস্তাবিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দিতে ও এর একটি ভূমিকা লিখে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠকের নিশ্চয়ই সেই ভূমিকাটি মনে আছে। 'বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা ও উন্নতিসাধনে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রই আমাকে পথপ্রদর্শন পূর্বক উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অনেক সুলেখক ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। আমি অকপটে প্যারীচাঁদের গুণবত্তার, বুদ্ধিমত্তার ও স্বদেশানুরাগের প্রশংসা করি।' সত্যিই ইহা বঙ্কিম-চরিত্রের উদারতার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক একজন লেখক-সম্পর্কে অনুরূপ উদারতা প্রদর্শনে এই বঙ্কিমচন্দ্রই কেন যে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন, তা আজো আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে আছে। 'স্বর্ণলতা'-র স্রষ্টা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাই আমরা এখানে বলছি।

সৌন্দর্যপ্রিয়তা বঙ্কিম-চরিত্রের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। শৈশবাবধি তিনি সৌন্দর্যপ্রিয়। তাঁর জীবনীকার শচীশচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন যে, ছেলেবেলায় বঙ্কিমের বাগানের খুব সখ ছিল। তিনি একটা বাগান করেছিলেন; বিকালবেলাটা সেই বাগানে কাটাতেন। বাগানটি তিনি মনের মতোন করে সাজিয়েছিলেন। 'অর্জুনার পাড়ের নীচে কয়েক বিঘা জমির উপর তিনি এক উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উদ্যানের নাম ছিল ফুল-বাগান। বাগানের কিয়দংশে ফুলগাছ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের উদ্যান হইতে ভাল ভাল গাছ আনিয়া ফুল-বাগানে স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন।' কথিত আছে, তাঁর কিশোর বয়সের বহু কবিতা তিনি এই ফুল-বাগানে বসে লিখেছিলেন। পুষ্পিত উদ্যানের রমণীয় চিত্র তাঁর বহু উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এই জাতীয় চিত্র-অঙ্কনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

গান-বাজনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল বলে জানা যায়। 'কাঁটালপাড়ায় যদুনাথ ভট্টাচার্য নামে একটি লোক থাকিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে পঁচিশ টাকা মাহিনা দিয়া নিজ বাড়িতে রাখিয়াছিলেন। মাহিনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চমৎকার জিনিসের বরাদ্দ ছিল— কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা। যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে হারমোনিয়াম বাজাইতে শিখাইতেন। বঙ্কিম নিজে বড় ভাল গাহিতে পারিতেন না। গলা ছিল পূর্ণবাবুর। পূর্ণবাবু

গান ধরিতেন, বঙ্কিম বাজাইতেন। তাঁহার উপন্যাসে যে গানগুলি আছে, তাহাতে স্বরসংযোগ করিয়াছিলেন যদুনাথ।'* কালোয়াতি গান তিনি বড়ো একটা পছন্দ করতেন না। কৃষ্ণকান্তের উইলে দানেশ খাঁ'র কালোয়াতির প্রতি বঙ্কিম-কটাক্ষ এখানে স্মর্তব্য। সেই কটাক্ষ ছিল তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের রুচির প্রতিভাস। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ্য যে, পরিবার-মধ্যে সঙ্গীত প্রচলনের আবশ্যকতা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন: 'যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মানুষেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম এবং চিত্ত-প্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীত-বিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার-রাজকুমারীদের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যা-মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙালীর মধ্যে ভদ্রপৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে।'

কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র তাঁর অগ্রজের সঙ্গীতপ্রিয়তা সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। একবার পূজোর ছুটীতে বহরমপুর থেকে কাঁটালপাড়ায় এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। চাটুয্যেবাড়িতে তখন খুব ধুম-ধামের সঙ্গে দুর্গোৎসব হত। রাণীহাটির সুকণ্ঠ গায়ক বলহরি দাস ছিলেন জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণের আশ্রিত। সে বছর মহাষ্টমী-রাত্রে, সন্ধিপূজার পর, তাঁদের বৈঠকখানা ঘরে চারভাই ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বসে গল্প-গুজব করছেন, এমন সময়ে পাশের ঘরে বলহরি দাস গান ধরলেন—এস এস, বঁধু এস। এই গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কি ভাবান্তর হয়েছিল তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র। একবার শুনে তৃপ্তি হল না, গায়ককে বৈঠকখানা ঘরে ডাকিয়ে আনিয়ে আবার শুনলেন সেই গান—শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। সেই গান বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে ভুলতে পারেন নি। বহুকাল পরে কমলাকান্তরূপে তিনি বঙ্গদর্শনে আমাদের সেই গান শুনিয়েছিলেন।

সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর চারদিকের পরিবেশ সব সময়ই থাকত পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত। তাঁর প্রতিদিনকার বেশভূষায় থাকত পারিপাট্য

* বঙ্কিম-যুগের কথা: হেমচন্দ্র রায়।

ও পরিচ্ছন্নতা, যা দেখে অনেকেই মুগ্ধ হতেন। তাঁদের কাঁটালপাড়ার ফরাস-বিছানো হলঘরটি তাঁদের সময়ে যেমন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত ছিল, পরবর্তীকালে প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে তাঁর নিজের বৈঠকখানাটিও পারিপাট্যে তেমনি আকর্ষণীয় ছিল। সেখানে যাঁরাই আসতেন তাঁরাই বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিজ্ঞান দেখে বিস্মিত হতেন। এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: 'বঙ্কিম বাবু সৌখীন ছিলেন। তাঁহার আশে পাশে সবই বেশ পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো দেখিতাম। অগোছালো বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়িতেও বঙ্কিমবাবুর পিরাণের বুকের বোতামের দু'একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়িগোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত, কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলম মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া-মোছা। বাড়িতে ঢুকিলে ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নাই।'

ব্যক্তিগত এই সৌখীনতা বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর আদর্শ ছিল সুন্দরের ধ্যান ও সৌন্দর্যের উপাসনা। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কেন যে তাঁকে আদিরসের কবি বললেন, তা বুঝা কঠিন। সৌন্দর্যপ্রিয়তা যেমন, তেমনি আত্মবিশ্বাস বঙ্কিম-চরিত্রকে দিয়েছে অপূর্ব সুষমা। এই চরিত্রের যা কিছু স্বাতন্ত্র্য, যা কিছু অসাধারণত্ব তা তাঁর এই আত্মবিশ্বাস। সে যুগের বাংলায় ইহা খুব সুলভ ছিল না। তাঁর এই Self-confidence বা আত্মবিশ্বাসকে অনেকে Self-conceit বা দাম্ভিকতা বলে ভুল বুঝেছেন। বঙ্কিম-চরিত্রের এই বিশেষ গুণটির কথা আলোচনা করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন:

'তিনি কোনদিন—কি চাকরিজীবনে, কি সাহিত্য-জীবনে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের মুখাপেক্ষী হন

নাই। নিজের মনে যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজের বুদ্ধিতে যাহাকে যখন সঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, নিজের প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি যখন যে পথে চলিতে চাহিয়াছে, অকুতোভয়ে, অকুণ্ঠাসহকারে তাহাই বলিয়াছেন তাহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই পথেই চলিয়াছেন। আর চলিয়াছেন মানুষের মতন, কৃমির মতন নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার মধ্যে বিস্তর দেখা গিয়াছে, কিন্তু কৃমি-প্রকৃতি-সুলভ বক্রতা বা পিচ্ছিলতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। ভিতরে ভিতরে এইরূপ একটা মুক্তভাব ছিল বলিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র এমন করিয়া আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিন চারিদিকের চিন্তার ও ভাবনার তরঙ্গপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তৃণের মতন ভাসিয়া চলেন নাই, এই প্রবাহকে ঠেলিয়া তাহার তরঙ্গভঙ্গের উপর উঠিয়া, তাহার মূলগতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াই আপনি নিত্য নূতন রসে, নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতন শক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। *

মোটকথা, তাঁর আত্মবিশ্বাস এমনই দৃঢ় ছিল এবং স্বীয় মতে তিনি এমনই অবিচল থাকতেন যে মার্টিন লুথারের মতন বঙ্কিমচন্দ্রও অনায়াসে বলতে পারতেন: 'By this I stand, I cannot do otherwise.' এই আত্মবিশ্বাসই তাঁর চরিত্রে এনে দিয়েছিল এক আশ্চর্য তারকাদীপ্তি যা আমরা একদা প্রত্যক্ষ করেছিলাম রামমোহন-চরিত্রে এবং বঙ্কিমের কালে বিদ্যাসাগর, মাইকেল আর কেশবচন্দ্রের চরিত্রে।

আত্মবিশ্বাস যেমনি, তেমনি ছিল তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ। উনিশ শতকের যে কয়জনকে আমরা বাঙলার রূপকার বলতে পারি তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এই বিশেষ গুণটি তাঁদের মধ্যে প্রবল ভাবেই ফুটে উঠত। রাধানগরের রামমোহন, বীরসিংহের বিদ্যাসাগর, সাগরদাঁড়ির মধুসূদন আর কাঁটালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র—এঁরা প্রত্যেকেই আত্মসম্মানবোধের মূর্ত বিগ্রহ। এ জিনিস যার মধ্যে থাকে না সে কোথাও সম্মান পায় না। বহরমপুরে অবস্থানকালে বেরা উৎসব উপলক্ষে নবাব-প্রাসাদে বঙ্কিমচন্দ্র একবার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বাঙালী ও ইংরেজ, উচ্চপদস্থ সকল রাজকর্মচারীই

* নারায়ণ, ১৩২২, বৈশাখ।

নিমন্ত্রিত হতেন, কিন্তু সম্মানের তারতম্য ছিল, অভ্যর্থনায় পার্থক্য থাকত। সাহেবরা জরির মালা পেতেন, বাঙালীরা তা পেতেন না। এই বৈষম্যের কথা তিনি বহরমপুরে এসে শুনেছিলেন। কয়েক মাস পরে নবাবের একজন কর্মচারী যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করতে এলেন, তিনি সে নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, নিমন্ত্রিত সকল ব্যক্তি যেখানে সমান মর্যাদা পায় না, সেখানে আমি যাই না। নবাব ও দেওয়ানের কানে যখন কথাটা উঠল তখন তাঁদের হুঁস হল; তাঁরা তাঁদের ত্রুটি বুঝতে পারলেন। সেই থেকে নবাব-দরবারে বেরা উৎসবে নিমন্ত্রিত সকল ব্যক্তিই সমান মর্যাদা পেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন ও বুঝতেন যে আত্মসম্মান রক্ষাই জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। তাঁর সময়ে তাঁর স্বজাতির মধ্যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে, এই আত্মসম্মানবুদ্ধির একান্ত অসদ্ভাব ছিল।

বঙ্কিম-চরিত্রের আর একটি মহত্ত্ব বাঙালী-সমাজ সম্পর্কে তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ আর সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমে যাঁরা এই সমাজ-গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। সাহিত্যিকমাত্রেই তাঁর প্রিয় ছিলেন—পরিচিত বা অপরিচিতের প্রশ্ন ছিল না। বাঙলাদেশে এই জিনিসটা আগে ছিল না। ১৮৭৩ সনে মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু হল; শিক্ষিত বাঙালী শোক প্রকাশ করল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কবিতা লিখলেন, কিন্তু একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই গভীর আবেগের সঙ্গে লিখলেন: 'যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য।' বাঙালীর মধ্যে মধুসূদন যে একজন মানুষের মতন মানুষ ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অকপটে তা স্বীকার করেছিলেন বলেই না তিনি বলতে পেরেছিলেন: 'জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।' এই একটিমাত্র কথার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক দিকটা যেভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা সত্যই গভীর অর্থবহ। আবার এই বঙ্কিমচন্দ্রকেই দেখি এক প্রকাশ্য সামাজিক সভায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলছেন—'এ মালা ইহারই প্রাপ্য।' সাধারণে জানত যে, বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরূপ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ বিলক্ষণ ছিল সত্য, কিন্তু সাগর-চরিত্রের মহত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র কখনো উপেক্ষা করেন নি। বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর মাতামহকে না জানিয়ে

কিম্বা তাঁর মত না নিয়ে 'সাহিত্য' নামে একখানি পত্রিকা বের করেছিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক স্বয়ং যখন এই কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ঈষৎ ভৎর্সনার স্বরে বলেছিলেন: 'তাঁহাকে জানাও নাই কেন? বিদ্যা-সাগরকে বাদ দিয়া কিম্বা তাঁহার পরামর্শ না লইয়া বাঙলা দেশে তো কোনো কাজ হয় না।' এই একটিমাত্র কথায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তিনি যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তা কি বঙ্কিম-চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়?

মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে এর সভাপতি করার প্রস্তাব নিয়ে তাঁর পটলডাঙ্গার বাসায় একদিন হীরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সব কথা শুনে, 'সাহিত্য পরিষদ্ কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন এবং তিনি আরও বলিলেন যে, যখন ভূদেব বাবু জীবিত রহিয়াছেন তখন আর কেহই পরিষদের সভাপতি হইতে পারেন না।' বঙ্কিম-চরিত্রের এই মহত্ত্ব সত্যই অতুলনীয়।

নববিধান-প্রবর্তক ও তাঁর সহপাঠী কেশবচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র একজন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করতেন। তাঁর বক্তৃতার তিনি প্রশংসা করতেন; বলতেন, কেশবের বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ। যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়নি, যখন বঙ্কিমচন্দ্র কিছুমাত্র খ্যাতির মুখ দেখেননি, তখন বাঙলাদেশে শুরু হয়েছে কেশবচন্দ্রের যুগ। সেই সময়ে একদিন কলিকাতার কোনো একটি স্কুলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে সরল মনে জিজ্ঞাসা করলেন: 'I wish to know how far you have outgone me.' উত্তরে কেশবচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন: 'One day you too will outshine me in certain sphere.' তারপর উভয়ের মধ্যে 'outgone' আর 'outshine' কথা দুটি নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়। এই দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ও ভালবাসা বিদ্যমান ছিল।

বঙ্কিম-চরিত্রের মহত্ত্বের আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব। এ ঘটনা তাঁর জীবনের শেষভাগের কথা। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর খুব

আগ্রহ যে তাঁর 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং এই প্রস্তাবটি তিনি ঔপন্যাসিক হারাণচন্দ্র রক্ষিতের মাধ্যমে করে পাঠিয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁকে উপযুক্ত দক্ষিণা—পাঁচশত টাকা—দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যথাসময়ে হারাণচন্দ্র এই প্রস্তাব পেশ করলেন। সেইসময়ে 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকা থেকেও তিনি লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি আর লিখে উঠতে পারেন না। সকলেই তাঁর প্রীতির পাত্র ছিলেন, লিখলে সকলের কাগজেই লিখতে হয়। একদিন হারাণচন্দ্র তাঁর কাছে এসে যখন যোগীন বসুর প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন করে তাঁকে বললেন, আপনি যদি সম্মত হন, তা'হলে যোগীন বাবু দক্ষিণার হার আরো কিছু বাড়াতে রাজী আছেন—এক হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে তিনি প্রস্তুত। তখন বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন—'যোগীনবাবুকে বলিবেন, আমি পারিব না। পারিয়া উঠিব না। ভক্তি-প্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্য তাহা পারিয়া উঠিব কি ?'

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'আমি বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিলাম, তাঁহাকে তো আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই। আমার মানসপটে তাঁহার অন্য মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।'*

বাঙালীর মানসপটে এই মূর্তি আজো অম্লান হয়ে বিরাজ করছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—সে কোমলতা প্রকাশ পেত তাঁর নীরব অশ্রুতে। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে যেমন, অন্তরঙ্গ বান্ধবদের মৃত্যুতে তেমনি শোকাভিভূত হতেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৭৩ সনে দীনবন্ধু মারা গেলেন। বঙ্কিমের প্রাণতুল্য বন্ধু—'ক্ষণভিন্ন সুহৃৎ'। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর কয়েকদিন বাদে তিনি এলেন তাঁদের বাড়িতে। ছয় পুত্র আর দেড় বছরের শিশুকন্যা তমালিনীকে নিয়ে দীনবন্ধুর বিধবা স্ত্রী যখন এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে, বঙ্কিমচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। দীনবন্ধুর এই একমাত্র আদুরে কন্যাটির 'তমালিনী' নাম তিনিই রেখেছিলেন। মায়ের কাছ থেকে নিয়ে সেই শিশুকন্যাটিকে কোলে করে বঙ্কিমচন্দ্র শিশুর মতো উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

লাগলেন। কাঁদলেন, কিন্তু তখনি বঙ্গদর্শনে দীনবন্ধুর বিষয়ে কিছু লিখলেন না, লিখলেন তিন বছর পরে এবং যা লিখলেন তা বঙ্কিম-প্রতিভার একটি অনুপম সৃষ্টি।

বলেছি, বঙ্কিম-চরিত্র জটিল। এই জটিলতা বুঝতে হলে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের বিচার করতে হয়। প্রথম জীবনে যিনি বলেছিলেন, 'হিন্দুধর্ম মানি, কিন্তু হিন্দুধর্মের বখামিগুলো মানি না,' * সেই নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি পরিণত বয়সে সিদ্ধযোগীর খোঁজ করছেন, মন্ত্রশক্তির উপযোগিতা চিন্তা করছেন, গীতা ধুয়ে জল খাচ্ছেন আর দারোয়ান পাঠকের মুখে গীতার বিশ্বরূপ শুনে ভক্তিতে তন্ময় হয়ে পড়ছেন। রেনেসাঁর যে ধর্মীয় আদর্শে মানুষের স্থান ছিল সর্বাগ্রগণ্য, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল ঐকান্তিক, প্রথম যুগের বঙ্কিমচন্দ্র সভ্যতার নবপর্বের সেই প্রশস্ত মানবধর্মের ছিলেন অসন্দিগ্ধ ও একনিষ্ঠ পূজারী। কিন্তু শেষজীবনে তিনি নব্য হিন্দুধর্মান্দোলনের নেতা হওয়ার বাসনা মনে মনে পোষণ করেছিলেন কি না তা জানা যায় না, তবে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনটা অনেকের কাছেই আশ্চর্য বোধ হয়েছিল। তথাপি তাঁর বলিষ্ঠ ও বিদগ্ধ চরিত্রের বিচিত্র রূপ পদ্মরাগমণির আকরের মতন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমরা মোহিতলালের একটি সুচিন্তিত অভিমত এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

তিনি লিখেছেন: 'বঙ্কিম-চরিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ইহাকে অমি প্রতিভার পৌরুষ বলিব—কবি-প্রতিভার সঙ্গে পৌরুষের মিলন আমাদের দেশে ক্বচিৎ ঘটিয়াছে। কবি, সাহিত্যিক, ভাবুক বা মনীষী আমাদের দেশে আরো অনেকের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গে এমন পুরুষোচিত ঐকান্তিকতা, অটল আত্মমর্যাদাবোধ, কবি-ধর্মের মধ্যেও মনুষ্য-ধর্মের এমন অবিচলিত প্রেরণা, এ জাতির ইতিহাসে অতি দুর্লভ।'‡

বঙ্কিম-প্রতিভার মতন বঙ্কিম-চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে, আমার মনে হয় তাঁর প্রতিভার অন্তঃপুরে প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। প্রথম যৌবনে তাঁর চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বের গৌণ

* বঙ্কিম প্রসঙ্গ গ্রন্থে কালীনাথ দত্তের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

‡ বঙ্কিম-বরণ: মোহিতলাল মজুমদার

দিক। আসল কথা, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রভূত প্রাণশক্তিময় মানুষ। ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাবালুতা—যা বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে—তাঁর ব্যক্তিত্বের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না। দ্বৈতসত্তার আবেশ ছিল তাঁর মধ্যে সত্য, কিন্তু নিজের শক্তিকে তিনি পুরোপুরি অধিকার করতে পেরেছিলেন। তাই তো দেখা যায় যে, খ্যাতি বা প্রশংসাবাদে তিনি কখনো পুলকিত বা বিচলিত হতেন না। আমরা দেখেছি, কি কর্মজীবনে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্রই ছিলেন অশ্রান্ত কর্মী ও স্পষ্ট মতামতের মানুষ। তাঁর নিজের জীবন-উপলব্ধি ছিল স্বচ্ছ—সেইজন্যই বোধ হয় তাঁর চরিত্র স্বচ্ছতর হতে পেরেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের চাপা ঠোঁট আর দীপ্ত চোখের ব্যক্তিময়তা স্মরণ করলেই তাঁর অপরিসীম ব্যক্তিত্বে অভিভূত হতে হয়। বাঙ্‌লাদেশে, বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যে এতবড়ো ব্যক্তিত্ব সে-যুগে আমরা কারো মধ্যে দেখতে পাই না।

বঙ্কিম-প্রতিভার সঙ্গে একটি আশ্চর্য চরিত্রের পুরুষের সত্তা যে ওতপ্রোত-ভাবেই বিজড়িত, তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক সাধনার মধ্যে যে একটি পুরুষ-মূর্তি দেদীপ্যমান—সকলের আগে এই সত্যটাই আমাদের বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, জীবনের বাস্তব মহিমাকে বরণ করেই তো বঙ্কিম-চরিত্র সার্থক হয়েছে। জগৎ ও জীবনকে তিনি অতিক্রম করতে চান নি, তিনি জীবনের বাইরে আর কিছুকে স্বীকার করেন নি—ইহাই তাঁর চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য। তাঁর যদি কোনো সুলিখিত জীবনবৃত্তান্ত থাকত, তা'হলে বাইরের জীবনেও তাঁর দৃপ্ত পুরুষ চরিত্রের বহু চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পেতাম।

মানুষের চরিত্রের প্রকাশ তার বীরত্বে, তার ব্যক্তিত্বে। উনিশ শতকের বাঙলায় পুরুষ অনেক, কিন্তু যথার্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ-বীরের সংখ্যা অতি অল্প। রামমোহনকে বাদ দিয়ে বঙ্কিম-পূর্ব যুগের বাঙলায় এমন মানুষ একজনই ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর। বঙ্কিমের রচনার মধ্যেই আমরা যে পুরুষ-বীরের পরিচয় পাই, তা বিদ্যাসাগরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিদ্যাসাগরের বীরত্ব তাঁর কর্মময় জীবনে দুর্জয় সঙ্কল্পের ভিতর দিয়ে, আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। বঙ্কিম-চরিত্রের বীরত্বের দিকটা ঠিক তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয়। কারণ তাঁর পৌরুষ কোনো সামাজিক কর্মানুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করেনি—

তিনি কোনো আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন নি। মূলত তিনি ছিলেন একজন চিন্তানায়ক। তাঁর পৌরুষ তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকায় তা আমাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য অধ্যয়নের পর, এ কথা কে অস্বীকার করবে যে, 'বঙ্গদর্শন'-এর যুগ থেকে 'প্রচার-'এর যুগ পর্যন্ত এই একটি মানুষ চলেছেন অবিচলিত পদক্ষেপে, একটি মূল লক্ষ্যের অভিমুখে। একটি মানুষ অগ্রসর হয়েছেন তাঁর মন ও প্রাণের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে এই জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথ নির্মাণ করতে। কোনো আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি করেন নি সত্য, কিন্তু পরবর্তীকালের বহু আন্দোলনের সফলতার মাল-মশলা তিনি জুগিয়েছেন। যে সুকঠিন আত্মপ্রত্যয় তাঁর চরিত্রকে সমুদ্ভাসিত করে তুলেছিল তারই বলে তিনি একটা জাতির মনোরাজ্যে অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রভাব-সৃষ্টিই মানুষের চরিত্রের প্রকৃত মানদণ্ড। 'A character stands or falls by the influence it exerts upon the minds of the subsequent generation of people'—কার্লাইলের এই উক্তির নিরিখে বিচার করে দেখলেই বঙ্কিম-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং এই মহত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষগোচর না হয়েই পারে না।

॥ সাত ॥

১৮৬৫।

বাঙলা সাহিত্য-জগতের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বছরে আমরা যুগপৎ প্রত্যক্ষ করলাম এক প্রতিভার অস্তাচলে গমন, অন্য একটি প্রতিভার অভ্যুদয়। এদিকে প্রবাসে, সুদূর য়ুরোপে মধুসূদন বাণীপ্রতিমা বিস্মৃতির জলে বিসর্জন দিয়ে কবি-জননীর কীর্তি-দীপান্বিতা পাদপীঠতলে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন, আর অন্যদিকে সেই একই সময়ে বাঙলার সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করছেন সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র। একদিকে কীর্তিক্লান্ত অশান্ত এক কবি-জীবনের মহাবসান আর অন্যদিকে অপর এক মহৎ শিল্পীর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব। বাঙলা সাহিত্যে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। বিদায়কালে মাইকেল বাণীর কাছে বর প্রার্থনা করে লিখলেন :

এই বর, হে বরদে. মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

আমরা জানি, উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে যৌবন-মুক্তির প্রথম কবির প্রার্থনা নিষ্ফল হয়নি। বাঙলা দেশকে আপন প্রতিভার মহিমময় আলোকে উদ্ভাসিত করে আবির্ভূত হলেন বাণীর আর এক বরপুত্র—বঙ্কিমচন্দ্র।

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা, বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীল-

নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।'

এই অশ্বারোহী পুরুষ একজন তরুণ রাজপুত ছিলেন। নবযৌবনের মহিমাদৃপ্ত সেই দুঃসাহসী রাজপুত যুবকের মতোই আমরা দেখতে পাই যে, 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিগন্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে' আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে বাঙলা-সাহিত্যে এমন একজন প্রতিভাবান লেখক পথ চলতে আরম্ভ করেছিলেন যাঁকে পরবর্তীকালে 'সাহিত্য-সম্রাট'—এই দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। সেই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা কথা-সাহিত্যের সিংহাসনে তিনি আজো মহিমময়রূপে বিরাজ করছেন। তাঁরই প্রথম বাঙলা রচনা 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে।

'দুর্গেশনন্দিনী' নতুন যুগের প্রথম সার্থক রোমান্স। কি কাহিনী-বিন্যাস, কি চরিত্র-চিত্রণ—সকল দিক দিয়েই এই রোমান্সখানি যেন নূতনের স্বাদ এনে দিয়েছিল। একটা নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে উঠলো সকলের বিস্মিত দৃষ্টিপথে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতর প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং বি এ পাশ-করা প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম বাঙলা রচনা কি চমক ও আনন্দ-কলরব জাগিয়েছিল সেদিন, তা বঙ্কিম-শিষ্য রমেশচন্দ্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন,—'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ক-কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে— নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।'

প্রতিভার আবির্ভাবেই এমনটি ঘটে থাকে। সত্যিই সেদিন একটা নূতন ভাবের, নূতন যুগের সচকিত চমক শিক্ষিত বাঙালীকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল। আজ সেই তাঁর দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার শতবর্ষ পরে দেখি যে, সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করে যে নূতন চিন্তা, নূতন কল্পনা দেখা দিয়েছিল,

তাই-ই যেন বাঙলা সাহিত্যকে গতিময় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল—যেমন একদিন করেছিল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এই তুইটি স্মরণীয় গ্রন্থের প্রকাশকালের মধ্যে মাত্র চার বছরের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

এলো দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা।

এলো অরণ্যবাসিনী কুমারী কপালকুণ্ডলা।

এলো বাঙলা সাহিত্যের নবোদ্ভিন্ন যৌবনপ্রতিমা।

বাঙলা সাহিত্যের উদয়াচলে সে এক জ্যোতির্ময় অভ্যুদয়। প্রতিভার এমন প্রকাশ বাঙলা সাহিত্যে আর হয়নি। দশদিকে আনন্দ-কলরবের সৃষ্টি করে, মরা গাঙে বান ডাকিয়ে, বাঙলাদেশে আর কোনো লেখকের আবির্ভাব হয়নি। বীণাপাণি স্বয়ং যেন বরণ করে নিলেন সারস্বত মন্দিরের বহু প্রত্যাশিত পূজারীকে। বঙ্কিমচন্দ্রের কলায় বাঙালী সেদিন সত্যিই মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করেছিল যৌবনের দৃপ্ত মহিমা আর ধূসর আকাশপটে সাতরঙা মেঘের আলপনা। বাঙালীর কল্পনায় ধরা দিল রূপের ধ্যান, সুন্দরের ছবি। তার জীবন-জাহ্নবীতে উচ্ছ্বসিত হল দূর-সমুদ্রের আকুল আহ্বান। কতকাল পরে বাঙালী পেলো তাঁর জীবন-মহাকাব্যের কবিকে। সাহিত্যের বররুচি রূপকারকে। শ্রেয়স্কাম শিল্পীকে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই আমরা আগে বলব। কারণ উপন্যাসের মধ্যেই আছে তাঁর প্রতিভার সমধিক স্ফুরণ। শিক্ষিত বাঙালীর তিনিই প্রথম নভেলিস্ট যিনি তাদের চিত্ত জয় করেন অসংশয়িত ভাবে। কিন্তু তৎপূর্বে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলার আছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন বিষয়-চেতনা, স্থান-কাল-চেতনা বিকাশলাভ করছিল, যখন আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য সমাজের সর্বাঙ্গে অনুভূত হচ্ছিল এবং যে মুহূর্তে সামাজিক ভারসাম্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, সেই যুগসন্ধিক্ষণেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। তাঁর যাবতীয় সাহিত্যকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটিমাত্র ভাবনার দ্বারা, একটিমাত্র লক্ষ্যাভিমুখে তিনি অবিচল পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন। যে মাতৃভূমি ছিল তাঁর যৌবনের স্বপ্ন, বার্ধক্যের ধ্যান—সেই স্বদেশ ও স্বজাতির

কল্যাণচিন্তাই তাঁকে সারাজীবন সারস্বত কর্মে যোগযুক্ত রেখেছিল। প্রাচীন ও নবীনের অশ্রদ্ধা ও অবহেলা থেকে জাতির বিস্মৃত-পরিচয় ঐতিহ্যকে উদ্ধার করবার যে-দুরূহ ও মহত্তর কর্তব্যে বিধাতাপুরুষ তাঁকে বরণ করেছিলেন, সেই কর্তব্য সম্পাদনে তিনি কতদূর তন্নিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত ছিলেন, তার আলোচনা অনেকেই করেছেন, তবু সে আলোচনার প্রয়োজন আজো রয়েছে। কেন, সেই কথাটাই প্রথমে বলব।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এবং তাঁর লোকান্তর গমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত বঙ্কিম-আলোচনার ধারা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের বিচার করেছেন এবং তাঁদের সকলের সিদ্ধান্ত একরকম নয়। বঙ্কিম-ভক্ত ও বঙ্কিম-অনুরাগীর দল তাঁকে দেখেছেন একভাবে, আবার বঙ্কিম-বিরোধীরা তাঁকে দেখছেন স্বতন্ত্র-ভাবে, বিচার করেছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে। এ যুগের বঙ্কিম-সমালোচক-গণের মধ্যে অনেকেই তাঁদের পূর্ববর্তী সমালোচকদের বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, দেখা যায়। য়ুরোপে শেক্‌সপিয়রকে নিয়ে গত চারশো বছর ধরে ঠিক এইরকম সাহিত্যের বাগ্‌যুদ্ধ চলে আসছে এবং আজো এর শেষ হয়নি। এক হ্যামলেট চরিত্রের আলোচনা নিয়েই সমালোচকদের মধ্যে কত রকমের ব্যাখ্যা, বিতর্ক, বিভ্রান্তি ও মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমের সৃষ্ট কোনো কোনো চরিত্র নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনার নামে কি কম বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে?

এই প্রসঙ্গে এ যুগের প্রসিদ্ধ শেক্‌সপিয়র-সমালোচক স্টুয়ার্টের একটি উক্তি মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন: 'What is the lesson of this? The lesson is surely not that all critical interpretation of Shakespeare's characters is ephemeral modish nonsense. We merely learn that we ought not to let one theory, one reading, sweep away all the others. These people of Shakespeare's really are extraordinarily like life, and life is susceptible to many interpretations which do not necessarily invalidate each other...When our imagination is kindled

we do not think to 'interpret' the characters. We know that the characters are interpreting us.' *

বঙ্কিম সমালোচনার ধারা এবং বিভিন্ন সমালোচকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কেও আমরা ঠিক এই কথা বলতে পারি। 'সূত্র বুঝি, কিন্তু পণ্ডিতদের ভাষ্য বুঝি না', শ্রীচৈতন্যদেবের এই উক্তিটিও এখানে স্মর্তব্য। বঙ্কিমের কল্পনা এবং অনুভূতি যখন আমাদের কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলবে, তখন সত্যিই দেখা যাবে যে, শেক্‌সপিয়রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির ন্যায় বঙ্কিমের সৃষ্ট চরিত্রগুলিরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, ওরাই যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে ব্যাখ্যা করে চলেছে। বঙ্কিম-উপন্যাসের চিরন্তন মূল্য এইখানেই। তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কীর্তির মূলে ছিল যে প্রেরণা, তা কোনো চিন্তা বা মতবাদের প্রেরণা নয়; তাঁর শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে আছে সেই পূর্ণ দৃষ্টি, সেই সামগ্রিক বোধ, যার বলে ভাব ও রূপ, তথ্য ও তত্ত্ব, বাস্তব ও আদর্শ এক হয়ে যায়, রস-পিপাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন স্বর কেমন করে বেজে ওঠে, উনিশ শতকের বাঙলায় এর প্রথম দৃষ্টান্ত মধুসূদন, দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব উদাত্ত রবে ঘোষিত হয়েছিল। চারদিকে তখন বাঙলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেমন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল ভাঙেনি, তিনি ইংরেজী ভাষায় গল্প লিখে চলেছেন। কালধর্ম তাঁকে স্বভাবতই অন্য পথে চালিত করেছে। কিশোরীচাঁদ মিত্রের *Indian Field* পত্রিকায় *Rajmohon's wife* শীর্ষক উপন্যাস লিখে চলেছেন। কিন্তু বাঙালীর সৌভাগ্য, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, গল্প শেষ হওয়ার আগেই সহসা তাঁর ভুল ভাঙল। কি রকম ঘটনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সুমতি ফিরে

* Shakespeare's Men and their Morals' : J. I. M. Stewart in *Shakespeare Criticism : 1935-1960.*

এসেছিল, তা জানবার উপায় নাই। 'রাজমোহন্‌স্‌ ওয়াইফ' সম্পূর্ণ হতে পারেনি, উপন্যাস শেষ হওয়ার আগেই পত্রিকাখানি উঠে যায়। ইতিহাসের এক শুভক্ষণে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনেই বুঝেছিলেন যে, পৃথিবীতে কোনো প্রসিদ্ধ লেখক তাঁর মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হননি—কোনো সাহিত্যিকের প্রতিভা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়নি, কোনো আদর্শ গ্রন্থ অন্যের ভাষায় আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র আরো বেশি করে বুঝেছিলেন—পৃথিবীতে ধর্ম, সমাজ বা সাহিত্য-সংস্কার মাতৃভাষা ভিন্ন পরদেশীয় ভাষায় অদ্যাবধি সংঘটিত হয়নি। যে মুহূর্তে এই উপলব্ধি, সেই মুহূর্তেই তিনি মাতৃভাষার সেবায় নিজের সমস্ত শক্তি সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করলেন। জীবনের অবশিষ্টকাল সেই কর্মের তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সাধক।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সমালোচকদের একটা প্রবল অভিযোগ এই যে, তাঁর কোনো উপন্যাসেই সমকালীন বাস্তব জীবনের সার্থক প্রতিফলন নেই। এ অভিযোগ বিচার্য। সম্ভবত এ অভিযোগ প্রথম তুলেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দুর্গেশনন্দিনী যখন সে যুগের শিক্ষিত সমাজে উৎসাহের সাড়া জাগিয়েছে, তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র তারকনাথ ঠিক সেই পরিমাণেই বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন: 'এই বই পড়ে কোনো বিদেশী আমাদের দেশের লোকের প্রকৃত চরিত্র বা সমাজের সঠিক পরিচয় পাবে না। আমি উপন্যাস লিখে দেখিয়ে দেব natural character কাকে বলে, real life কাকে বলে।' তাঁর স্বর্ণলতার আবির্ভাব এর আট বছর পরের ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শন বের করেছেন, কিন্তু তিনি স্বর্ণলতা বা এর লেখক সম্পর্কে নীরব রইলেন। তাঁর এই নীরবতার অনেকে অনেক রকম অর্থ করে থাকেন কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। স্বর্ণলতা বাস্তবজীবনাশ্রয়ী উপন্যাস সত্য, কিন্তু সূক্ষ্ম রস-চৈতন্যের অভাবই এর সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি।

প্রেম—নারীপ্রেমকেই আশ্রয় করে কথাসাহিত্যের জগতে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। দুর্গেশনন্দিনী ও পরবর্তী রোমান্টিক উপন্যাসগুলির অবলম্বন প্রেম ছাড়া আর কিছু ছিল না। বাস্তব জীবনাশ্রিত পারিবারিক কাহিনী

দিয়ে তিনি যে তাঁর যাত্রা আরম্ভ করতে পারতেন না তা নয়, তথাপি রোমাণ্টিক জীবনের বাণীবাহকরূপে কেন বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হলেন? দুর্গেশ-নন্দিনীর সমাদর তার কাহিনীর জন্য যতটা না হোক, এর অন্তর্নিহিত রোমান্স-ধর্মিতাই কি বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষিত পাঠকসমাজে এক অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা এনে দেয়নি? তাঁর বক্তব্য ছিল প্রধানত সর্বকালের মানব-চরিত্র, কেবলমাত্র সমসাময়িক সমাজ বা চরিত্র নয়। কবি-জনোচিত দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিরীক্ষণ করেছিলেন মানব-চরিত্র—যে চরিত্র সর্বত্র সমান। এই অনুভূতি এবং বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই সাহিত্যের চিরন্তন সার্থকতা প্রকাশ পায়। তাই দেখা যায় যে, মানবজীবনের কোনো না কোনো সমস্যা তাঁর প্রত্যেকখানি উপন্যাসেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন আট বছর তখন কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় তিনি বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম রচনা 'মানব-চরিত্র' শীর্ষক কবিতাটি একদিন পাঠ করেন। তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম।…ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি।' *

'মানব-চরিত্র-ক্ষেত্র নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয়ে হিয়া॥'

এই মানব-চরিত্রই বঙ্কিম প্রতিভার মূলধন, যেমন ইহা ছিল শেক্‌সপিয়র-প্রতিভার উপজীব্য। আবার এর মধ্যে 'নারীই তাঁহার কল্পনা-বিশ্বের বাস্তব-ভিত্তি'। প্রবল প্রবৃত্তির আবেগ ('Grand passion') ভিন্ন কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। শিল্পী বঙ্কিমের যে গূঢ় গভীর উপলব্ধি তাঁর সকল চিন্তা সকল কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে আছে, তা ঐ বালক-বয়সে ঐ মানব-চরিত্র কবিতাটি পাঠ করেই তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে থাকবে এবং যে রস-প্রেরণার উন্মেষ তাঁর অল্পবয়সে রচিত কবিতাবলীর মধ্যে দৃষ্ট হয়, তার মধ্যেই উত্তরকালের রোমান্স-রসস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়। নারীর প্রতি আসক্তি (অথবা প্রেম), ইহাই তো বঙ্কিমের জীবন-দৃষ্টির

* দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী: বঙ্কিমচন্দ্র

মূল বক্তব্যরূপে তাঁর উপন্যাসগুলির সৃষ্টি-কল্পনায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, রোমান্টিসিজ্‌ম্ একটা যুগের বৈশিষ্ট্য নয়, চিরায়ত সাহিত্যের বিশিষ্টতা। হোমার থেকে রবীন্দ্রনাথ সবাই রোমান্টিক। সাহিত্যের ধারায় যখন নূতন প্রবাহ আসে, ভাব ও চিন্তায় যখন একটি নূতন স্পন্দন অনুভূত হয় তখন সেই নবীন গতিবেগকে আমরা একটা নূতন নামে অভিহিত করি। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনা-বিন্যাসে সৃষ্টির যে নবপ্লাবন এসেছিল তাকেই রোমান্টিক যুগ নামে আখ্যাত করা হয়। এই যুগ বস্তু-তন্ময়তা থেকে আত্মতন্ময়তার, বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার এবং গোষ্ঠী-চেতনা থেকে আত্মকেন্দ্রিকতার পথে অভিসারের যুগ। বাঙলা সাহিত্যে এই যুগের উদ্বোধন হল মধুসূদনের হাতে—বিদ্রোহ ও মুক্তিপিপাসার সুর প্রথম ধ্বনিত হল তাঁরই কাব্যে। তারপর এই যুগের পরিপূর্ণ অভিষেক করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাকে সম্পূর্ণতা দানও করলেন তিনি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব এর পিছনে ছিল বটে (ইংরেজী সাহিত্যেও রোমান্টিক যুগের অভ্যুদয়ের পিছনে ছিল বৈদেশিক প্রভাব) কিন্তু বাঙলার শ্যামল মৃত্তিকার মধ্যে, এর পূর্বতন সাহিত্য-ধারার মধ্যেই রোম্যান্টিসিজমের বীজ নিহিত ছিল। যৌবনের দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে দেখা দিল উনিশ শতকীয় নব-জাগরণ। এলো নবীন জীবন-মূল্যবোধ, এলো যুক্তি-জিজ্ঞাসার পথ। মধুসূদনের রোমান্টিক ভাব-চেতনা পরিণতি লাভ করল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়, যুক্তিবিচার-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মনোভাব আর পরিবেশ-সচেতন বাস্তব জীবন-বোধ—এই দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন সার্থক উপন্যাস-কলা। স্বজাতির সম্মুখে একটি মহত্তম জীবনাদর্শ স্থাপন তখন প্রয়োজন হয়েছে। তাই রোমান্স-রসপুষ্ট অনুপম শিল্পকলার বেদীর উপর বঙ্কিম স্থাপন করলেন সেই জীবনাদর্শ।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস এবং বাঙলা সাহিত্যের ইহাই প্রথম কলাকৌশলময় উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন চব্বিশ বছর, যখন

তিনি এই উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি খুলনায় এবং সেখানকার পরিবেশ তখন এই জাতীয় রচনার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। খুলনায় গ্রন্থ রচনার কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি; কয়েকটি মাত্র পরিচ্ছেদ তখন লেখা হয়েছে, এমন সময়ে তিনি বারুইপুরে বদলি হয়ে আসেন। মনটা তখনো অস্থির, এজলাসে মনস্থির করে বসে কাজ করতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত লিখেছেন: 'বারুইপুরে বদলি হইয়া আসিবার পর তিনি আবার ঐ অসমাপ্ত রচনায় হাত দিলেন। এজলাসে আসেন, বসেন, মামলার বিবরণ শোনেন, কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে, study room-এ প্রস্থান করিতেন, চিহ্নিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।'

বই লেখা শেষ হলে তিনি সর্বপ্রথম শুনিয়েছিলেন কাঁটালপাড়ায় তাঁর অগ্রজদের ও ভাটপাড়ার দু'একজন পণ্ডিতকে এবং পরে তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যকে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন তখন ক্ষেত্রনাথ বলেছিলেন: 'তোমার লিখবার শক্তি আছে কিন্তু এ বই এখনই ছাপিও না। তবে তুমি লিখে যাও।' কথিত আছে, এই অভিমত তাঁর মনঃপূত হয়নি। পরমত-অসহিষ্ণুতা বঙ্কিম-চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ক্ষেত্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাময়িক বিচ্ছেদও হয় এই কারণে এবং দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরে যখন কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়, তখন ক্ষেত্রনাথ সেই গ্রন্থ পাঠ করে বন্ধুকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তা পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যারপরনাই প্রীতিলাভ করেন এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের অবসান ঘটে। দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি তাঁর দুই অগ্রজও শুনেছিলেন এবং তাঁরাও 'উপন্যাসখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই— তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই।'

কথিত আছে, দুর্গেশনন্দিনীর গল্পটা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মেজঠাকুরদা জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে ছেলেবেলায় শুনেছিলেন। তিনি আবার ঐ গল্প ঐ

অঞ্চলে গিয়ে শুনে এসেছিলেন। মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের মতো লোকমুখে কিংবদন্তীরূপে চলে আসছিল। বাল্যে শ্রুত সেই কাহিনী কি রূপ পেল এতকাল বাদে? পরবর্তীকালে তিনি স্টুয়ার্টের *History of Bengal* এবং ও'মেলির *Gazetteer of Santal Pargana* এই দুখানি গ্রন্থ থেকে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগের কিছু উপাদান পেয়ে থাকবেন। তবে রোমান্সের কল্পনা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস না হতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে, এর প্রকাশকালে ইহাই বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ছিল। শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয়। ঘটনাবিন্যাস-কৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবেই যে দুর্গেশনন্দিনী সমাদৃত হয়েছিল তা নয়, প্রেমের উপন্যাস বলেই ইহা তখনকার পাঠকসমাজে অভিনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু আসল কথা তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন শিল্পীর সৌন্দর্যসৃষ্টিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এই সৌন্দর্য-সৃষ্টি, ঘটনা-সন্নিবেশ ও যা ঘটেছে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের পিছনে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লেখকের নিগূঢ় ভাবাভিপ্রায় কতক সচেতন, কতক বা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে থাকে দুটি প্রেরণা—এর একটি আসে বহির্জগৎ থেকে। অপরটি অন্তর্জগৎ থেকে।

কবি-মনের রহস্য ভেদ করা অতি দুরূহ কাজ। যে সাধারণ মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার মানদণ্ডে এর বিচার চলে না। সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে সমকালীন ঘটনা ও স্রষ্টার বিশেষ ভাবপ্রবণতার প্রভাব অনস্বীকার্য; সেগুলি বুঝতে ও ধরতে গেলে বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হয়—কোনো একটি বিশেষ ভাব-প্রভাবিত দৃষ্টিকোণ থেকে তা করলে বিচার ঠিকমত হবে না। মনে রাখতে হবে কবি-মনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে আহৃত উপাদানগুলি ও স্রষ্টার বিশেষ মানস-প্রবণতা উভয়ে মিলে এক নূতন রহস্যময় সত্তার উদ্ভব হয়। ঘটনাপুঞ্জের বাস্তব স্থূলতা নয়, এর নিগূঢ় দীপ্তি-বিচ্ছুরণ, লেখকের মতবাদের সুনির্দিষ্টতা নয়, এর সাংকেতিক আভা—প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর আকাশের অবর্ণনীয় বর্ণসুষমার ন্যায়—সৃষ্ট সাহিত্যের উপর পরিব্যাপ্ত হয়।

দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা পেলাম এক রহস্যময় শিল্পী-মানসের দীপ্তি-

বিচ্ছুরণ। সেই থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী প্রত্যেকখানি উপন্যাসে এই দীপ্তি-বিচ্ছুরণ স্তরে স্তরে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পী-সত্তার ক্রম-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং দুর্গেশনন্দিনী রচনা বৃথা হয়নি। শিল্পী নিজেকে কতকটা চিনলেন এবং তাঁর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাল। এই বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং এরই বলে তিনি বাঙলার নবজাগরণকে সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিন্দা-প্রশংসা যাই হোক, রচনা অপরিণত অথবা সর্বাবয়বে সুবিন্যস্ত না হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, 'দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পসৃষ্টি ও কাহিনী রচনার প্রচলিত আদর্শ, রীতিনীতি, নিয়মকানুন উপেক্ষা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আত্মপ্রকাশ করেন এবং শুধু নিজেকে নয়, শিক্ষিত বিদ্যাগর্বী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেও অপরিচয়ের অন্ধকার হইতে আবিষ্কার করেন। দুর্গেশনন্দিনী সৃষ্টি হওয়ার ফলে নূতন ভাব-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই ভাব-জগতের সহিত সমাজ-জগতের সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছে।'*

আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সেইটাই বড়ো কথা। তিনি এক অচলায়তনের ব্যূহ ভেদ করে সাহিত্য-ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অচলায়তন ছিল কামাতুর বর্ণনা ও কাহিনীর গতানুগতিকতার অবসাদে নিস্তেজ। দুর্গেশনন্দিনী অপরূপ প্রাণ-প্রাচুর্যে চঞ্চল। নবযৌবনের বার্তা বহন করেই তার আবির্ভাব—ভাষা ও বিষয় যা এতকাল সংকীর্ণ পথে চলছিল, তা যেন এইবার প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে দুর্বার বেগে চলতে আরম্ভ করল। আপন 'প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে'-ই তরুণ বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সেই একাকী অশ্বারোহী পুরুষের মতন তাঁর সাহিত্য-জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। কঠিন হাতেই তিনি বল্গা ধারণ করেছিলেন, তাঁর লেখনী ছিল একটি যথার্থ পুরুষ-প্রতিভার কঠিন হস্তধৃত লেখনী। সে লেখনী দিয়ে তিনি কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বছর কাল ধরে ভাব, ভাষা ও মানস-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে সাহিত্যে একটা নূতন ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন, গদ্যসাহিত্যে নিয়ে এলেন এক নূতন প্রবাহ। সেই প্রবাহপথে সমাজ-জীবনের পরিচয় ক্রমে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করল। সেই ভাবপ্রবাহের

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০১

মধ্যে যেন নূতন আত্মোপলব্ধির বান ডেকে উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানস, অপসৃত হল বহুদিনের সঞ্চিত অবসাদ ; শীতের জড়তার উপর লাগল বসন্তের স্পর্শ। সমকালীন বাঙালী জীবনে এরই প্রয়োজন ছিল সেদিন।

তাঁর প্রথম উপন্যাসখানির ভাষা ও রচনারীতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের আক্রমণ সত্ত্বেও, সেযুগের শিক্ষিত বাঙালীরা দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম আবির্ভাবেই 'বাঙলা-সাহিত্যের নূতন বিপুল সম্ভাবনা'য় কতদূর উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন তার একটা আভাস দিয়েছেন সেই যুগেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর অভিমত এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উদ্ধৃত হয়েছে।

সত্যিই, সবই ছিল নূতন—চিন্তা, কল্পনা, ভাব ও ভাষা।

বাণীমন্দিরে এলেন এক নূতন পূজারী।

একথা আজ আমরা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে, 'এক ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁহার সমসাময়িক সমাজ-মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তাহার বর্তমান অস্বীকৃত, কিন্তু তাহার অতীত নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল। সুতরাং অতীতের চেতনা তাঁহাকে ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করিতে পারে। এই চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যজীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল।'*

দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা তারই প্রথম স্বাক্ষর পেলাম।

উনিশ শতকের মানুষের ভাবসমৃদ্ধ প্রতিরূপ কি আমরা সেদিন দেখতে পাইনি বঙ্কিমের ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে? নিশ্চয়ই পেয়েছিলাম—যেমন পেয়েছিলাম উনিশ শতকের বাঙালী জীবনকে মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ, ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা প্রভৃতির মধ্যে। আয়েষার আত্মসমাহিত শক্তি ও সংযম, তিলোত্তমার চারু কৌমার্য ও সহনশীলতা, বিমলার চাতুর্য, দৃঢ় সংকল্প ও স্থিরচিত্ততা আর জগৎসিংহের অসামান্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস—এরই মধ্যে তো আমরা উনিশ শতকের সংগ্রামশীল নর-নারীকে প্রত্যক্ষ করি। ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে অশ্বারোহী যে পুরুষ একদিন সায়াহ্নে দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন পূর্বক প্রান্তর অতিক্রম করে অবশেষে শৈলেশ্বরের

* বঙ্কিম-মানস : অরবিন্দ পোদ্দার

মন্দিরে উপনীত হয়েছিলেন, তিনি শুধু বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের তরুণ নায়ক নন, তাঁরই মধ্যে আভাসিত হয়েছিল সমকালীন বাঙলার শিক্ষিত সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের আকাঙ্ক্ষা।

ভবভূতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় কবি।

একদিন মালতীমাধব নাটকের প্রথম অঙ্কে অবলোকিতার উক্তিটি আপন মনে আবৃত্তি করছিলেন তিনি। তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ অতি সুন্দর ও বিশুদ্ধ ছিল। কাছারি থেকে সবে মাত্র ফিরেছেন, তখনো চোগা-চাপকান খোলা হয়নি। বারুইপুরে ডেপুটির বাংলোয় তখন সন্ধ্যার সমাগম হয়েছে। গৃহকর্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী কন্যা শরৎকুমারীকে নিয়ে গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিলেন। ভৃত্য মুরলী গড়গড়ায় কলকে সাজিয়ে, নলটি সেজবাবুর হাতে দিয়ে তার নিজের কাজে চলে গেল। অন্যদিন কাছারি থেকে এসেই তিনি স্ত্রীকে সর্বাগ্রে সম্ভাষণ করে কাছে ডাকেন এবং তিনিই স্বহস্তে স্বামীর কাছারির পোষাক খুলে দিতেন। আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল; জলখাবার হাতে নিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী এলেন। এসে দেখেন স্বামী ধ্যানস্থ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চোখ বুজে আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলে চলেছেন:

তত্র খলু শ্রীপর্বতাদ্ আগতস্য রাত্রিবিহারিণো নাতিদূরারণ্যবাসিনঃ
সাধকস্য মুণ্ডধারিণো ঘোরঘণ্টনামধেয়স্য অন্তেবাসিনী মহাপ্রভাবা
কপালকুণ্ডলা নামানুসংধ্যং সমাগচ্ছতি ততইয়ং প্রবৃত্তিঃ।

—কপালকুণ্ডলা! কপালকুণ্ডলা! মুরলীকে ডাকো, এক্ষুণি আমার কাগজ কলম দোয়াত ঠিক করে দিতে। রাত দশটার আগে আমাকে কেউ ডাকবে না। '...অন্তেবাসিনী মহাপ্রভাবা কপালকুণ্ডলা নামানুসংধ্যং সমাগচ্ছতি ততইয়ং প্রবৃত্তিঃ'। স্ত্রীকে এই বলতে বলতে কাছারির পোষাকেই হাকিম তাঁর পড়ার ঘরে প্রবেশ করলেন।

বারুইপুরের এক নির্জন বাংলোয় রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে কবি-কল্পনার এক নূতন সৃষ্টি রূপ নিলো। রূপ নিলো শিল্পিমনের এক সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি। এলো কাপালিক-প্রতিপালিতা অরণ্যচারিণী কুমারী কপালকুণ্ডলা। 'এমন অচ্ছিদ্র,

উজ্জ্বল, বাচালতাশূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাঙলায় আর নেই।' বারুইপুর স্মরণীয় হয়ে রইল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে। বাঙালী পাঠক সবিস্ময়ে দেখল—এ যেন একাধারে মিলটনের ঈভ, কালিদাসের শকুন্তলা, হোমারের নসিকেয়া, শেক্‌সপিয়রের মিরান্দা ও পার্ডিটা, বায়রণের হেইডি ও জর্জ এলিয়টের এপি। এ এক অপূর্ব মনোরম সৃষ্টি। এ বঙ্কিমের মানসী সৃষ্টি। কাপালিক-প্রতিপালিতা সমুদ্রতটবিহারিণী বনবাসিনী সৃষ্টিছাড়া এই অপূর্ব মোহিনীমূর্তি—এই সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমা-রচনায় বঙ্কিম-কল্পনার নিগূঢ় অভিপ্রায়টা কি ছিল ?

ভবভূতির কপালকুণ্ডলা আর বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা এক শ্রেণীর সৃষ্টি নয়। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিম দৃঢ় হস্তে তুলি না ধরে অদৃষ্টের ক্রূরলীলার অতি বিষাদময় অথচ অতীব মনোরম আলেখ্য এঁকেছেন। ইহা উপন্যাস নয়—কাব্য। কাব্যধর্ম এর পাতায় পাতায় পরিস্ফুট। 'প্রদোষ তিমিরাক্রান্ত সমুদ্রতটে আমরা প্রথম এই মোহিনীমূর্তিকে দেখিলাম। সে মূর্তি বড় সুন্দর, সে চরিত্রও বড় মনোরম। কিন্তু সেই কুহক-মুহূর্তে গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে যাহাকে দেখিলাম, তাহা সান্ধ্যপ্রকৃতির মত, সমুদ্রের গর্জনের মত—তাহার সবটা উপলব্ধি করা যায় না—তাহার খুব অল্প অংশই বহিরিন্দ্রিয়-গোচর, বাকীটা কল্পনা ভিন্ন অন্য কোনো বৃত্তির নিকট আত্মরহস্য উদ্ঘাটিত করে না।' বনের ফুল নিয়ে কেমন করে একটি অপূর্ব মালা গাঁথা সম্ভব—বঙ্কিমের কপাল-কুণ্ডলা তারই নিদর্শন। 'শাদার উপরে এমন সুন্দর শাদা ও মনোমুগ্ধকর কার্য, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে আর দেখা যায় না।'*

বই প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাগ্রে একখানি উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষেত্রনাথকে। এবার আর তিনি অভিমত চেয়ে পাঠালেন না। বই পড়ে ক্ষেত্রনাথ তাঁকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—'কি বলিয়া তোমার এই দ্বিতীয় উপন্যাসখানি সম্পর্কে অভিমত জানাইব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা সত্যই অপূর্ব—splendid, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না এবং ইহা দ্বারাই ঔপন্যাসিক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে তোমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত

* বঙ্কিমচন্দ্র : গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী

হইল জানিবে।' পরবর্তীকালে এই উপন্যাসখানি সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকদের অভিমত ক্ষেত্রনাথের উক্তিকে সমর্থন করেছে। চরিত্র-সৃষ্টি, গঠন-কৌশল, ভাষার ওজস্বিতা ও সাবলীলতা, যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক, কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের একটি অপূর্ব সৃষ্টি এবং এই কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, শেক্‌সপিয়রের কোনো নাটকও এত নিখুঁত নয়। কপালকুণ্ডলা, মেহেরউন্নিসা ও মতিবিবি—বিশ্বসাহিত্যে এই তিনটি নারীচরিত্রের অনুরূপ চরিত্র আছে বলে আমাদের জানা নেই। 'কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে'—এই কয়টি কথার মধ্যে নূরজাহানের মনের আলো যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার হৃদয়ের বিস্তৃতির যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে সত্যিই একজন 'Supreme master'—শ্রীঅরবিন্দের এই অভিমত যথার্থ।

আর কপালকুণ্ডলা? 'এই চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য অপূর্ব সাংকেতিকতা, যাহা বৃহত্তর জগতের আভাস আনিয়া দেয় এবং ইহারই জন্য নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক শক্তির মধ্যে অপরূপ সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।...তাহার দেহের রূপ ও কণ্ঠের মাধুর্য যেন প্রকৃতির মহিমার অংশ তাহার কটাক্ষ সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রলেখার ন্যায়; তাহার দেহে এমন একটি মোহিনী শক্তি ছিল যে তাহা গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে দাঁড়াইয়া না দেখিলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। তাহার কণ্ঠের শব্দ পবনে আন্দোলিত হইয়াছে, বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইয়াছে, সাগরনাদে মন্দীভূত হইয়াছে। তাহার লীলাচঞ্চল গতি নিসর্গমায়ার মতই নবকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে, বিভ্রান্ত করিয়াছে। এই পরমাশ্চর্য রমণী বঙ্কিম-কল্পনার এক মোহিনী সৃষ্টি।'*

অথচ এই মোহিনীমূর্তির মধ্যেই প্রেমের অভাব।

কেন? কেন কপালকুণ্ডলা করুণাময়ী হয়েও প্রেমময়ী হয়ে উঠতে পারল না? রমণী হৃদয়ে প্রেম জন্মাবে না? জীবনরসিক বঙ্কিমচন্দ্র এমন উদ্ভট সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি জানতেন—প্রেম রমণীর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম নয়, এ একটা পারিবারিক গুণ। সন্তানের স্নেহে, মাতাপিতার হৃদয়ের মিলনের ফলে এর উদ্ভব। কপালকুণ্ডলার সে রকম কোনো সংস্কার ছিল না—সেরকম

* বঙ্কিমচন্দ্র: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সামাজিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল তার মধ্যে। প্রকৃতির শিশুকে সমাজের লোক করা যায় কি না? অথবা, সমাজ সংসর্গে তার কতদূর পরিবর্তন হতে পারে?—এই অভিনব প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা রচনার বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং একদিন তাঁদের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রকে। কথিত আছে, ব্যঙ্গপ্রিয় মধ্যম অগ্রজের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হয় নি (তিনি বলেছিলেন: 'যদি দরিদ্রের ঘরে বিয়ে হয় তাহলে মেয়েটা চোর হবে'), দীনবন্ধু অবশ্য কোনো মতামত প্রকাশ করেননি।

বঙ্কিম তাঁর কল্পনায় এই সত্য অনুভব করেছিলেন যে, নির্জন সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির আহ্বান অনুভব করেছে, পুরুষের নয় এবং সম্ভবত সেই কারণে স্বভাবসৌন্দর্যের এই প্রতিমার মনের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সার উদ্রেক বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে অস্বাভাবিক বোধ হয়েছে। তাই কপালকুণ্ডলার মাতৃত্ব-লাভ তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, যে-নারীর মন একেবারে নিঃসঙ্গ, সে গৃহসুখে কিছুতেই সুখী হতে পারে না। তাই নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক আর অন্তরের শক্তি—এই তিনের যুগপৎ আহ্বান কপালকুণ্ডলার কাছে অপ্রতিরোধ্য ছিল বলেই জীবন বিসর্জনের মধ্যে সেই জীবনের একমাত্র সুষ্ঠু পরিণতি দেখিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে উচ্চমার্গের শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তাঁর এই দ্বিতীয় উপন্যাসখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায়। শিল্পী হিসাবে তিনি যে এখন আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা অর্জন করেছেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে যেমন সংশয় ছিল না, আমাদের মনেও আর কোন সংশয় রইল না। আদর্শ নারীত্বের বিকাশ আমরা এখানে দেখতে পেলাম না সত্য, কিন্তু সন্ধ্যালোকের ঈষৎ স্পষ্ট ও ঈষৎ অস্পষ্ট মহিমায় বঙ্কিমের এই সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি চিরকালের মতন মহীয়সী হয়ে রইল আমাদের কল্পনায়।

এই উপন্যাসই সেদিন বঙ্কিমের যশঃশুভ্র ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল রাজটীকা আর বাঙলা সাহিত্যমণ্ডলের সম্রাটপদে বৃত হওয়ার জন্য তিনিই যে যোগ্যতম ব্যক্তি, সেটাও একরকম নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হয়ে গিয়েছিল এই সময়ে। তবে একটি কথা আমাদের মনে হয়েছে। শেক্‌সপিয়রের সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র এইসময়ে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে, হয়ত অজ্ঞাতেই কপালকুণ্ডলার

রূপকল্পনায় টেম্পেষ্ট এবং ওথেলোর দ্বারা তিনি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রভাব একেবারে মূলগামী বললেও অন্যায় হয় না। আমরা জানি, মধু-মানসের মতোই বঙ্কিম-মানস ছিল সে প্রভাবের একান্ত প্রত্যাশী।

॥ আট ॥

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করলেন।

জীবনের পরবর্তী সাতাশ বছর কাল তিনি বিধিদত্ত এই শক্তির সাহায্যে কিভাবে যুগ ও জীবন গঠন করলেন, অতঃপর আমরা বঙ্কিম-প্রতিভার সেই পরমাশ্চর্য পরিণতির কথা-ই ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব। তাঁর প্রতিভার পরিণতি উপলব্ধি করতে হবে তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে, তাঁর মননশীল রচনাবলীর মধ্যে। এক হিসাবে তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বীয় জীবন যেমন অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে। 'জীবন লইয়া কি করিতে হয়?'—এই সূত্রটিকেই শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র এবং মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরই বিভিন্ন রচনার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন, বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠের সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—মনে রাখা দরকার যে, তিনি একটিও বৃথাবাক্য রচনা করেন নি তাঁর কোনো চিন্তাই নিষ্ফল বা অর্থহীন চিন্তা নয়। তাঁর বাক্য যেমন অসন্দিগ্ধ, তেমনি সারবান।

তিনিই সার্থক শিল্পী যিনি তাঁর দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের রূপ ও রসকে দেখতে পারেন ও আস্বাদন করতে পারেন। জীবন-কাব্যের অপরিসীম সৌন্দর্যের অনুভূতিতে ও প্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে তো বটেই, এমন কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র দশখানি, তাঁর শক্তির তুলনায় ইহা নিতান্তই কম; কিন্তু সেজন্য আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই; কেননা, শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'পরিমাণে কম হইলেও ইহা খাঁটি সোনা'। বঙ্কিম নির্দোষ শিল্পী। তাঁর চরিত্রগুলি সত্যিকার জীবন্ত পুরুষ ও নারী। কাঠামো তৈরি করে তার উপর মূর্তি গড়ে কেমন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, এ তাঁর বিশেষভাবেই জানা ছিল এবং এইখানেই তো তাঁর বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যে আশ্চর্য প্রেম ও কাব্য-রস অনুভূত হয়, বাঙলা সাহিত্যে তার জুড়ি মেলা ভার। তারপর নারী-চরিত্রের কথা। বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ পরিলক্ষিত হয় এইখানে।

এইক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যে তিনি 'একপত্রী'। নারীচরিত্রের রহস্য অঙ্কনে যে নাটকীয় প্রতিভার প্রয়োজন, বঙ্কিমের তা ছিল। এমন নারীচরিত্র সমসাময়িক ইংরেজী উপন্যাসের মধ্যেই বা কয়টি দেখা যায়? বঙ্কিম-যুগের যেসব সমালোচক দুর্গেশনন্দিনীতে স্কটের 'আইভ্যান হো'র ছায়াপাত আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা কি জানতেন না যে স্কটের নারীচরিত্রগুলি মোমের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়? পৃথিবীতে যে তিনজন লেখককে নারীচরিত্রের রহস্য অঙ্কনে যথার্থ পারঙ্গম বলে গণ্য করা হয় তাঁরা হলেন শেক্‌সপিয়র, মেরেডিথ আর বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ে আরো কিছু বলব।

১৮৬৯ সনে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হল।

এরপরই বঙ্কিমের খ্যাতি বিদগ্ধসমাজে স্বীকৃত হয়। মৃণালিনীর সুদীর্ঘ ও জটিল আখ্যায়িকার মধ্যে বাস্তবকে রূপায়িত করবার সংকল্প অভিব্যক্ত হয়েছে এবং সেই সংকল্পই এই উপন্যাসেই সর্বপ্রথম একটি নির্দিষ্ট আকার নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অতীত চেতনা 'তাঁহাকে হিন্দুরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিবার আশায় মুগ্ধ করিয়া তুলে এবং বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে সতের জন মুসলমান সৈনিক কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের যে কাহিনী বাঙলার হিন্দুরাজাদের উপর কলঙ্ক লেপিয়া দিয়াছিল, সেই কলঙ্ক স্খালনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব কল্পনার রসে নূতনভাবে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের অচেতন চেতনা গোপনে তাঁহার স্বপ্নকে ভাঙিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তিনি তাঁহার মানবচরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপন করিয়া তাহাদের অন্তর্লীন সৌকুমার্য ও সংগ্রামশীলতাকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া জন-সাধারণের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল, ইতিহাসের গভীর রসভাণ্ড হইতে রস আহরণ করিয়া তাঁহার সমকালীন মানুষ বাস্তবকে নিজস্বভাবে রূপান্তরিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। কিন্তু ইতিহাস তাঁহাকে ব্যর্থ করিল। মাধবাচর্য, হেমচন্দ্র, পশুপতি প্রভৃতি যাঁহাদের উপর তিনি বাঙলা পুনরুদ্ধার ও হিন্দুরাজ্য স্থাপনের অসম্ভব দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কার্যোপযোগী শক্তিসামর্থ্য বা দক্ষতার অধিকারী নন।'*

* বঙ্কিম-মানস : অরবিন্দ পোদ্দার

পরিবেশ-রচনা মৃণালিনীতে অত্যন্ত দক্ষতাপূর্ণ; অতি উচ্চাঙ্গ ঐতিহাসিক কল্পনার পরিচয় আছে এর প্রতিটি পৃষ্ঠায়, তবে তার ব্যাখ্যানে ইতিহাসের মর্যাদা কতখানি অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তা বিচার্য। মনে হয়, বাস্তব ইতিহাসের গতিধারা এবং কার্যকারণ পারম্পর্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বিরোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পী তাই তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য দেখাতে গিয়ে তাঁরই অজ্ঞাতসারে তাঁর আশাবাদকে ক্ষুণ্ণ করেছেন আর সংকল্পকে করেছেন দুর্বল। এই উপন্যাসে মনোরমা একটি আশ্চর্য চরিত্র। আশ্চর্য এবং রহস্যময়। এই অসামান্যা রমণী-চরিত্র বঙ্কিম-কল্পনার একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আবার এ সৃষ্টি অত্যন্ত ইঙ্গিতময়। 'কুসুমনির্মিতা দেবীপ্রতিমা' মনোরমা বালিকা না তরুণী?—ইহা বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে নিজে বুঝে নিতে বলেছেন। আর মনোরমার রূপ? 'মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাহার সর্বাঙ্গীণ সৌকুমার্যের জন্য। তাহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার; সুকুমার কপোল, সুকুমার কেশ।.. গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে সৌকুমার্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য।' এই রূপ অতৃপ্তনয়নে দেখবার রূপ। এই রূপের প্রতিমার মধ্যে 'অপূর্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগল্‌ভ বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য'-এর সমাবেশ দেখিয়ে শিল্পী এই চরিত্রটিকে যে সম্পূর্ণতা দান করেছেন তা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। মনোরমার হৃদয়? সে হৃদয়ের বিশ্লেষণ করতে গেলে তার রূপের মতই রহস্য আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। কি হেমচন্দ্র, কি পশুপতি—কেউই মনোরমার হৃদয়রহস্যের কিনারা করতে পারেন নি—পশুপতি তো এই তরুণী বালিকার মধ্যে দুই বিভিন্ন মূর্তি দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

এই যে বিভিন্নতা ও বৈষম্যমণ্ডিত একটি নারী-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন, এর মধ্যে সুসঙ্গতির সূত্র কোথায়? 'মনোরমা হইতেছে নারীর সেই মূর্তি যাহা পুরুষের চক্ষে প্রতিভাত হয়। পুরুষের কাছে নারী গৃহিণী, সচিব ও সাথী, বৈচিত্র্যময়ী ও রহস্যময়ী: পুরুষ রমণীকে নানা অবস্থায় দেখে, নানা অবস্থার মধ্যে তাহাকে আপনার করিয়া পায়, তথাপি মনে হয় তাহার মধ্যে এমন একটি বৈচিত্র্য, রহস্য আছে যাহা কিছুতেই সহজ ও সরল হয় না। পুরুষের এই বিস্মিত, চকিত, ক্ষুব্ধ অনুভূতি মূর্তি পাইয়াছে মনোরমারই

চরিত্রে।' * মনে হয়, মনোরমা বঙ্কিম-সাহিত্যের 'মোনালিসা'। মোনালিসার ওষ্ঠের সেই রহস্যময় হাসির ব্যাখ্যা কে করতে পেরেছে? পুরুষের কাছে রমণী যে রহস্যময়ী মোহিনীমূর্তিতে প্রতিভাত হয়, মোনালিসার ছবি তারই অনুলিপি। মনোরমাও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।

প্রসঙ্গত এই উপন্যাসখানির আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। গানে ও শুভ্রসংযত রসিকতায় মৃণালিনী গ্রন্থখানি অতি অপূর্ব। এখানেও কাব্যের ধর্ম সুস্পষ্ট। কল্পনা ও শিল্পকুশলতায় ইহা কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হলেও, মৃণালিনী বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি—এ কল্পনালোকেরই সামগ্রী। ইহার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—ভবিষ্যতে তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে বঙ্কিম যে অতুলনীয় স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়েছেন, মৃণালিনীতে তার সূচনা দেখা যায়। সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহী এই বাঙলাদেশ একদিনে জয় করল—ইতিহাসের এই যে প্রচলিত আখ্যান, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই আখ্যানের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করলেন—বাঙালীর কলঙ্ক ধুয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বলিষ্ঠ হস্তে লেখনী ধারণ করলেন। এই আজগুবি ইতিহাসে তিনি এতদূর বিরক্ত হন যে, বার বার তিনি এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। একবার বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সমালোচনার প্রসঙ্গে, আবার দু'বছর পরে ঐ বঙ্গদর্শনেই 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধে। অন্যত্রও তিনি এই কথা আলোচনা করেছেন। স্থানান্তরে আমরা এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব। বাঙলা ও বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি; বঙ্কিম-মানসের এই দিকটাই সর্বপ্রথম অভিব্যক্ত হয়েছিল মৃণালিনী উপন্যাসে। এর প্রকৃত মূল্য এইখানেই।

এইবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বে উপনীত হব। আমরা দেখেছি তাঁর প্রথম পর্বের সাহিত্যজীবনের প্রেক্ষাপটে ছিল সদ্য বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ আর দেশের সাধারণ পরিস্থিতি। দ্বিতীয় পর্বের সূচনায়

* বঙ্কিমচন্দ্র: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সেই পরিবেশ আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে এই সময়ে (১৮৭০-১৮৭৮) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি শাসকজাতির বিরূপ ও অনুদার মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে দুইটি খুব প্রসিদ্ধ—সিবিল সার্বিস থেকে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অপসারণ ও ভার্ণাকুলার প্রেস আইন। বিষয় দুটি আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।* দ্বিতীয় ঘটনাটি সম্পর্কে এখানে শুধু সেইটুকু উল্লেখ করব যেটুকুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি তখন বহরমপুরে। দেশীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সেইসময়ে লিখেছিল: 'বঙ্কিমবাবুর মতে গভর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাসের যে মনোভাব দেখা দিয়াছে, তজ্জন্য দেশীয় সংবাদপত্রের প্রচারকার্যই দায়ী।...বঙ্কিমবাবুর ন্যায় একজন শিক্ষিত নেটিভের এই মন্তব্য শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, কারণ তিনি অনুল্লেখযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত নহেন। কোন স্বাধীন দেশে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের স্তরের কোন লোক এইরূপ মন্তব্য করিতেন তাহা হইলে তিনি সর্বসাধারণের নিন্দাভাজন হইতেন। কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্টের চাপে একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিকও স্বদেশের বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়। বঙ্কিমবাবুর এই দুষ্ট মন্তব্য ইতোমধ্যেই তাঁহার প্রভুর অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তিনি মাসিক মাত্র ছয়শত টাকা মাহিনা পাইয়া থাকেন; আশা করা যায়, প্রমোশন পাইলে তাঁহার উৎসাহ দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে।' (অনুবাদ লেখক-কৃত নয়।)

বঙ্কিমচন্দ্র তখন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ডেপুটি হিসাবে কিছুটা খ্যাতিও লাভ করেছেন। উপরন্তু তখন তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক এবং জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। সমকালীন সমাজ-জীবন থেকে তিনি দূরেই থাকতেন এবং দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে তিনি যে খুব অনুকূল মত পোষণ করতেন না, তা তাঁর সেই সময়কার কর্মজীবনে কতকটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাই বলে তিনি যে 'Traitor' ছিলেন এমন কথা আমরা মনে করি না এবং মনে করি না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শিশিরকুমার ঘোষের এইরকম অশালীন মন্তব্যের সমর্থন করি না। কিন্তু আমাদের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। এই দুটি

* লেখকের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য

ঘটনা এবং অন্যান্য ঘটনার ফলে এইসময় থেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মনে নিদারুণ ব্যর্থতা দেখা দিতে থাকে। শিক্ষা ও কর্মজীবনের অর্থনৈতিক সংকটের ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তখন রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। মোট কথা, তখন একটা সর্বাঙ্গীণ জাগরণের সূচনা হয়েছে আর বাঙালী সমাজ-জীবনের সমস্ত প্রবাহে, সমস্ত দিকে গভীর আত্মোপলব্ধির চেতনাটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে এর কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারত-সভার মঞ্চ থেকে তখন রাজনৈতিক দাবীর কথাও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ভাব-বিপ্লবের এই ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্বের শুরু। শুধু দ্বিতীয় পর্ব? বঙ্কিম-মানসের রূপান্তরও এইসময় থেকে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রাণপ্রাচুর্য ও আত্মোপলব্ধির প্রেরণা এইবার যেন আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মাভিমানের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হতে চাইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্বের প্রধান ঘটনা 'বঙ্গদর্শন'; বঙ্গদর্শনের কথা পরে বলছি, এখন তাঁর পরবর্তী শিল্প-সৃষ্টির কথাই বলি। এই পর্বের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। এখান থেকেই শিল্পী বঙ্কিমের দিক্-পরিবর্তন সূচিত হ'ল এবং উপন্যাস-সাহিত্যে তিনি একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করলেন। এইবার তাঁর দৃষ্টি রোমান্সের জগৎ থেকে বাঙালী-সমাজের বৃহত্তর জগতের উপর নিপতিত হ'ল; কবি-হৃদয়ের নিগূঢ় বেদনা এইবার যেন সমাজ-জীবনের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে চাইল। জীবনসমস্যা-বোধকে অঙ্গীকার করেই তিনি ঔপন্যাসিকের স্বধর্মে ও স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের এই দ্বিতীয় পর্ব এবং এই পর্বের প্রথম উপন্যাস বিষবৃক্ষ—দুই-ই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্যের কথা আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই

এদের মুখ্য উপকরণ। বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।'

সৌন্দর্যসৃষ্টির স্তর অতিক্রম করে, যৌবনোত্তর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র পদার্পণ করলেন উদ্দেশ্য বা purpose-এর স্তরে। তাঁর এই স্তরের উপন্যাসগুলিতে ধর্ম, নীতি, সংসার, সমাজ—এই চারটি বিষয়ের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত বহু-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত সম-সাময়িক সামাজিক আন্দোলন উপলক্ষ করেই বিষবৃক্ষ রচনা করেন। তবে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত মতামত আছে 'সাম্য' প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর নন। সামাজিক এই সমস্যাটি সম্পর্কে বঙ্কিমের সহানুভূতিহীন মনোভাব ও স্ববিরোধী উক্তির আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। শিল্পী-হৃদয়ে এই সহানুভূতি ছিল না বলেই কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও উদার মনোভাব এবং নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের অনুরাগ কেমন করে তাদের দুজনকে নূতন করে সৃষ্টি করে চলছিল, কেমন করে পারস্পরিক নিঃশব্দ সহানুভূতি ও অনুরাগের ফলে এই দুইটি নর-নারী উভয়কে উভয়ের সন্নিকটে দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে চলছিল—তা যেন শিল্পী বঙ্কিমের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে আমরা এও দেখি যে, নগেন্দ্রের জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বিতা কুন্দের আবির্ভাবের পর থেকে সূর্যমুখী-নগেন্দ্র-সম্পর্কের মধ্যে একটা অলক্ষ্য ফাটলের সৃষ্টি হয়ে উত্তরোত্তর একটা প্রাণহীন গতানুগতিকে পরিণত হয়েছে—এ সত্যটাও শিল্পী উপেক্ষা করে গিয়েছেন।

বিষবৃক্ষ সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসখানি ব্যর্থ, এ কথা বলতে হয়। 'নৈতিক অনুশাসনের বেদীতে হৃদয়ের অনুরাগস্নিগ্ধ অনুভূতিকে 'বলি' দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নীতি-প্রবণতার অভ্রান্ত পরিচয় দিয়াছেন' ; এবং 'সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণের প্রেরণায় শিল্পী বঙ্কিম একান্তভাবে অনুপ্রাণিত'—আমরা এই জাতীয় অভিমত আদৌ সমর্থন করি না। আনুভূতিক সত্যকে অথবা নর-নারীর ভালবাসার প্রবাহকে তিনি অনুসরণ করেননি এবং প্রচলিত নৈতিক সত্যকেই তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি

* প্রবাসী, ১৩৩৮, আশ্বিন

দিয়েছেন—আধুনিক সমালোচকদের এই অভিযোগও আদৌ বিচারসহ নয়।

আসল কথা, বিষবৃক্ষে যে শিল্পী-মানসের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তা যে একটি অনুভূতিহীন মানস কিম্বা নীতিধর্মের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানস—এর প্রমাণ কোথায়? আমার বিবেচনায় বঙ্কিম-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ বিষবৃক্ষে। এখানে নিয়তির অনতিক্রমণীয়তা লক্ষণীয়। নিয়তি-লীলার যে চিত্র এখানে এবং তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে পাই, তা বুঝতে হলে গ্রীক ট্র্যাজেডির সঙ্গে বঙ্কিমের শিল্পকৌশলের তুলনা করতে হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে দেখি নিয়তি অলক্ষ্যে থেকে যে জটিল জাল বুনে চলেছে, মানুষের পক্ষে তা ছিন্ন করা অসাধ্য। তার জ্ঞান অস্পষ্ট, সে জেনেও জানে না। মনে রাখতে হবে শেক্সপিয়রের নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের উপন্যাসাবলির ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংলণ্ডের মহাকবি নিয়তির বিধানকে অস্বীকার করেননি, তিনি অতি-প্রাকৃতেরও অবতারণা করেছেন, কিন্তু জোর দিয়েছেন মানুষের প্রকৃতির উপর। মানবচরিত্র অধ্যয়নে এবং সেই চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে বঙ্কিমও মানুষের প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেননি। নিয়তির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির ঐক্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তাঁর কল্পনার সাহায্যে। বিষবৃক্ষের সার্থকতা এইখানেই।

একদিন রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যার প্রুফ দেখার কাজে তন্ময় হয়ে আছেন। টেবিলের উপর একপাশে বিষবৃক্ষের পাণ্ডুলিপির খাতা—তখন মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদ লেখা শেষ হয়েছে। এই বিষবৃক্ষ হৃদয়ে ধারণ করেই বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। গৃহকর্ম শেষ করে রাজলক্ষ্মী দেবী এলেন সেই ঘরে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এই নাম আজ কতজনের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়; কত লোকে তাঁর স্বামীর লেখা নভেল পড়ে। পড়ে তারা আনন্দ পায়। এমন স্বামী-সৌভাগ্য কয়জন স্ত্রীলোকের হয়? কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগভরে বললেন—তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সম্পদ। আমি অন্য সুখ বা সম্পদ চাই না।

কথাগুলো বঙ্কিমচন্দ্রের মনের মধ্যে গেঁথে গেল। বললেন, বড়ো সুন্দর কথা বলেছ সেজবৌ। কাজে লাগবে, লিখে রাখি। কয়েক মাস পরে। তখনো

বিষবৃক্ষ লেখা চলছে। একদিন রাত্রে শয়নের পূর্বে স্ত্রীকে পড়ে শোনালেন। সূর্যমুখী স্বামীকে বলছে—'পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে তবে সে স্বামী।' কেমন হয়েছে? রাজলক্ষ্মী দেবী কোনো জবাব দিলেন না। শুধু নিঃশব্দ স্মিত হাসিতে তাঁর অন্তরের অনুমোদনটুকু জানালেন। বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যা বলেননি যে, তাঁর জীবনে তাঁর স্ত্রীর প্রভাব ছিল। আমরা বলব প্রভাব এবং প্রেরণা দুই-ই ছিল সমানভাবে। এ আমাদের কল্পনা হতে পারে, তবে বঙ্কিমের মতন শিল্পীর জীবন সম্পর্কে এমন কল্পনা অসঙ্গত নাও হতে পারে। কেননা, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, বিষবৃক্ষে তাঁর নিজের জীবনের একটা ছবি আছে। তবে আসল ছবির ওপর শিল্পী অনেক রং ফলিয়েছেন। সেই রং বেশি করে লাগল সূর্যমুখীর গায়ে। সেই তো বিষবৃক্ষের গৌরব। সূর্যমুখী যেন অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চন। বেশ বোঝা যায় যে, এই চরিত্রটির প্রতি স্রষ্টার বড় সহানুভূতি ছিল। এই আখ্যায়িকার প্রায় সমস্ত idealism ঐ একটি চরিত্রে কেন্দ্রীভূত—সূর্যমুখী-চরিত্র পুরাণের সত্যভামার আদর্শে পরিকল্পিত। সূর্যমুখীকে নিঃসন্তানা করায় রাজলক্ষ্মী দেবীর আপত্তি ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীকে তিনি বলেছিলেন, একটি ছেলে থাকলে তারো স্বামীপ্রেম আরো গভীর হ'ত। সূর্যমুখীর স্রষ্টা এর উত্তরে বলেছিলেন, ঠিক বলেছ। আমি নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর প্রেমকে দিলীপ-সুদক্ষিণার প্রেমের মতন চিত্তাকর্ষক করে ফোটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় কালিদাস আর কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র। সুদক্ষিণার ছেলে ছিল কি?—রাজলক্ষ্মী দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে স্বামী তাঁকে বলেছিলেন—ছিল বৈ কি। ছিল বলেই তো তাদের প্রেম পরস্পরের প্রতি অমন বর্ধিত হয়েছিল। তবে তুমি সূর্যমুখীকে নিঃসন্তানা করলে কেন? আবার সেই কঠিন প্রশ্ন।—ভগবান যে আমাদের সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত করেছেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যমুখীর স্রষ্টার অন্তরে কি কোনো দীর্ঘশ্বাস উঠেছিল?

বিষবৃক্ষ রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র নূতন করে রঘুবংশ পড়েছিলেন। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রের বিলাপ রঘুবংশের অজ-বিলাপের ভঙ্গিতে পরিকল্পিত। 'সূর্যমুখী আমার সব···আমি পুরুষ, রত্ন চিনিব কেন?' স্ত্রীকে পড়ে শোনালেন নগেন্দ্রের বিলাপ। কেমন হয়েছে মনে কর? জিজ্ঞাসা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

আমি অত শত কি বুঝি? শুনতে বেশ লাগল—'সূর্যমুখী আমার সব'—এর বেশি আর কিছু বলেননি রাজলক্ষ্মী দেবী। এই কি বঙ্কিম-জীবনের ছবি? সূর্যমুখী সম্বন্ধে যেমন, তেমনি বঙ্কিম-কাব্য-কাননের অফুটন্ত কুন্দকুসুম সম্পর্কেও রাজলক্ষ্মী দেবীর অন্তরে কৌতূহল বড়ো কম ছিল না। এও বঙ্কিমের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। শুভ্র—কিন্তু ফুটবার অবকাশ পেল না বলে সবটুকু সুবাস বিতরণ করতে পারল না। তিলোত্তমার মতনই সে নীরব সহনশীলা—'মুগ্ধা নায়িকা' আর কপালকুণ্ডলার ন্যায় দৈবাহতা।

—তুমি কি বিধবা-বিবাহের কুফল দেখাবার জন্য কুন্দকে সৃষ্টি করেছ?

—তোমার কি মনে হয়?

—আমি কি বুঝি? কুন্দকে বিধবা করেছ কেন?

—কেন, বল তো।

—সমাজশিক্ষার প্রয়োজনে? না, সূক্ষ্ম কাব্যকলার প্রয়োজনে?

—যে যেমন বোঝে। কুন্দকে তোমার কি মনে হয়—সে কি সুখী?

—সুখী কিনা বলতে পারি না, তবে হতভাগী বুঝেছিল যে, সকল সুখেরই সীমা আছে।

—ঠিক বলেছ, উপন্যাসে যেমন, জীবনেও তেমনি—সকল সুখেরই সীমা আছে। আমার নিজের জীবনেই এটি একটি পরীক্ষিত সত্য।

—সত্যি বলছ?

বঙ্কিমচন্দ্র নিরুত্তর রইলেন। 'জীবন লইয়া কি করিতে হয়?'—বোধ হয়, এই বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলেন উনিশ শতকের বাঙলার সেই অদ্বিতীয় জীবনশিল্পী।

চরিত্রের কথা থাক। আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। সেটা পরিস্ফুট হয়েছে এর harmony বা সুসঙ্গতির মধ্যে। 'যে দুইটি প্রধানা নায়িকাকে লইয়া গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহারা উভয়েই নগেন্দ্রের স্ত্রী। এই ঐক্যটুকু বাদ দিলে তাহাদের চরিত্রে ও জীবনের পরিণতিতে প্রভেদের অন্ত নাই। সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী যেন দুইটি বিভিন্ন জগতের মানুষ। অথচ গভীরতম অভিজ্ঞতায় ইহাদের মধ্যে অপরূপ সাদৃশ্য

দেখা গিয়াছে ; চরম সংকটে উভয়ের হৃদয়সাগর বিমথিত করিয়া একই সুধা আহৃত হইয়াছে—উভয়েই নগেন্দ্রগত প্রাণ। একে অপরের মঙ্গলের জন্য পলায়ন করিয়াছে। কুন্দ সূর্যমুখীর পায়ের কাঁটা হইয়া থাকিতে চাহে নাই—সূর্যমুখী নিজেই উদ্যোগ করিয়া স্বামীর বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। কিন্তু দুইজনেই স্বামীকে একটিবার দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছেন ; দুইজনেই মৃত্যুকালে স্বামীর হাসিমুখ দেখিয়া মরিতে চাহিয়াছেন।'*

এই যে নানা বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মধ্যে সৌসাদৃশ্য—ইহাই তো উপন্যাসের মৌলিক ঐক্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিষবৃক্ষের ঘটনা-সন্নিবেশ কলাকৌশলময়, কিন্তু এর কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে দুর্বার নিয়তি। গোবিন্দপুরে দত্তবাড়ির জীবনে আকস্মিক কিছুই নেই ; সকল ঘটনা যেন ছক-কাটা পথে ঘটে চলেছে আর সকল পরিণতিই যেন পূর্বনির্দিষ্ট। ইহা সত্যিই একটি সুডৌল গ্রীক নাটক। শুধু নিয়তির লীলায় নয়, বিষবৃক্ষের গঠনেও অনেক বিষয়ে গ্রীক নাটকের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী, তাই বিষবৃক্ষের সন্নিধানে ফলেফুলে সমৃদ্ধ একটি চন্দনতরু রোপণ করতে তিনি বিস্মৃত হননি। কমলমণি সেই চন্দনতরু ; নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর অশান্তিভরা জীবনে একটু মাধুর্য বিস্তার করার জন্য এই চরিত্রসৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। বাঙালী হিন্দুসমাজের আর একটি চিত্র—ননদ-ভ্রাতৃবধূর প্রীতি। মহাভারতের পর আর কোনো হিন্দু কবি এ চিত্র আঁকতে পারেন নি, যেমন এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। অরবিন্দ মিথ্যা বলেননি—ঔপন্যাসিক বঙ্কিম 'faultless artist'—নির্দোষ শিল্পী। 'Life as it is'—বাঙলা সাহিত্যে যা পূর্বে ছিল না, এখন আমরা তাই পেলাম। বিষবৃক্ষের প্রকৃত সার্থকতা এইখানেই।

বঙ্কিম-প্রতিভা নব-নবোন্মেষশালিনী।

নিজেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন বারে বারে।

সেই সৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে তাঁর চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্যে। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র মানবের শক্তিতে

* বঙ্কিমচন্দ্র : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ক্রমশঃ আস্থাবান হয়েছেন, দেখা যায় এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্যতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস যেন শিথিল হয়ে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে নিয়তির পদক্ষেপ আর শোনা গেল না। এখন থেকে পূর্বের প্রাণপ্রাচুর্যের সঙ্গে নবলব্ধ আত্মচেতনা ও আত্মজিজ্ঞাসা সংযুক্ত হয়। নিজস্ব ধ্যানধারণার গৌরবে ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করার স্বপ্ন নিয়ে শিল্পী এইবার অগ্রসর হলেন।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আবার রোমান্সের বর্ণসমারোহ ও মোহময় জগতে ফিরে এলেন এবং জীবনের সরসতা ও নীরসতা দুই দিককেই এক সূত্রে সন্নিবিষ্ট করে আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু এহো বাহ্য। সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ছবিই এখানে সমধিক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাস্তব জীবনাচরণের সংকট অতীত পরিবেশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটের চাপে কোলাহলহীন শান্তিপূর্ণ জীবনপ্রবাহ কি রকম অনিশ্চিত ও দুর্বিষহ হইয়া উঠে, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিত্রই নিপুণভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।' এক কথায়, এই উপন্যাস সমসাময়িক বাঙলার জীবনবৃত্ত তার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বেদনা-বিধুর কাহিনী। ইতিহাস ও কল্পনার এমন পরমাশ্চর্য সমন্বয় ক্বচিৎ দেখা যায়।

আরো একটি কারণে এই উপন্যাস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে আমরা একই শিল্পী-মানসের দ্বিধাবিভক্ত মূর্তি দেখি—দেখি নীতিবেত্তা বঙ্কিমকে আর ঠিক তারই পাশাপাশি সৌন্দর্যের উপাসক বঙ্কিমচন্দ্রকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর নীতিজ্ঞান তাঁর সৌন্দর্যচেতনাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। নীতিবেত্তাকে কবির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। শৈবলিনী-প্রতাপের প্রণয় কবি বঙ্কিমের কাছে উপেক্ষিত হয়নি। তাদের তিনি একবৃন্তে দুটি ফুল হিসেবে দেখতে দ্বিধা করেননি। আমরাও তাই এই উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রতিভায় দুটি বিভিন্ন বৃত্তির সংযোগ দেখি। নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তসংযমের ব্যাখ্যা করেছেন আর সৌন্দর্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র মানবহৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির সমস্ত মাধুর্য সযত্নে আহরণ করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কোথাও প্রতিভার এই দুই দিক সামঞ্জস্য লাভ করেছে, কোথাও একটি অপরের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। যেখানে সৌন্দর্যসৃষ্টি

নীতিশিক্ষার তলায় চাপা পড়েনি, সেইখানে কাব্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'রজনী'তে অমরনাথ-লবঙ্গলতার প্রেমের আখ্যায়িকা এর আর একটি দৃষ্টান্ত।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রতিভার এই যে দ্বৈধীভাব, এই নিয়ে বিভিন্ন যুগের সমালোচক মহলে মতভেদ দেখা যায়। ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিম-প্রতিভার মর্মানুধাবন ব্যতিরেকে তাঁর এই দ্বৈধী মনোবৃত্তির রহস্যভেদ করা সহজ নয়। যাঁরা 'যোগবলে প্রায়শ্চিত্ত' অংশের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, শিল্পী বঙ্কিমের এখানে পরাজয় ঘটেছে, কিম্বা যাঁরা এই উপন্যাসে বর্ণিত নীতি বা ধর্মের প্রতি বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন সেইসব উগ্র প্রগতিবাদীদের জানা উচিত যে, 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য—অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ'—ইহা শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের কথার কথা নয়, ইহাই ছিল তাঁর 'creed' বা বিশ্বাস। তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী পুরুষ। প্রাচীনকে তিনি দেখতেন নূতনের আলোকে, বিচার করতেন যুক্তি আর পাশ্চাত্য দর্শনের সাহায্যে এবং স্বীকারও করতেন। নূতন বা পুরাতন কোনটিকেই তিনি এককভাবে স্বীকার করেননি। যদি করতেন তাহলে তিনি কিছুতেই যুগপ্রতিভূ হতে পারতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসের নায়ক প্রতাপকেই করেছেন, চন্দ্রশেখরকে নয় এবং এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে শৈবলিনীর অতৃপ্ত যৌবনাকাঙ্ক্ষাকে শিল্পী কোথাও অস্বীকার করেননি? বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি আধুনিক এবং unconventional হতে পারেন তা তিনি শৈবলিনী-চরিত্র এঁকে আমাদের দেখিয়েছেন। প্রতাপের বাড়িতে, প্রতাপের সম্মুখে এই দুর্জয় রূপজ-প্রেমের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি নায়িকার মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন, তা আজো পাঠকচিত্তে রোমাঞ্চ না জাগিয়ে পারে না। 'প্রতাপ-চিন্তা' শৈবলিনীর মনে শেষ পর্যন্ত জাগ্রত ছিল। কারণ প্রণয় বা প্রেম যে কি জিনিস, তা এই নারী তার ব্রহ্মসূত্র-অধ্যয়নকারী স্বামীর কাছ থেকে পায়নি; প্রতাপের প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শেই তার রমণীসত্তার উদ্বোধন ঘটেছিল। তেমনি দেখা যায়, প্রতাপ পাপচিত্তে শৈবলিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়নি, সে প্রতিনিয়ত শিরায় শিরায়, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে এই অনুরাগ অনুভব করেছে—এমন ভাবে করেছে যা মানুষে কখনো জানতে পারেনি।

কাজেই এ-হেন ব্যক্তির প্রেমের একমাত্র সার্থকতা খুঁজতে হবে তার জীবন-বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। প্রতাপ চিত্তজয়ী প্রেমিক। শৈবলিনী সম্পর্কে আমরা তেমন কথা বলতে পারি না। তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যুগপৎ দুইটি বিপরীত সংস্কারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এই কারণেই তার পক্ষে চিত্ত জয় করা সম্ভব হয়নি। প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল এই কারণেই। বঙ্কিম সমগ্র জীবন সন্দর্শন করেছিলেন, কোনো বিশিষ্ট জীবনকে তিনি শিল্পায়ত মূর্তি দান করেন-নি। বঙ্কিম-কল্পিত সমগ্র জীবনদর্শনগত বীক্ষায় ইহাই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। বঙ্কিম-মানসের নীতি ও সৌন্দর্যের একক সত্তাকে ঠিকমত বুঝতে না পারলে বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ বৃথা, এর সমালোচনার স্পর্ধা তো দূরের কথা।

এই উপন্যাসে চন্দ্রশেখর-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। চন্দ্রশেখর আদর্শচরিত্র—সর্বকালের আদর্শচরিত্র। এই চরিত্রটির বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচক যথার্থই লিখেছেন: 'হৃদয়ের মহান ভাব, চরিত্রের ঔদার্য, প্রণয়ের প্রগাঢ়তা—এ চিত্রে অতি মনোহর রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত সমান ক্ষেত্রে রাখিয়া প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষমতাশালী কবি যতদূর মহৎ ও উন্নত চরিত্রের কল্পনা করিতে পারেন, চন্দ্রশেখরের চরিত্র ততদূরই উন্নত ও মহৎ হইয়াছে।'* চন্দ্রশেখর শান্তিপ্রিয়, আত্মদর্শী, জ্ঞানপিপাসু ও ধার্মিক; তাহার হৃদয়ে অপরিসীম প্রণয়। এই বিরাট মূর্তি অঙ্কনে বঙ্কিম-কল্পনার তুঙ্গশীর্ষ দেখে অবাক হতে হয়। এমন চরিত্র সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে আর দুটি নেই—বাঙলা সাহিত্যেও নেই। শেক্‌সপিয়রের কল্পনাতেও এমন একটি চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। এই উপন্যাসে গ্রন্থদাহের দৃশ্যটির অবতারণা করে শিল্পী চন্দ্রশেখরের প্রগাঢ় প্রণয়ের ইঙ্গিত যেভাবে দুই-এক কথায় দিয়েছেন তা এক কথায় অপূর্ব। এই তো শিল্পীর প্রধান গুণ। ঘটনাতেই, কাজের মধ্যেই তাঁর চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ হয়। সেই পুঁথি পোড়ান, সেই শালগ্রাম শিলা বিতরণ, এমন করে গৃহত্যাগী হওয়া, এর মধ্যেই তো আমরা চন্দ্রশেখরের হৃদয়কে পাই। এইখানেই তাঁকে মানুষ বলে বোধ হয় এবং এইখানেই তাঁর অন্তরের দেবভাব, মহত্ত্ব ও প্রণয়ের প্রগাঢ়তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই যে

* বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম খণ্ড: গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী

'কীর্তিহীন, বীরত্বহীন অবিক্ষুব্ধ পৌরুষ,' এটাই তো আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিকে বার বার আকর্ষণ করে। এমন 'স্বতন্ত্র পুরুষ-মহিমার একটি স্তব্ধ গভীর শান্তস্থিত মূর্তি' আর কে আঁকতে পেরেছে?

ধাপে ধাপে এগিয়ে চললেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ধাপে ধাপে তাঁর বিশ্লেষণ-ধর্মী মনন পৌছতে থাকে সু-উচ্চ মার্গে।

ধাপে ধাপে তিনি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য ও রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন।

সেই প্রতিভার প্রোজ্জ্বল রূপ—কৃষ্ণকান্তের উইল। অতি সামান্য উপকরণ নিয়ে এক অতি অসামান্য সৃষ্টি। অনেকের মতে, তাঁর পরিণত লেখনীর এটাই শ্রেষ্ঠ ও শেষ দান। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করতেন। দেখা যাক, এই শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় এবং কি জন্য।

প্রথম কথা, এই-ই বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি novel জাতীয় উপন্যাস। ইংরেজী সাহিত্যে নভেলের সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলা হয়েছে: 'Novel is a narrative in prose, based on a story, in which the author may portray character, and the life of an age, and analyse sentiments and passions, and the reaction of men and women to their environment.' *

এই সংজ্ঞার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসেই সর্বপ্রথম সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় বাস্তব জীবনের প্রতিভাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। স্পষ্টতই তিনি এখানে কল্পনা ছেড়ে বাস্তব, ইতিহাস বর্জন করে পরিচিত জীবনবৃত্ত রচনা করেছেন। এই ধারায় রচিত তাঁর উপন্যাস মাত্র তিনখানি—রাধারাণী, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল। সমগ্রভাবে বঙ্কিম-প্রতিভায় আমরা এই সময় থেকেই একটি বড়ো রকমের দিক্ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। 'রজনী' তো সে যুগের বাঙলা সাহিত্যের গতিপরিবর্তনকারী

* *Literary Essays* : David Daiches

একখানি উপন্যাস বলেই স্বীকৃত—বাঙলাভাষায় এই-ই সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক উপন্যাস। কিন্তু রজনীর কথা থাক, রোহিণীর কথাই বলি।

আজ থেকে সাতাশী বছর আগে (কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সনে) বঙ্কিমচন্দ্র যে কতবড়ো আধুনিক ছিলেন তারই অভ্রান্ত নিদর্শন তাঁর এই উপন্যাসখানি। নর-নারীর চরিত্র তথা সহজাত প্রবৃত্তির (elemental passion) এমন বিস্ফোরণ তাঁর আর কোনো উপন্যাসে দেখা যায় না। শিল্পীর মন এখানে পুরোপুরি বহির্মুখীন; তিনি 'নিজেকে সমসাময়িক সামাজিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে তাঁহার পাত্র-পাত্রীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদের ভাবানুভূতির সূত্র আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন।...প্রতি ধাপে ধাপে এই কাহিনী নিজেকে রচনা করিয়া চলিয়াছে, ঘটনা ঘটনান্তরে পরিণত হইয়াছে।... এই উপন্যাসের সবই আমাদের চক্ষের দৃষ্টির সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতেছে।' বস্তুত, বাস্তবধর্মী এবং বিজ্ঞানধর্মী ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এখানে সার্থক আবির্ভাব। আমাদের অতি পরিচিত জীবনযাত্রার প্রতিফলন এখানে সুস্পষ্ট এবং আবেগ, অনুভূতি, মনন, চিন্তন—যা কিছু এর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দেখা যায় তা সবই যেন আপনাকে ঘিরে, সমাজ-জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে আমরা তাই যে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই তিনি সর্বতোভাবে আধুনিক উপন্যাস-লেখকদের সমগোত্রীয়, খাঁটি বাস্তববাদী; এই উপন্যাসের সবটাই বাস্তব, কল্পনার ভাষা অতি সামান্যই সে কল্পনা এতোই বাস্তবের নিকটবর্তী যে তাকে কল্পনা বলেই সন্দেহ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে খাঁটি ঔপন্যাসিক। রিয়ালিজম ভিন্ন এই উপন্যাসের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ন্যাচারালিজম্ বা প্রকৃতিবাদ। এ দুটির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। বাঙলা সাহিত্যে সেদিন এটা সত্যিই অভাবনীয় ছিল। অভাবনীয় এবং দুঃসাহসিক। কৃষ্ণকান্তের উইল তাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস যেখানে তিনি কোনো চরিত্রকে আদর্শায়িত করেননি। ভ্রমর, রোহিণী, গোবিন্দলাল—সকলেই স্বভাবের দুর্দমনীয় গতি নিয়ে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সার্থক প্রয়াস পরবর্তীকালের বাঙলা কথসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতিকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে—

সে প্রভাব আমরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে কি প্রত্যক্ষ করি না ?

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় জানবার আছে। এক গভীর পারিবারিক অশান্তিময় পরিবেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসখানি রচনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে যার প্রভাব তাঁর মানস-জীবনকেও প্রভাবান্বিত করেছে। চন্দ্রশেখর রচনার কাল থেকেই এর সূচনা। যাদবচন্দ্র উইল করে কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে প্রদান করেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাইদের মধ্যে অসদ্ভাবের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমে এই বিরোধ চরমে পৌঁছে। তারপর বঙ্গদর্শন বন্ধ করে দিতে হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র লেখাপড়া করে উহা মধ্যম অগ্রজকে দান করেন। এই ঘটনার দুই-একমাস পরে পৈতৃক বাড়ি ত্যাগ করে বঙ্কিমচন্দ্র সপরিবারে চুঁচুড়ায় চলে আসেন। একদিকে পারিবারিক গোলযোগ, চাকরিতে উপরওয়ালাদের সঙ্গে সংঘর্ষ, এবং অপরদিকে তৎকালীন বিক্ষুব্ধ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ—ইহা কিছুতেই শিল্পীর মানস-জীবনের পক্ষে অনুকূল হতে পারে না। আমরা কল্পনা করতে পারি যে, সেই সময় একটা অনির্বচনীয় বেদনা, লাঞ্ছনা, শূন্যতা ও ক্ষোভ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। সকলের অলক্ষ্যে চলেছে একটা চরম মানসদ্বন্দ্ব এবং সেই একই সময়ে শিল্পী বোধ করলেন নবসৃষ্টির তাগিদ। এই সময়ে তিন বছরের ব্যবধানে, তিনি পাঠককে উপহার দিলেন কমলাকান্ত ও কৃষ্ণকান্ত। বঙ্কিম-প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব বুঝবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিকের যে সার্থক পরীক্ষা করেন, বাঙলা কথাসাহিত্যে তার গুরুত্ব বাঙলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যে যুগান্তর সাধনে মধুসূদনের সেই দুসাহসিক প্রয়াসের সঙ্গেই তুলনীয়। মাত্র সতের বছরের ব্যবধানের মধ্যে বাঙলা কাব্যে ও উপন্যাসে এই দুটি বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয়েছিল।

শেক্সপিয়ারের নাটকগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কাহিনী-নির্ভর মৌলিক ট্র্যাজেডি যেমন ওথেলো ও ম্যাকবেথ, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল। ট্র্যাজেডি রচনায় শিল্পীর বোধ ও পদ্ধতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে তাঁর এই উপন্যাস-দুখানির মধ্যে। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ণয়ে একজন ইংরেজ সাহিত্য-সমালোচক লিখেছেন: 'The core of tragedy is situation ; and a situation is a character in contrast, and perhaps also in conflict, with other characters or with circumstances.' * এই সংজ্ঞার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, দুখানিই পরিপূর্ণ বিয়োগান্ত উপন্যাস এবং দুখানি উপন্যাসেই ঘটনা-সৃষ্টি ও চরিত্র-সৃষ্টি সমান্তরাল রেখায় চলেছে। তবে কৃষ্ণকান্তের উইল শুধু ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডির চিত্র নয়—বাঙালী হিন্দু পরিবারের বিস্তৃত বিবরণও এখানে নিবদ্ধ হয়েছে এবং পারিবারিক প্রতিবেশ কেমন করে ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে বাইরের ঘটনার সাহায্যে তারই আভাস দিতে গিয়ে গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী—এই তিনটি প্রধান চরিত্রের হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন অনেকখানি গৌণ হয়ে পড়েছে। ট্র্যাজেডি এখানে তাই বিষবৃক্ষের ট্র্যাজেডির তুল্য তীব্র হয়ে ওঠেনি। কোনো কোনো সমালোচকের মতে, কুন্দ-নগেন্দ্রের সম্পর্কের মতো রোহিণী-গোবিন্দলাল সম্পর্কটি শিল্পী মানবিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারেননি, ধর্ম-সম্পর্কের অনুশাসন দ্বারাই বিচার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও যে এ সংশয় না ছিল তা নয়; গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরীকে লেখা একটি পত্রে এর আভাস আছে।

তবে কি কৃষ্ণকান্তের উইল নীতিমূলক উপন্যাস?

পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়—এইটাই কি শিল্পীর অভিপ্রেত ছিল?

রোহিণী-চরিত্রের আলোচনা করলেই এর উত্তর মিলবে। 'গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর ভালবাসা যে কত অকপট ও অকৃত্রিম—সে যে তাহার বৈধব্য-জীবনের সমস্ত হৃদয়-মন দিয়া তাহার প্রণয়াস্পদকে ভালবাসিয়াছিল এবং তাহার সেই ভালবাসার শক্তি যে সাধারণ নারীতে অসম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র ইহারই

* *Art and Artifice in Shakespeare* : Elmer Edgar Stoll

পরিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন। সুতরাং তিনি বিধবার প্রেমের বিরোধী ছিলেন, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই।' *

রোহিণীকে পাঠকের সম্মুখে শিল্পী যখন প্রথম উপস্থিত করছেন তখন একটি মাত্র কথায় তার বিষয়ে সব কথা বলা হয়ে গেল—'শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ'। এই রূপসী, বালবিধবা নারীর জীবনে একদিকে হরলাল, অন্যদিকে গোবিন্দলাল। একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত করেছে। হরলাল-প্রত্যাখ্যাতা রোহিণীর জীবনের এক সঙ্কটক্ষণে এবং নাটকীয় মুহূর্তে তার জীবনপথে এলো ভ্রমরের জীবনসর্বস্ব গোবিন্দলাল। বারুণীর জলতলে তার আর ডুবে মরা হল না। ভোগলিপ্সাতুর এই যুবতী-নারীর হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হল। গভীর অনুরাগ। অনুরাগ ঠিক নয়—আসক্তি। সেই আসক্তির তীব্রতা ছিল অসাধারণ। প্রণয়মুগ্ধা বিধবা নারীর এই সময়কার মনের ছবি কি অপূর্ব রং ও রেখাতেই না বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন। রোহিণীর 'সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত হৃদয়' শিল্পী অবারিত করেই পাঠকের দৃষ্টিপথে তুলে ধরেছেন। দুর্দমনীয় লালসাজাত সেই প্রেমের অন্তরালে নারী-হৃদয়ের যে মাৎসর্য, নৈরাশ্য ও পরাজয়ের গ্লানি, তারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তারপর প্রসাদপুরের প্রমোদভবনে রোহিণী-গোবিন্দলালের জীবনের যে চিত্র পাই তা সংক্ষিপ্ত হলেও ইঙ্গিতময়। বঙ্কিম প্রতিভার শিল্প-নৈপুণ্য এখানে উচ্চগ্রামে উঠেছে। তৃষ্ণা মিটল, কিন্তু রোহিণীর হৃদয়ে গভীর প্রণয় সঞ্চারিত হল না; লালসা পরিতৃপ্ত হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো শ্রান্তি, বিতৃষ্ণা; প্রণয়াস্পদকে প্রলুব্ধ করেও তাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা গেল না—এই উপলব্ধিই রোহিণীর জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। লালসা ও জিগীষা—এই দুটি দুর্দমনীয় বৃত্তি দ্বারাই এই বিধবা নারী আজীবন চালিত হয়েছে। তার জীবনের শেষ অধ্যায়ের পদস্খলনটা তো ঘটেছিল এইজন্যই। মোট কথা, রোহিণী চরিত্রের ভিতর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রমণীহৃদয়ের চিরন্তন বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত করেছেন।

পদস্খলন সত্ত্বেও, রোহিণীর প্রতি তার স্রষ্টার একটা মমতা ছিল। ছিল সহানুভূতি। গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণী যখন 'গতপ্রাণা হইয়া

---

* নবযুগের কথা: বিপিনচন্দ্র পাল

ভূপতিত হইল, তখন সেই প্রমোদ-উদ্যানের ভৃত্যরা এসে দেখল—'বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে'। এখানে স্পষ্টতই সৌন্দর্যস্রষ্টা বঙ্কিম নীতিবিদ্ বঙ্কিমকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। 'পদ্মিনীবৎ'—এই একটি উপমার দ্বারা তিনি একদিকে রোহিণীর স্নিগ্ধ সুন্দর নারীসত্তার প্রতি যেমন সমবেদনা দেখিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি 'বালক' এই উপমাটির দ্বারা গোবিন্দলালের বিভ্রান্তিকেও গভীর সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখলেন। ইহাই তো শিল্পিমনের পরিচায়ক।

পরিশেষে বলব যে, 'বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রসসৃষ্টিকে কেবল আরও উন্নত এবং পরিস্ফুট করিয়া তোলেন তাহা নহে, পরন্তু সার্বজনীন মানবতার ভূমি হইতে এগুলিকে পৃথক করিয়া বাঙালী চরিত্রের এবং বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাজাইয়া তোলেন।… এইভাবে এই তিনখানি উপন্যাসের সাহায্যে তিনি বাঙলার নবযুগের নবীন সাধনাকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলেন।'* শিক্ষিত বাঙালীর অনুভূতির মধ্যে এইভাবে বাঙলার সমাজ, বাঙলার ঘরকে আদরের বস্তু করে তুলে বঙ্কিমচন্দ্র যে কত বড়ো উপকার করেছিলেন তা বুঝিয়ে বলার নয়, তা একান্তভাবেই মর্মে মর্মে উপলব্ধির বিষয়।

* বঙ্কিমচন্দ্র : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

॥ নয় ॥

এইবার 'বঙ্গদর্শন'-এর কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন—এক ও অভিন্ন।

ইতিহাসের প্রেরণা ও বঙ্কিমের প্রতিভা—এই দুয়ে মিলিয়েই বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি। ইতিহাসের প্রেরণার কথাটা আগে বলি। এই দেশের এক বিচিত্র সামাজিক সঙ্কটের মধ্যে আর ইংরেজ বণিকের বিশেষ প্রয়োজনেই দুটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়—একটি অভিজাত, অপরটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি-শ্রেষ্ঠ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কোম্পানীর শাসনের আদিপর্বে এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচরণ এবং আদর্শে একটা স্বাতন্ত্র্যধর্মী বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। এঁরা নিজেদের ব্রিটিশ বণিকতন্ত্রের যতখানি আপনার জন মনে করতেন, ঠিক ততখানি তাঁরা ছিলেন এদেশীয় জনসাধারণ থেকে দূরে। দেশীয় সমাজ থেকে তাঁদের এই ব্যবধানই তাঁদের আচরণে এনে দিয়েছিল একটা অকারণ দম্ভ আর স্বাতন্ত্র্য। ফলে, বিদেশী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে নিরক্ষর, অমার্জিত রুচি ও সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মীয়তা বোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং আত্মাভিমান যে ভ্রান্ত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই শ্রেষ্ঠতাবোধও যে প্রকৃতপক্ষে মূল্যহীন সেটা ক্রমে অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু কালপ্রবাহ যখন সমাজপ্রবাহের উপর প্রবলবেগে আঘাত করল তখন থেকেই শুরু হয় দৃষ্টিকোণ বর্জনের পালা। যাঁরা এতকাল ছিলেন নিজেদের সুখদুঃখ ও স্বপ্নের ভাঙাগড়া নিয়ে আত্মসমাহিত, বাইরের কোলাহল বর্জন করে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন নিজেদের মনে, এখন তাঁরাই এসে দাঁড়ালেন উন্মুক্ত রাজপথে—তাঁরা তাঁদের অন্তরকে বাইরে প্রসারিত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন।

বুদ্ধিজীবী বাঙালী-মানসের এই রূপান্তরেরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'বঙ্গদর্শন'। যে স্বাতন্ত্র্য, দ্বন্দ্ব ও অসামাজিকতা প্রাক্-বঙ্গদর্শন যুগের বঙ্কিম-চরিত্রে আরোপিত

হয়েছে, সেই বঙ্কিম এখন থেকে হয়ে উঠলেন সামাজিক—অন্তরকে তিনি এখন বাইরে প্রসারিত করে দিলেন আর অপরকে তিনি নিজের অন্তরে আকর্ষণ করতে চাইলেন। তাই বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় তিনি লিখলেন: 'এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য-দিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।'

ইতিহাসের এই উপলব্ধি থেকেই বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি এবং এরই মাধ্যমে বঙ্কিম-প্রতিভা, দেশের মাটি থেকে শক্তি আহরণ করে বাস্তবকে রূপান্তরিত করার কাজে কিভাবে নিয়োজিত হয়েছিল, এখন আমরা তার কথা আলোচনা করব। এখানে আর একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। বঙ্গদর্শন প্রকাশের তিন চার বছর আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে বাঙালী সমাজের, বিশেষ-ভাবে বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি করছিলেন। শুধু প্রবন্ধ বা বক্তৃতায় নয়, ঘরোয়া বৈঠকেও তাঁর বহু সাহিত্যরসিক বন্ধুজনের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। এইসব চিন্তা ভাবনা-আলোচনার ফল—'বঙ্গদর্শন'।

বঙ্কিম-মানসের রূপান্তরের কাজ স্তরে স্তরে চলতে চলতে যখন তা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মাভিমানের স্তরে এসে পৌছল তখনই বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। এ তাঁর সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের ঘটনা। সমকালীন বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনেও ইহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে। বঙ্কিম-জীবনের বহরমপুরের কয়েক বৎসর বাঙলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এখান থেকেই তাঁর সম্পাদনায় ১৮৭২ সনের শুভ বৈশাখে বেরুল 'বঙ্গদর্শন'। এর নেপথ্য-ইতিহাস সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন: 'কতদিন কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়েকজন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খ্রীষ্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশকরূপে, 'বঙ্গদর্শনে'র বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিতেন। লেখকগণের নাম বাহির হইল: সম্পাদক—শ্রীযুক্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; লেখক—দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ডাঃ রামদাস সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার। আর সকলেই নামজাদা, আমিই কেবল নামহীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল।'

বঙ্কিম-অনুরাগীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর প্রতি অন্ধভক্তিবশতঃ মন্তব্য করেছেন: 'বঙ্গদর্শন জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র কোহিনূর। বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতেই বাঙালী ভাবিতে শিখিল।' এ সত্য নয়। আবার কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন—'বঙ্গদর্শনের ন্যায় সুলিখিত বা সুসম্পাদিত, বা বিচিত্র ও গভীর চিন্তাপূর্ণ মাসিকপত্র আর হয় নাই।' এ সিদ্ধান্তও আমরা মানতে রাজী নই। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের বহুপূর্বে এসেছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বলতে গেলে এই তত্ত্ববোধিনীই বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল। বাঙলা সাহিত্যের উন্নতিবিধানে এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও এর লেখকগোষ্ঠীর দান সামান্য নয়। তবে একথা সত্য যে, 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাত সূর্য' বঙ্গদর্শন এবং এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আলো এল, আশা এল, সঙ্গীত ও বৈচিত্র্য এল'। শুধু তাই নয়, পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের আদর্শের উপর বঙ্গদর্শন অনেকখানি প্রভাবও বিস্তার করেছিল।

বঙ্গদর্শন কেবলমাত্র একখানি মাসিক পত্রিকা নয়। একে আমরা বঙ্কিম-মানসের দর্পণ হিসাবে গণ্য করতে পারি আবার তাঁর ব্যক্তিত্বেরও নানা-দিকের পূর্ণ পরিচয় বহন করছে এই পত্রিকাখানি। বঙ্গদর্শনের পতাকা হাতে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের আসরে এক নববর্ষের শুভ বৈশাখে দেখা দিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র, তিনি ঔপন্যাসিক নন, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদর্শনের যুগে এইটাই ছিল তাঁর মুখ্য ভূমিকা। সমকালীন ইতিহাসের কথা, বিশেষ করে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের কথা স্মরণ করলেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, সেই সময়ে মনীষার ক্ষেত্রে একটি নূতন নেতৃত্বশক্তির আবির্ভাব প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছিল। ঔপন্যাসিক এইবার তাই চিন্তাধিনায়করূপে দেখা দিলেন। এই প্রসঙ্গে অক্ষয় দত্তগুপ্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, 'বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবকালে দেখা যায় যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যভাবের সমন্বয় জন্য দেশ তখন

বিশেষভাবেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই আগ্রহকে অবলম্বন করিয়াই বঙ্গদর্শনের সমাজশিক্ষা প্রয়াস উর্জস্বল ও সফল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই থেকে রাজকীয় প্রভায় বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হইল বাঙলার সাহিত্যগগনে। এই সময়টা বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও ছায়া নাই, আর কাহারও পদাঙ্ক নাই, আর কাহারও প্রভাব নাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্য তখন একান্তভাবেই বঙ্কিমময় হইয়া উঠিয়াছে।'

চন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: 'বঙ্গদর্শন বলিয়া গিয়াছিল বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।' আর গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী লিখেছেন: 'বঙ্গদর্শন যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল ও যে শক্তি প্রয়োগ করিত, তাহা পূর্বকালের রাজশক্তিরই বুঝি অনুরূপ ছিল। সকলেই বঙ্গদর্শন-সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত।' এমন শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভ বুঝি আজ পর্যন্ত আর কোনো পত্রিকা-সম্পাদকের ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই একদিন তাঁর শেষজীবনে সাহিত্য-সম্পাদককে বলেছিলেন—'বঙ্গদর্শনের কাজ বঙ্গদর্শন করিয়াছে, এখন তোমাদের কাজ তোমরা কর।' এইবার দেখা যাক, তার স্বল্পায়ু জীবনে (বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র চার বছর) বঙ্গদর্শন বাঙালীকে বাঙলার মর্ম দর্শন করাতে কতদূর সফল হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে সমকালীন আর একটি ঘটনা স্মরণীয়। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ার দশমাস পরে ঐ ১৮৭২ সনেই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় নাট্যশালা বা পেশাদার থিয়েটার। নবীন বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উদ্যমের পুরোভাগে ছিল একটি বিরাট নাট্য-প্রতিভা। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পরবর্তীকালে এই পেশাদার থিয়েটার বঙ্কিম-নাটককে আশ্রয় করে কিরূপ বেগবান হয়ে উঠেছিল, সে কথা পরে বলব। বঙ্কিম-প্রতিভা যুগপৎ জাতির সাহিত্য ও রঙ্গালয় দুই-ই সমৃদ্ধ করেছিল।

একটা মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। সেটা আমাদের জানা দরকার, কেননা বঙ্গদর্শনকে তাঁর নিছক সাহিত্যপ্রয়াস বা সাহিত্যবিলাস বলে মনে করলে অনেকখানি ভুল হবে। নবীন

বাঙলার জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা। কিন্তু এই জাগরণ বা রেনেসাঁ তখন প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, বৃহত্তর বাঙলার জনজীবনের সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এই সত্যটা সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাতেই সবচেয়ে স্পষ্টই করে ধরা পড়েছিল; তিনিই তাঁর সময়ে সবচেয়ে বেশি করে বুঝেছিলেন যে: 'And we Bengalis are strangely apt to forget that it is through the Bengali that the people can be moved. We preach in English and harangue in English and write in English, perfectly forgetful that the great masses, whom it is absolutely necessary to move in order to carry out any great project of social reform, remains stone-deaf to all our eloquence.'

একথা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর আগে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এ্যাসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। তাঁর এই উক্তির মধ্যে 'people' ও 'masses'—এই কথা দুটি লক্ষ্য করবার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র জনসাধারণের কথা—যে জনসাধারণ ও নাগরিক জীবনের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে—চিন্তা করেছেন; শুধু চিন্তা করা নয়, রীতিমত উদ্বেগও বোধ করেছেন। এই চিন্তা প্রথম প্রকাশ পায় কেশবচন্দ্রের স্থলভ সমাচার পত্রিকার রচনার মধ্যে। স্পষ্টতই এই ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কতকটা কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং কতকটা স্বকীয় চিন্তার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলাভাষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক করে দিতে চাইলেন; এ ভিন্ন জাগরণকে সার্থক করার, সম্পূর্ণ করার অন্য কোনো পথ ছিল না।

এই প্রসঙ্গে এই সময়ে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি চিঠি স্মর্তব্য। যে বছরে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়, ঠিক সেই বছরেই শম্ভুচন্দ্র তাঁর (কাগজখানি *Mookerjee's Magazine*; বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই কাগজেও লিখতেন) বের করার সংকল্প করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: 'I have myself projected a Bengali magazine with the object of

making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular; and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This, I think, is not exactly what it ought to be; I think that we ought to *disanglicise* ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to masses in the language which they understand.'

বৃহৎ জনসমাজের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্বেগের ফল 'বঙ্গদর্শন'। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি লিখেছিলেন: 'সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখন শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।'

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স চৌত্রিশ বছর। বাঙলা সাহিত্যে তখন যে কয়জন লেখকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি তখন বহরমপুরে ওকালতি করতেন)—'এই কয়জনকে লইয়া বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চার যেন বান ডাকিয়াছিল।' বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তখন বহরমপুরে; ডাক্তার রামদাস সেনের বিরাট গ্রন্থাগারটি তিনি যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এঁরই সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম একটি পত্রিকা প্রকাশের কথা আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। দে সাহেব অবশ্য বাঙলা লিখতেন না,

ইংরেজীতেই লিখতেন, তথাপি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও আগ্রহ তাঁকে এই সুধীসমাজে টেনে এনেছিল ; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত *Bengal Peasant Life* বইখানির খুব প্রশংসা করতেন এবং তিনি কতবার লালবিহারী দে-কে অনুযোগ করে বলতেন—বাঙলায় লিখুন।

প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র বা বঙ্কিম-অনুরাগী লেখকদের মধ্যে কেউ এটির উল্লেখ করেননি। উত্তর-পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একবার সংবাদপত্রে একটী পুরস্কার প্রতিযোগিতার কথা বিজ্ঞাপিত করেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় : যিনি বাঙলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট গার্হস্থ্যচিত্র লিখতে পারবেন তাঁকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। লেখক ইংরেজী অথবা বাঙলাভাষায় লিখতে পারবেন। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির দৃষ্টি এই বিজ্ঞাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয় ; অনেকেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন সমধিক প্রসিদ্ধ, যথা—রেভাঃ লালবিহারী দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারকনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়। তিনজনেই ইংরেজী রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কথিত আছে, তারকনাথ, দে সাহেবের অনুরোধে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃত্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতে একখানি উপন্যাস লিখে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারে তাঁর রচনা পুরস্কার লাভের উপযোগী বলে বিবেচিত হল না—পুরস্কার পেলেন লালবিহারী দে তাঁর 'বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ' গ্রন্থের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উপন্যাসই পরে 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ' নামে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় কিছুকাল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা তাঁর দুর্গেশনন্দিনী রচিত ও প্রকাশিত হওয়ার আগের কথা। লালবিহারী দে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দবছরের বড়ো ছিলেন এবং মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে দুজনের একই বছরে (১৮৯৪) মৃত্যু হয়। বাঙলাদেশে লোকসংস্কৃতির আলোচনায় পথিকৃতের সম্মান বোধ হয় রেভাঃ দে-রই প্রাপ্য।

যাই হোক, বহরমপুরের সুধী ও সাহিত্য সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেওয়ার অল্পকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখকগোষ্ঠীকে ভরসা করেই একখানি কাগজ বের করবার কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন। আমাদের

দেশে একখানি উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্র নেই, অথচ বিলাতে এই ধরণের কত পত্র-পত্রিকা, একদিন বৈকুণ্ঠনাথ সেনের বাড়িতে সান্ধ্যবৈঠকে এই প্রসঙ্গটা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন—অপর একজন ব্যক্তি ছিলেন—তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান স্বনামধন্য রাজীবলোচন রায়। রায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের খুব অনুরাগী ছিলেন, ন্যায়নিষ্ঠ হাকিম বলে নয়, একজন প্রকৃত বিদগ্ধ ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি বলে। কথিত আছে, সেই আলোচনা বৈঠকে রাজীবলোচন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিলেন, 'বঙ্কিমবাবু যদি সত্যিই কাগজ বের করেন এবং তিনি নিজে যদি এর সম্পাদক হন, তা'হলে আমি সহযোগিতা করতে সম্মত আছি।' এই কথায় উপস্থিত সকলেই খুব উৎসাহিত বোধ করেন। অনেকেই জানেন না যে, বঙ্গদর্শন প্রকাশের জন্য দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ই সর্বপ্রথম গুরুদাসবাবুর মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে এককালীন এক হাজার টাকা প্রদান করেছিলেন। গুরুদাস বাবু তখন স্বর্ণময়ী এস্টেটের উকিল ছিলেন। তাঁর এই অযাচিত দানের কথা কেউ যেন জানতে না পারে, এমন অনুরোধও তিনি করেছিলেন।* বঙ্গদর্শনের ইতিহাসে তাই কোথাও রাজীবলোচনের নামের উল্লেখ নেই। বলা বাহুল্য, এই প্রাথমিক অর্থসাহায্য বঙ্গদর্শন প্রকাশের পথ অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল।

সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন: 'তখন বহরমপুরে বাঙলা সাহিত্যচর্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ি সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙলা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের ইতিহাস সংসৃষ্ট ইংরাজী পুস্তকও বিস্তর ছিল। 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। 'বাঙলার ইতিহাস' লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এইসময়ে বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এইসময়ে এই বিভাগের পোস্ট্যাল ইনসপেক্টার ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর আমি যাইবার

* এই ঘটনাটি লেখক স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা বিচারপতি স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শুনেছেন।

কিছুকাল পরেই—পিণ্ডান্ত পিণ্ডশেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া সেখানে গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙলা চর্চার মাহেন্দ্রযোগ বলিতে হইবে।'

এই মাহেন্দ্রক্ষণেই বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব।

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনের পূর্ব থেকেই বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবকগণের সাহচর্যে বহরমপুরের পরিবেশ স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। নাগরিক জীবনের কেন্দ্র তখন কলিকাতা; সংস্কৃতিরও পীঠস্থান বলা চলে। কিন্তু সেই কেন্দ্র এবার মফঃস্বলে স্থানান্তরিত হল এবং সেখান থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা 'আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত, মুষলধারে ভাব বর্ষণে' বঙ্গসাহিত্যে নিয়ে এল পরিপূর্ণতা—এই ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেই বঙ্কিম-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় থাকে না। রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেননি—'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন।' বঙ্গদর্শন ছিল সেই সূর্যোদয়।

যথাসময়ে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হল। হিসাবপত্র রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যাদবচন্দ্র। পত্রিকার নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং করেন; বাঙালীকে তিনি বাঙলাদেশের মর্ম দেখাতে ব্যগ্র হয়েছিলেন, সেইজন্য নাম দিলেন 'বঙ্গদর্শন'। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত যথার্থ মন্তব্য করেছেন: 'বাঙলাদেশ এবং বাঙালীকে জানবার আকাঙ্ক্ষা শুধু ভৌগোলিক অথবা ঐতিহাসিক চরিতার্থতাই খোঁজেনি, এদেশের সমাজ, জীবন, ধর্ম, এক কথায় তার পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের রূপ ও রহস্যকেই বঙ্গদর্শন উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছে। বঙ্গদর্শন নিছক একটি পত্রিকা নয়। বঙ্গদর্শন একটি দৃষ্টিভঙ্গী, একটি মূল্যবোধ, যা পরবর্তী বাঙালীজাতিকে গড়েছে।' ঠিক এইরকম মহৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশে আর কোনো মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।

এখানে একটী কথা উল্লেখ করা দরকার। যদি বঙ্গদর্শনের পূর্বসূরী হিসাবে অন্য কোনো পত্রিকার নাম করতে হয় সেটি হল দ্বৈভাষিক বঙ্গদর্শক বা *Bengal Spectator*; এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪২ সনে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র হিসাবে এবং বেঙ্গল স্পেক্টেটর একান্তভাবেই ছিল নব্যবঙ্গদলের কাগজ। ত্রিশ বছর আগের মননাদর্শ বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে

বঙ্কিম-মানসকে যে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল তা অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না, কেননা দেখা যায় যে, বঙ্গদর্শনের প্রথম পর্বে 'বঙ্কিমচন্দ্র নব্যবঙ্গদলের স্বাধীন মুক্ত চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। তবে সমগ্রভাবে বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমকে বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তিনি আধুনিক চিন্তাধারাকে মাতৃভাষা বাঙলায় ছড়িয়ে দিয়ে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শন সম্পাদনার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন।'

শুধু বঙ্গদর্শন কেন, তত্ত্ববোধিনীর যুগ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত যতগুলি সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকটিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঙালীর সমাজচেতনা ও তার সাহিত্যবোধকে কিভাবে গঠন করেছে তার চমৎকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন কেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থখানিতে; অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এই বইখানি পড়তে অনুরোধ করি। দেশীয় সমাজকে সুনীতি ও সুরুচি শিক্ষা দেওয়াটাই ছিল সেইসব বিস্মৃতপ্রায় পত্রিকাগুলির মূল উদ্দেশ্য। সেই আদর্শ থেকে বাঙলাদেশের বর্তমান সাময়িক পত্রিকাগুলি, বিশেষভাবে তথাকথিত সাহিত্য-পদবাচ্য পত্রিকাগুলি কতদূর স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের সম্পাদকের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠার কত অভাব, বুদ্ধিজীবী পাঠকমাত্রেই সেটা আজ বিশেষভাবেই অনুধাবন করে থাকেন। এই অসাধারণ পত্রিকাখানি দীর্ঘায়ু হয়নি সত্য, কিন্তু 'বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া' তোলার পক্ষে চার বছরই যথেষ্ট ছিল।

বঙ্গদর্শন বেরুল।

বাঙলা সাহিত্যের দিগন্তে দেখা দিল নবচিন্তার অরুণ রাগ।

বিচিত্র সুর, বিচিত্র তালে বাঁধা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সঙ্গীত।

মনে হল এতদিনে সাময়িক সাহিত্যে একটা প্রতিভার আলোকপাত হয়েছে। বাঙলা ভাষায় বাঙালী সেই প্রথম বিলাতী ম্যাগাজিনের তুল্য জিনিস দেখতে পেল। প্রথম সংখ্যা থেকেই বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠা দেশে বদ্ধমূল

হল। প্রথম চার বছরের মধ্যেই এই পত্রিকাখানি বাঙলা সাহিত্যে সত্যিই নবজীবন সঞ্চার করে দিয়েছিল—যেমন করেছিল কেশবচন্দ্রের 'স্থলভ সমাচার' ঠিক তার দু'বছর আগে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনগঠনে কেশব-প্রতিভা ও বঙ্কিম-প্রতিভা যুগপৎ কার্যকরী হয়েছিল। 'স্থলভ'-এর কৃতিত্ব আরো বেশি, কারণ সর্বসাধারণের জন্য এক পয়সার কাগজ প্রকাশ করে কেশবচন্দ্র সত্যিই যুগান্তর স্থষ্টি করেছিলেন। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি * এখন বঙ্গদর্শনের কথাই বলি।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়টির নাম 'বঙ্গদর্শনের পত্র-স্থচনা'। এই প্রবন্ধটিতে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও আদর্শের কথা বলা হয়েছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করিবেন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।'

একটা প্রচণ্ড সাহিত্যিক উন্মাদনার আভাস পাওয়া যায় এই পত্র-স্থচনায়; সেই উন্মাদনা তাঁর পরবর্তী প্রয়াস 'প্রচার' পত্রিকার সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বললেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে এইবার সব্যসাচী হতে হল। 'পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা ও ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাকেও বাদ দিতে পারেন নাই।' বস্তুত একজনের পক্ষে এ কাজ দুঃসাধ্য ছিল, এ কাজ সামান্য ছিল না; দায়িত্বপূর্ণ সরকারি চাকরি ও উপন্যাস রচনা ব্যতীত একটি পত্রিকা-সম্পাদনের গুরুভার দায়িত্ব (শারীরিক পরিশ্রম তো বটেই) বহন করা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মতন প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই একটি নূতন লেখক-গোষ্ঠী এই পত্রিকা তথা এর সম্পাদককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল। এই সময়ে সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে পড়েই

---

* লেখকের 'কেশবচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন ও বাঙলা লিখতে প্রতিশ্রুত হন।* তাঁরই আকর্ষণে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র থেকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার পর্যন্ত অনেকেই বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে থাকেন। এমন ষোড়শোপচারে বঙ্গবাণীর অর্চনা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় এই প্রথম। বঙ্গদর্শনে দীনবন্ধু লিখবেন, এ আশা বঙ্কিমচন্দ্র মনে মনে পোষণ করতেন, কিন্তু বন্ধুর অকালমৃত্যুতে তাঁর সেই আশা অচরিতার্থ থেকে যায়। লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের উপরই তাঁর ভরসা ছিল বেশি এবং তিনিই ছিলেন তাঁর মেধাবী শিষ্য। বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা বিভাগটির দায়িত্ব প্রধানতঃ অক্ষয়চন্দ্রের উপরই ন্যস্ত ছিল। সকলের রচনাতেই ভাবগত ঐক্য থাকত। চন্দ্রনাথ বসু ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—এই দুজনও বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম সহযোগিগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন। বাণীমন্দিরে এমন অনুরাগ-ভরা ঐকতান আর কখনো শোনা যায়নি।

বঙ্গদর্শনের প্রধান কৃতিত্ব সমালোচনা।

বাঙলা সাহিত্যে এ জিনিস আগে ছিল না। গ্রন্থাদি সমালোচনায় ইহা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তেমনটি বাঙলা সাহিত্যে আর হয়নি। তিনিই সর্বপ্রথম বঙ্গদর্শনে শেক্‌সপিয়র এবং কালিদাসের তুলনামূলক সমালোচনা করেন, এবং উত্তররামচরিতের অপূর্ব বিশ্লেষণ করে রসসৃষ্টির দিক দিয়ে উপেক্ষিত ও কালিদাসের তুলনায় কতকটা অনাদৃত ভবভূতির একটা অতি উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 'বঙ্কিম এক হস্তে পুষ্পমাল্য, অন্যহস্তে সম্মার্জনী লইয়া পুস্তক সমালোচনায় অগ্রসর হইতেন।' প্রতিযোগী পত্রিকাগুলিরও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। হারাণচন্দ্র রক্ষিতকে বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন, 'যদি সাহিত্যের যথার্থ উপকার করিতে চাও, তবে প্রকৃত সমালোচনা করিতে শুরু কর।' তবে সমালোচনার তীব্রতায় সময়ে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে মাত্রা অতিক্রম করে না যেতেন, এমন নয়। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রচার বন্ধ হইয়া অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে সেরূপ সমালোচনার নিপুণতা আর

* লেখকের 'রমেশচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

কোথাও দেখিতে পাই না···বাঙলা সাহিত্যে এখন অনেকস্থলে সমালোচকের স্থলে মোসাহেব অধিষ্ঠিত হইয়াছে।'* অনুরূপ মন্তব্য রবীন্দ্রনাথও করেছেন : 'বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সেদিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে. তাঁর সমালোচনার সুতীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সেই সময়ে একটি বঙ্কিম-বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গদর্শনের জনপ্রিয়তা এঁদের পক্ষে যে বিশেষ ঈর্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু সেইসব উত্তেজনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আত্মরক্ষার অস্ত্র তাঁর হাতে ছিল। সে হল তাঁর শাণিত বিদ্রূপ। তবে অপাত্রে কখনো তিনি তাঁর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতেন না। কাব্যবিশারদ তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বানর' বলেও রেহাই পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনায় আজ আর আমাদের প্রয়োজন নেই।

এখানে আরো একটি বিষয় স্মর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনা যাঁরা গভীরভাবে পাঠ করেছেন তাঁরা অনুধাবন করেছেন যে, তা কেবলমাত্র সমালোচনা নয়, তদতিরিক্ত কিছু। Philosophy of literary criticism বলতে যা বোঝায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা ঠিক তাই। ইংরেজী সাহিত্যে কার্লাইল, বার্ণার্ড শ ও টি. এস. এলিয়ট প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকবৃন্দের সমালোচনা ঠিক এই স্তরের সাহিত্যকৃতি। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত সমালোচনার এই ধারা পরবর্তীকালে যাঁরা সার্থকভাবে অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। একটা বলিষ্ঠ বিচারবোধ, একটা প্রখর চিন্তাশক্তির পরিচয় আছে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। সাহিত্যিক যুক্তিপরম্পরার সঙ্গে দর্শনের সূক্ষ্ম বিচারণার সমন্বয় ঘটিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর মননশীলতার বৈদূর্যদ্যুতি আজো তাই অম্লান।

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় দান, ইতিহাস আলোচনা।

এই আলোচনার সূত্রেই বঙ্কিম আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে কর্মগৌরবে উদ্দীপিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটি

* চরিতকথা : বিপিনচন্দ্র পাল

স্মর্তব্য। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষে রণনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাঙালীকে শৌর্যে ও বীর্যে নতুন করে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চিন্তা বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠাতেই সর্বপ্রথম একটা সুনির্দিষ্ট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বান—'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসাড় পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।··· আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করি।'—আজো কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই যে অনুসন্ধানের প্রদীপ তিনি জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন, তা তাঁর স্বজাতিকে একটা বড়ো রকমের দিক নির্দেশ করেছিল সেদিন। সেই নির্দেশকে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য রমেশচন্দ্র দত্ত। এ ছিল প্রাণের কেন্দ্র থেকে জাগরণের আহ্বান। সমষ্টিগতভাবে কর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ার এই আহ্বান বঙ্কিমচন্দ্রের মত করে আর কেউ জানাতে পারেন নি। বঙ্গদর্শনের বেদী থেকে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন এইভাবেই সমাজ-মানসে একটা বিপুল গতি-সঞ্চার করেছিলেন।

এই বঙ্গদর্শনের রত্নবেদীর উপরেই সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র স্থাপন করেছেন কমলাকান্তকে। তাঁর মানস-সৃষ্টির এক পরম বিস্ময়। সর্বকালের রসজ্ঞ বাঙালী পাঠককে বঙ্কিম প্রতিভার ইহাই একমাত্র উপচীয়মান উপহার। সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন ইহার লক্ষ্য নয়, কারণ, অন্যত্র সমাজজীবন সম্পর্কে তিনি যেসব চরম কথা বলতে পারেননি, কমলাকান্তের বিদ্রূপের আবরণে সেইসব কথা নিপুণভাবে এবং অতি সহজেই বলেছেন। লোকরহস্যে আছে এর সূচনা আর কমলাকান্তে পাই এর পরিণতি। অর্ধ উন্মাদ, অহিফেনসেবী ও হাস্যরসের মূর্তবিগ্রহ কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ছদ্মবেশ মাত্র। বহুবিচিত্র উপাদানে গঠিত কমলাকান্তের ব্যক্তিত্ব। ইংরেজী সাহিত্যে এই চরিত্রটির তুলনীয় যদি কোনো চরিত্র থাকে তবে তা হল শেক্‌সপিয়রের 'ফলস্টাফ'; ডিকেন্সের

'পিকউইক' অথবা ফরাসী ঔপন্যাসিক সারভেনতেসের 'ডন কুইক্সোট'—এই দুটি চরিত্রের সঙ্গেও কমলাকান্তের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

শেক্‌সপিয়র-সৃষ্ট 'ফলস্টাফ' চরিত্রটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচক (Derek Traversi) লিখেছেন: 'Shakespeare's greatest comic character, Falstaff, serves as a connecting-link between two worlds—the tavern world of comic incident and broad humanity and the world of court rhetoric and political intrigue···Working sometimes through open comment, sometimes through parody, his is a voice that lies outside the prevailing political spirit of the play, drawing its cogency from an insight that is the author's own and expressing itself in a flow of comic energy. Falstaff represents all the humanity.' *

স্যর জন ফলস্টাফের মতোই আমাদের কমলাকান্ত চক্রবর্তীও 'represents all the humanity' এবং বিশ্বসাহিত্যের এই দুটি অসাধারণ কমিক চরিত্র সম্পর্কে এটাই বড়ো কথা। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কমলাকান্তের দপ্তরকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন। এখানে আমরা তাঁকে পাই লোক-শিক্ষকের ভূমিকায়। বাঙলা সাহিত্যে এর আগে যা ছিল না, কমলাকান্তের আধারে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী পাঠককে সেই জিনিস উপহার দিলেন—হাস্যরস বা হিউমার। বাঙলা সাহিত্যে খাঁটি হিউমারের স্রষ্টা তিনি। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ বাঙলা ভাষায় হিউমার-ধর্মী যে প্রবাহের সৃষ্টি করেছে সেই ধারায় তিনি আজো অনন্য হয়ে আছেন। এই অধঃপতিত জাতির জন্য ছিল তাঁর গভীর বেদনাবোধ, ছিল সমবেদনার অনুভূতি। 'প্রকৃত হাস্যরসিকের অনুভূতি অনাসক্ত, দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং তাহার মনে সত্যের অবিকৃত ছবি থাকিবে। তাই আমাদের সভ্যতার খোলসের অন্তরালে যে তুচ্ছতা, মূর্খতা ও সংকীর্ণতা আছে তাহা তাহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে অনাবৃত হইয়া যায়। এই জাতীয় চরিত্র

* *The Age of Shakespeare :* Edited by Boris Ford

শেক্‌সপিয়রের ফলস্টাফ: বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তও এই জাতীয় চরিত্র।'* স্থূলতার স্পর্শবিরহিত এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষবর্জিত কমলাকান্তী হাস্যের বিচিত্র রূপে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, 'যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উচ্চশিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।' হাস্য ও বেদনায় মিলিয়ে 'কমলাকান্ত' বাঙালী-জীবনের একখানি শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য। ইংরেজী সাহিত্যে সুইফটের মতো আমাদের বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ারিস্ট।

স্যাটায়ার রচনা স্বল্পক্ষমতাবিশিষ্ট লেখকের কর্ম নয়। নির্মম ও নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি ভিন্ন এই জাতীয় রচনা সাধারণ লেখকের পক্ষে অসম্ভব। একজন ইংরেজ সাহিত্যিক এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "The true satirist knows no obligation to society but that of showing its individual and collective villainy, cowardice and hypocrisy. To fulfil that obligation he needs to be the one man picked out of ten thousand, an honest man, without which his work will degenerate into flattery.†

হাস্যরসস্রষ্টা বঙ্কিম ছিলেন এমনি একজন honest শিল্পী এবং সহস্রের মধ্যে একজন। তাইতো সমাজজীবনের যত কিছু ভণ্ডামি আর নীচতার উপর বিদ্রূপের অমন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার তিনি চালাতে পেরেছিলেন। এ কাজ অত্যন্ত সুকঠিন; জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা ব্যতিরেকে এই শিল্পকর্মে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। সাহিত্যে প্রকৃত স্যাটায়ার তাই দুর্লভ। বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর জীবনদৃষ্টির পরিচয় আছে কমলাকান্তের দপ্তরে। শাঠ্য, নীচতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি যেমন কষাঘাত করেছেন, তেমনি লাঞ্ছিত, অবনমিত মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় ছিল সহানুভূতিতে অভিষিক্ত। সকলের উপর তাঁর সাহিত্যজীবনের এই পর্বে দেখা যায় যে তাঁর অন্তরে জেগেছে ঈশ্বর-বিশ্বাস। মানুষের বেদনাকে তাই তিনি নিজের বেদনা বলে অনুভব করতে পেরেছিলেন। সেই বিচিত্র অনুভূতির ফলই 'কমলাকান্ত'।

* বঙ্কিমচন্দ্র: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

† *Satire : Gilbert Cannan*

'কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজ শিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা ও স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্ম-দাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের. ভাবুকতার সঙ্গে বস্তুতন্ত্রের, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন বিচিত্র সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?' *

বাঙলা সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার করে দিয়ে, একটি লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে চার বছর পরে বঙ্গদর্শন উঠে গেল। কাগজ উঠিয়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সপরিবারে চুঁচুড়া চলে গেলেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ দিন এখানেও অতিবাহিত হয়েছে। কাগজ উঠে যাওয়ার প্রথম কারণ—আত্মীয় বিরোধ; দ্বিতীয় কারণ—লেখকদের দক্ষিণার দাবী আর তৃতীয় ও প্রধান কারণ—বঙ্কিম-চন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি। আরো একটি কারণ ছিল; এতবড়ো ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেওয়া অবধি তাঁর নিজস্ব শিল্পসৃষ্টির কাজ বিঘ্নিত হচ্ছিল। বঙ্গদর্শনের কলেবর পূর্ণ করার জন্য তাঁকে প্রচুর পরিমাণে লিখতে হত এবং 'অনেক সময় সত্বরতার সহিত রচিত অপেক্ষাকৃত অসতর্ক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা ইহার কলেবর পূর্ণ করিতে হইত'। ফলে, চতুর্থ বর্ষ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারলেন, বঙ্গদর্শনের 'মান' নিম্নগামী হয়েছে। তখন গুণগরিমায় নিষ্প্রভ বঙ্গদর্শন উঠিয়ে দেওয়াই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

বঙ্গদর্শন উঠে গেল।

কিন্তু 'এই চার বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের অনেক নূতন ভাবের সূত্রপাত করে গেলেন'। একথা অনস্বীকার্য যে, তার স্বল্পায়ু জীবনে বঙ্গদর্শনের কাজ বঙ্গদর্শন করেছে। বাঙলা সাহিত্যে শুধু অপূর্ব লাবণ্যশ্রীর সঞ্চার হয়নি, ইংরেজী শিক্ষিত ও শিক্ষাভিমানী বাঙালীকে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃ-ভাষার প্রতি অনুরাগী করেও তুলেছেন। ইহাই ছিল বঙ্গদর্শনের ঐতিহাসিক সার্থকতা। আর বঙ্গদর্শন সম্পাদকের ইহাই ছিল গৌরবের বিষয়।

---

* বঙ্কিমচন্দ্র: অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

॥ দশ ॥

বঙ্গদর্শন উঠে যাওয়ার একবছর পরের একটি ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন লেখাপড়া করে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে কাগজের স্বত্ব ও প্রেস দান করেছেন। কয়েক সংখ্যার পর থেকেই কাঁটালপাড়ায় নিজস্ব প্রেসে কাগজ ছাপা হত; প্রেসের নাম ছিল 'বঙ্গদর্শন যন্ত্র'। একদিন নবীনচন্দ্র এলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে; সঙ্গে ছিলেন অক্ষয় সরকার। কাগজটা আবার বের করা যায় কিনা, সেইটাই ছিল তাঁদের বক্তব্য। সেখানে অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন।

—আবার বঙ্গদর্শন বের করুন।

—বুঝেছি, বঙ্গদর্শন বন্ধ করাটা তোমাদের প্রাণে খুব লেগেছে। লাগবারই কথা। কিন্তু কি করব? আমি একে তো দাসত্বভারে পীড়িত, তার ওপর স্বাস্থ্যের ও পরিশ্রম-শক্তির সীমা আছে। তুমি তো জানো না, ইদানীং প্রায় তিনভাগ লেখার ভার আমার ওপর পড়েছিল। কাজেই আমি আর পারলাম না।

—শুধু এই কারণে বন্ধ করলেন?

—আরো একটা গুরুতর কারণ ছিল বৈকি। নিরপেক্ষ সমালোচনায় দেশশুদ্ধ আমার শত্রু হয়ে উঠেছিল। শুনেছি, কোনো কোনো লোক আমাকে মারতে পর্যন্ত সংকল্প করেছিলেন। গালাগালির তো কথাই নেই। I am the worst abused man of Bengal next only to Sir George Campbell.

—তাহলে বঙ্গদর্শন বন্ধ থাকবে?

—তোমরা যদি আবার বের করতে চাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হব না।

আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলল। নবীনচন্দ্র অনেক বোঝালেন, অনেক অনুনয় করলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অচল, অটল। সমস্ত দিনটা তর্কে-বিতর্কে ও পরামর্শে কেটে গেল। শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—তোমরা অক্ষয়কে কিংবা মেজবাবুকে সম্পাদক করতে পার।

—আমি বরং ম্যানেজারি করতে রাজী আছি, বললেন সঞ্জীবচন্দ্র।

—তা'হলে অক্ষয় সম্পাদক হোক। কি বলো অক্ষয়?

—রাজী, তবে আমার ২০০৲ টাকা বেতন চাই।

—দু-শো! বলো কি অক্ষয়! এত বেতন চলবে না। বঙ্গদর্শনের আয় দুশো টাকার বেশি কখনো হয়নি।

তখন ঠিক হল সঞ্জীবচন্দ্রই সম্পাদক ও কার্যাধ্যক্ষ হবেন এবং এইভাবে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারিত হবে। প্রথম চার বছর যাদবচন্দ্রই ছিলেন পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ। পুত্রের সাহিত্যিক প্রয়াসে বৃদ্ধ পিতার এই সহযোগিতা লক্ষণীয়। নবীনচন্দ্র প্রস্তাব করেছিলেন, আর্যদর্শন-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ, বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন আর সঞ্জীবচন্দ্র—এই তিনজন সম্পাদনা করুন। এই প্রস্তাব কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয়নি; তিনি বলেছিলেন—না, তা হয় না; ত্র্যহস্পর্শ দোষ হবে। *

অতঃপর নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হলেন সঞ্জীবচন্দ্র, কিন্তু আসল কর্ণধার রইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অগ্রজকে যখন তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতায় অধিষ্ঠিত করেন, তখন লোকে বলল, ভ্রাতৃপ্রীতি দেখালেন বঙ্কিম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, নিতান্ত অযোগ্য সম্পাদকের হাতে তিনি তাঁর আদরের বঙ্গদর্শন তুলে দেননি। কনিষ্ঠের লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী না হলেও সঞ্জীবচন্দ্র সহৃদয় প্রতিভাশালী ও রসবিস্তারপটু লেখক ছিলেন। দোষের মধ্যে তিনি একটু স্বভাব-অলস ব্যক্তি ছিলেন এবং এই কারণেই অত্যন্ত এলোমেলো ও অনিয়মিত ভাবে পত্রিকাটি চলতে থাকে। বঙ্গদর্শনের তৃতীয় সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং এগার বছর পরে এর চতুর্থ সম্পাদকরূপে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকে। বঙ্কিম-পরবর্তী যুগের বঙ্গদর্শনের বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। সঞ্জীববাবুর আমলে শেষের দিকে বঙ্গদর্শন প্রেস

* আমার জীবন: নবীনচন্দ্র সেন

কাঁটালপাড়া থেকে উঠে কলিকাতায় আসে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বৌবাজারের চৌমাথার কাছে একটা বাড়িতে থাকতেন।

এইবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বের কথা আলোচনা করব। ১৮৮২ থেকে ১৮৯১—এই দশ বছরই তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষ পর্ব। তখন তিনি বাঙালীর দৃষ্টির সম্মুখে দ্বৈত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত—ঔপন্যাসিক ও চিন্তানায়ক। এই পর্বের ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম—এই চারখানি উপন্যাস। শেষ বয়সে তাঁর আরো দুখানি উপন্যাস লেখবার ইচ্ছা ছিল; শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একদিন বলেছিলেন যে, বৈদিক কালের একটি স্ত্রী-চরিত্র নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখবেন আর সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বলেছিলেন, 'ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবন নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখিব ইহা আমার অনেকদিনের সংকল্প। আমার বড় ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্রণ করি, কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চটিয়াছে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বের এই উপন্যাসগুলির আঙ্গিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শেষ পর্বে বঙ্কিম-মানস একটি নূতন রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল; প্রথম পর্বে ছিল অপরিমেয় প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দবেগ; দ্বিতীয় পর্বে নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ আর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ-ক্ষমতা আর এই পর্বের শেষভাগে বঙ্কিম-মানসের দুটি স্বতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয় যথা, অতীতাচারী মন এবং সম্মুখ দৃষ্টি। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা দিতে থাকে সমন্বয়ী চেতনা যার ফলে তৃতীয় বা শেষ পর্বে দেখা গেল যে, পূর্বেকার প্রাণপ্রাচুর্য, আনন্দবেগ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে তাঁর নবাবিষ্কৃত সমন্বয়-বোধ এবং এরই ফলে তাঁর রচনাকৌশলও রূপান্তরিত হয়। দেখা যায় যে, তৃতীয় পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আদর্শকে আবিষ্কার করেছেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর মানস-দ্বন্দ্বেরও

মীমাংসা অনেকখানি হয়েছে। এখন থেকে তাঁর শিল্পকলা স্পষ্টত নৈতিক-ও রাজনৈতিক চিন্তার বাহন হিসাবেই প্রযুক্ত হয়। এবং এই কারণেই কোনো কোনো সমালোচকের মতে, রাজসিংহ বাদে, এই পর্বে রচিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ীর মধ্যে পূর্বেকার সেই মহিমান্বিত শিল্পকর্ম একরকম অনুপস্থিত বললেই হয়। শিল্পী তখন লোকশিক্ষকের উচ্চাসন নিয়েছেন, ফলে সৃষ্টিচাতুর্য ও সৌন্দর্যের অবতারণায় ঔপন্যাসিক বঙ্কিম কাব্যের আদর্শ থেকে এক সোপান নেমে গিয়েছেন। তিনি তখন একটা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে একথা ঠিক যে, এই তিন পর্বের উপন্যাসের মধ্যে উপাদানেরই কিছু পার্থক্য আছে; আদর্শ বিষয়ে পার্থক্য নেই বা তাঁর কোনো ভ্রমও হয়নি—যেটা বয়োভেদে লেখকের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে হওয়া স্বাভাবিক। এইখানেই তো বঙ্কিম-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য। স্বদেশভক্তি, মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রেম এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে (আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম)।

কোনো কোনো আধুনিক সমালোচকের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। উপন্যাসত্রয়ীর মূল বক্তব্য ছিল: 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে।' শিল্পী-মানসের এক আশ্চর্য পরিণতি। শেষ বয়সে ব্যবহারিক জীবনে যেমন, আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকেও তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রতিষ্ঠায় আর কোনো মোহ ছিল না। সুতরাং একথা মনে করলে ভুল হবে না যে, শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিম-প্রতিভার তখন আর নূতন কিছু দেওয়ার ছিল না; তাঁর 'সংগ্রামশীল, সৃষ্টিশীল প্রেরণা ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে এবং এখন এই চেতনা তাঁর মানসপটে বদ্ধমূল হয়েছে যে, সেই স্বর্ণ অতীতকে আর নির্মাণ করা যাবে না; কালের প্রবহমান ধারায় যা মিলিয়ে গেছে, তাকে অনন্তকালের মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'* বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক জীবনেও তখন এসেছে দারুণ পরিবর্তন—তাকে আমূল পরিবর্তন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর জীবনীকার উল্লেখ করেছেন: 'তিনি

* বঙ্কিমমানস: অরবিন্দ পোদ্দার

কৌষিকবস্ত্র পরিধান করিতেন, নামাবলী গায়ে দিতেন, হবিষ্যান্ন ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু আহার করিতেন না।'

ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা ও হবিষ্যান্নভোজী এই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে অনেকে বলতে চেয়েছেন যে, 'সত্যিই বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। এই আত্মসমর্পণের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম ও সাহিত্যজীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। এইখানেই শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।' যাঁর প্রদীপ্ত জীবন-চেতনার মধ্যে (এরই প্রতিফলন আছে শিল্পীর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের নর-নারীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে) প্রতিবিম্বিত হল সমকালীন ব্যক্তিমানস, আর যিনি দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ সমকালীন সমাজের মানুষকেও আবিষ্কার করেছিলেন—যে মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল বাস্তবজীবনের সমবেদনাহীন পরিবেশের বিরুদ্ধে—মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে (তখন বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনায় হাত দিয়েছেন।) সেই প্রতিভাধর শিল্পীর মৃত্যু-কল্পনাকে কষ্ট-কল্পনা ভিন্ন আর কি বলব? যাঁরা এই জাতীয় মত পোষণ করে থাকেন (বঙ্কিম-প্রতিভার সমালোচনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই জাতীয় মতের সূচনা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, এর আগে নয়), তাঁরা বঙ্কিম-প্রতিভার স্বরূপ বা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। আটচল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে আমরা যে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই, তিনি মনীষী বঙ্কিম, চিন্তানায়ক বঙ্কিম। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলায় সেদিন এই বঙ্কিমেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই আমরা বলব শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়নি, তিনি নিজেকেই সেই মুহূর্তে নূতন ভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে মনীষী বঙ্কিমের চিন্তার দান সামান্য নয়। অতঃপর আমরা মনীষী বঙ্কিমের কথাই আলোচনা করব। দেখব, জীবনের যজ্ঞে স্বাহা-মন্ত্রে কেমন করে তিনি প্রাণের আহুতি দিলেন। আর দেখব, কেমন করেই বা তাঁর সেই অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা একটা শান্ত লয়ে এসে দাঁড়াল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিবর্তনধর্মিতা যেমন বঙ্কিম-চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর প্রতিভারও তেমনি ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসত্রয়ীর মধ্যে যাঁরা রসসৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন, তাঁদের জানা উচিত যে, এই উপন্যাস তিনখানির বক্তব্য আরো মহৎ, উদ্দেশ্য আরো গভীর। এই প্রসঙ্গে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই বলেছেন: 'এই তিনখানির উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশবাসীদিগকে ভারতের উচ্চাঙ্গের কর্মযোগে দীক্ষিত করা। সেকালের ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের আত্মঘাতী ইহসর্বস্বতার প্রভাব নষ্ট করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্যই এই কর্মযোগ প্রচারের প্রয়োজন ছিল।' বঙ্কিম-প্রতিভার দান মুখ্যত তিনটি, যথা—বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য এবং জাতীয়তাবোধ। শেষের তিনখানি উপন্যাসে তিনি বিশেষভাবেই জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমের আদর্শ প্রচার করেছেন। আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সনে এবং এর মূল প্রেরণা 'ইংরেজ ইতিহাসে সমাগত-প্রায় বিপ্লবের পথরচনা।' কিন্তু সমকালীন ভারতবর্ষীয় জীবনের নবজাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনার মধ্যেই সেই প্রেরণার বাস্তব সূত্র আবিষ্কার করা যায়। সেইযুগের প্রসিদ্ধ ঘটনা—সিবিল সার্বিস থেকে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অপসারণ ও তাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনা-সমূহ। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবার জন্য তিনি স্বয়ং বিলাতে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়; এমন কি ব্যারিষ্টারি পাশ করেও তাঁকে পদচ্যুতির অপরাধে ব্যারিষ্টার হতে দেওয়া হয়নি। এ ঘটনা ১৮৭৫ সনের এবং তখন থেকেই শাসকজাতির সহজ ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে বাঙালীর বিশ্বাস আমূল বিচলিত হতে থাকে। আরম্ভ হয় সুরেন্দ্রনাথের অভিযান—দেখতে দেখতে ভারতের রাজনৈতিক সম্ভাবনা হয়ে উঠল অগ্নিগর্ভ। এরই পাঁচবছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন আনন্দমঠ। এতকাল আমাদের স্বদেশাভিমান কবি-কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় করেই ফুটে উঠছিল—সেই ধারায় পরিবর্তন নিয়ে এলেন সুরেন্দ্রনাথ। আধুনিক য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ তাঁর বাগ্মিতার ভিতর দিয়ে প্রচারিত হতে থাকে—ইতালি ও আয়ার্ল্যাণ্ডের বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গ ও দেশচর্যার কাহিনী তিনি আমাদের শোনালেন। আমাদের জাতীয়তাবোধ

তখন থেকেই প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাস-নির্ভর ও বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠল। আনন্দমঠ নিঃসন্দেহে এরই ফলশ্রুতি।

আনন্দমঠ রচনাকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা ইলবার্ট বিল আন্দোলন। সেদিন বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। একদিকে স্বীয় কর্মক্ষেত্রের বিষাক্ত আবহাওয়া, অন্যদিকে বাইরের বিক্ষুব্ধ পরিবেশ—এর থেকেই বঙ্কিম-মানস আনন্দমঠ রচনার রস আহরণ করেছিল। সেই সঙ্গে মিলেছিল নবীনচন্দ্র সেনের অনুরোধ। রেঙ্গুন থেকে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে লেখা একপত্রে (এই চিঠির তারিখ ১৯০৪, ২৭ আগস্ট) নবীনচন্দ্র জানিয়েছেন: 'আমার এরূপ পেড়াপেড়ির দরুণ বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠ লিখেছিলেন। তাঁহার হাতের লেখা চিঠি আমার কাছে আছে।...তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই।'

আনন্দমঠে আর্ট কম, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা বলেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে। কিন্তু সেজন্য আমাদের দুঃখ নেই, কারণ আর্টের অধিক বস্তু বাঙালী এই উপন্যাসখানির মধ্যে পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের political patriotism নয়, খাঁটি স্বদেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধই বহন করে নিয়ে এলেন জাতির কবি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের স্বর্ণপাত্রে। তাঁর পূর্ববর্তী কবিরা স্বদেশ বলতে বুঝতেন ভারতবর্ষকে; তখনকার 'জাতীয়' কবিরা ভারতের কথাই বলতেন, ভারতের দুঃখে অশ্রুপাত করতেন, ভারতমাতার জয়গান গাইতেন এবং তাঁদের যত কিছু উৎসাহ-উদ্দীপনা তা অভিব্যক্ত হত ভারতের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য। আমাদের ধ্যানে তখন বাঙলাদেশ ছিল না, আমাদের চিন্তায় তখন বাঙালী ছিল না। তার কারণ—বাঙলার ইতিহাসের অজ্ঞতা। কি রাজনৈতিক নেতা, কি জাতীয় কবি—কারো দৃষ্টি ও চিন্তায় তখন বাঙলা নেই, আছে ভারতবর্ষ।

এই ধারার মোড় ফেরালেন বঙ্কিমচন্দ্র।

আনন্দমঠেই তার প্রয়াস দেখা গেল। এই উপন্যাসেই আমরা প্রথম

পেলাম স্বদেশভক্তির একটা মনোরম আদর্শ। বন্দে মাতরম্ গানে, কমলাকান্তের ধ্যানে আর সত্যানন্দের সাধনায়—সর্বত্রই বঙ্কিম স্বদেশ বলতে বাঙলা দেশকে বুঝিয়েছেন। স্বদেশভক্ত বঙ্কিম বুঝেছিলেন, বাঙালী আগে বাঙালী হোক, আগে আপনাকে চিনে নিক, নিজেদের জাতীয়ত্ব ফুটিয়ে তুলুক, তারপর যদি সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করতে হয়, বা সমগ্র ভারতবর্ষকে সেবা করতে হয়, তবেই তার সেই চিন্তা বা সেবা ফলপ্রদ হবে। 'বঙ্কিমচন্দ্র কেবল স্বদেশকে ভক্তি করিবার শিক্ষা দেন নাই বা ইংরেজী বাক্-পদ্ধতি অবলম্বনে দেশকে মাতা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দেশমাতৃকাকে দেবত্বে আরোপিত করিয়াছেন।··· জন্মভূমিকে দেবী বলিয়া, জগন্মাতার বিভূতি বলিয়া গ্রহণ এই কল্পনা সম্পূর্ণ নূতন।'* এই কল্পনার জন্যই শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমকে পুষ্পচন্দনে পূজা করেছেন এবং 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় অনুপম ভাষায় আনন্দমঠের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' গানটি তিনি স্বদেশীযুগে মন্ত্রের মতো সাধন করেছিলেন। স্বদেশীযুগের বাঙলায় জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ—তাঁর রাজনৈতিক চেতনা মুখ্যত আনন্দমঠের দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। এইদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে আমরা নিশ্চয়ই বঙ্কিমের ভাবশিষ্য বা উত্তরসাধক বলতে পারি।

প্রসঙ্গত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজস্ব কাগজে যা লিখেছেন এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত হল: 'বঙ্কিমচন্দ্রের নাম আজ এভাবে পূজিত হচ্ছে কেন? কোন্ বাণী তিনি আমাদের মধ্যে প্রচার করে গেছেন? কোন্ নবদর্শন লাভ করে তিনি আমাদের নূতন দৃষ্টিশক্তি দান করে গেছেন? তিনি ছিলেন প্রতিভাধর কবি, তাঁর আয়ত্তে ছিল এক সৌন্দর্যময় ভাষা, যার মাধ্যমে কল্পনার জগতে তিনি স্বপ্নলোকের চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু শুধু কবি, ঔপন্যাসিক বা নব্যরীতি-প্রবর্তকরূপেই তিনি ধন্য নন। আগামী দিনে সাহিত্যসমালোচকেরা হয়ত 'কপালকুণ্ডলা' 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি গ্রন্থকে তাঁর অনন্যশিল্পকীর্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে গণ্য করবেন—'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'ধর্মতত্ত্ব' সাহিত্যিক মূল্যায়নে ততটা প্রশংসার্হ হবে না। কিন্তু অপূর্ব শিল্পকীর্তির সৃজনকারী

* বঙ্কিমচন্দ্র: অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

হিসাবে নয়, শেষোক্ত গ্রন্থসমূহের রচয়িতা হিসাবেই নব-ভারত স্রষ্টাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একজন কবি ও রীতি-প্রবর্তক ; পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জাতি-স্রষ্টা।' *

আনন্দমঠে আর্ট কম, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমন বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। কেন? সমসাময়িক সমাজজীবন এবং রাজনৈতিক চিন্তা অর্থাৎ ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব—দুই-ই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে আর সেই সঙ্গে জীবনের হাসি ও অশ্রু, আনন্দ ও নিরানন্দ একসূত্রে সংগ্রথিত হয়েছে। ইতিপূর্বে অন্য দুটি উপন্যাসে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের যে প্রচ্ছন্ন সংকল্প বঙ্কিমের কল্পনায় দেখা গিয়েছিল, আনন্দমঠে সেই সংকল্পের পূর্ণ অভিব্যক্তি আছে। কমলাকান্ত যে স্বপ্ন দেখেছিল, আনন্দমঠের সন্তানেরা তাদের সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যে সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে পেরেছিল—তারা 'অস্বীকৃত বর্তমানকে স্বপ্নময় ভবিষ্যতের রং দিয়া রাঙাইতে পারিয়াছিল'। আনন্দমঠ প্রকাশকালে এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ও ভাবাদর্শের ইতিহাসটা স্মরণ করলেই আমরা বুঝতে পারি যে, এই উপন্যাসের সন্তানদের সংগ্রামের মাধ্যমে সেই যুগের রাজনৈতিক সংগ্রামের শক্তি ও দুর্বলতা অ'ত নিপুণভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসবর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে একটা পরাধীন জাতির রাজনৈতিক চেতনা প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আনন্দমঠ রচনার প্রকৃত সার্থকতা এইখানেই।

আনন্দমঠের মূল সুর সন্তানধর্ম। এর উদ্গাতা সত্যানন্দ। এই চরিত্রটিকে বঙ্কিমচন্দ্র সজীব ও উজ্জ্বল করেছেন—তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা, তাঁর দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়গঠনে তাঁর ক্ষমতা, সকলের উপর সত্যানন্দের সংযম—এসবই নানা বর্ণে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেমের কাছে অন্য কোনো ধর্মকে তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এই সন্ন্যাসীর দেশপ্রেম যেন জ্বলন্ত আগুন—দাহ করে আবার আলোও দেয়। এই সত্যানন্দ-চরিত্রটির মধ্যেই কি বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন? সত্যানন্দের দেশভক্তি বাদ দিলে এই উপন্যাসের আকর্ষণীয় আর কিছু থাকে না এবং শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, সাহিত্য অপেক্ষা বাঙলার জাতীয়জীবনের সঙ্গেই আনন্দমঠের সংযোগ

* *Rishi Bonkim Chandra :* The *Bandemataram*, 1907 *:* Sri Aurobindo

নিবিড়তর। যাঁরা বলেন, 'অনন্দমঠ যেন কাব্যের ন্যায় স্রষ্টার মনের একক উৎস হইতে রচিত', তাঁরা ঠিক এর মর্মানুধাবন করতে পারেননি। সত্যানন্দের হৃদয়ে যে তীব্র স্বাদেশিকতা ও স্বধর্মানুরাগের মিলন দেখা যায়, তাই-ই এই উপন্যাসখানিকে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ করেছে। রোমান্স হলেও, আনন্দমঠ বাস্তবানুগ রোমান্স।

এই উপন্যাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সর্বাধিক প্রচলিত অংশ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত। কোন্ এক অসাধারণ মুহূর্তে এই সঙ্গীতটি রচিত হয়েছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু এর স্রষ্টা জানতেন যে কালে এই সঙ্গীত—এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও আবেগ—লক্ষ লক্ষ বাঙালী তথা ভারতবাসীর চিত্তকে উদ্বেলিত করবে। আর তাদের হৃদয়কে করবে উদ্বুদ্ধ। দেশলক্ষ্মীর এমন পরিপূর্ণ মূর্তি কোনো দেশের সাহিত্যে কেউ এঁকেছেন কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র যদি আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে আর কিছু না দিয়ে যেতেন তথাপি এই একটিমাত্র গান রচনা করে তিনি অনায়াসেই অমরত্বের দাবী করতে পারতেন। ইয়েটস যেমন আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় কবি, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি উনিশ শতকের বাঙলার জাতীয় কবি। সর্বকালের জাতীয় কবি। এই গৌরব সর্বাংশে তাঁরই প্রাপ্য।

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম—প্রত্যেকটিই এক-একটি অতি সংকীর্ণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর রচিত। একমাত্র আনন্দমঠেই বঙ্কিমের বলিষ্ঠ কল্পনা ঐতিহাসিক ভিত্তির দুর্বলতাকে অতিক্রম করে বহুদূর ঊর্ধ্বে মাথা তুলেছে। মুখ্যত হাণ্টারের *A Statistical Account of Bengal* (৭ম খণ্ড) অবলম্বনে শেষোক্ত উপন্যাস দু'খানি রচিত। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টি থাকে অতীতের দিকে, এই তিনখানি আখ্যায়িকায় বঙ্কিমের দৃষ্টি কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ। সম্ভবত সেই কারণেই ইতিহাস-নির্ভর সকল তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে চলা শিল্পীর পক্ষে সহজ হয়নি, সম্ভবও হয়নি। সুতরাং আনন্দমঠ সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকারের মন্তব্য ('আনন্দমঠের গোড়ায় গলদ' ও 'এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র') আমাদের নিকট অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন বলেই মনে হয়েছে।

অতীতকে সৃষ্টি করবার প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসপটে নিয়ত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানতেন যে, 'No past can be

revived just as it was in the past.'—এবং এই প্রেরণাই তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বে তাঁকে দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। অনেকে দেবী রাণীর দস্যুতার নিন্দা করেছেন। বাঙালীর মেয়ে ডাকাতি করে—ইহা বাঙালীর গৌরব নয়। একথা বঙ্কিম জানতেন। তাই তো তিনি দেবীর দস্যুতাকে একটা নূতন বর্ণে রঞ্জিত করে ও তাঁর অনিন্দ্য পৌরুষকে অনুশীলনধর্মের উদাহরণরূপে গ্রহণ করে সংসারযাত্রায় নারীজীবনে একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করলেন। এখানে তাঁর দৃষ্টি স্পষ্টতই ভবিষ্যতের দিকে বিসর্পিত। শিল্পীর সত্তাকে অতিক্রম করে এখানে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি যেন বলেছেন: তোমরা রাষ্ট্র গঠন করবে? জ্ঞানে, গুণে, বলে, ঐশ্বর্যে উন্নত হবে? কিন্তু রাষ্ট্র যে পরিবারের সমষ্টি একথা ভুলো না। আদর্শ পরিবার আগে গড়েছ কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে প্রফুল্ল গৃহসুখের মোহে বুঝি একটা মহাধর্ম বিসর্জন দিয়ে গেল—ব্রেনানের পরাজয়ে যে গৌরবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, গৃহিণীপণার অনতিপ্রশস্ত ও অনতিগভীর পল্বলে বুঝি তার বিসর্জন হল। বস্তুত কিন্তু তা নয়, এখানেও প্রতিষ্ঠা—গৃহধর্মের প্রতিষ্ঠা—নারীর যথার্থ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। প্রকৃত কথা এই যে আনন্দমঠে ও দেবী চৌধুরাণীতে প্রতিষ্ঠাই আছে—বিসর্জনের চিত্র বরং সীতারামে দেওয়া হয়েছে।

গৃহধর্মটা আনন্দমঠে নেই, কিন্তু গৃহসুখের আকাঙ্ক্ষা সন্তানগণের মধ্যে বেশ প্রবল। প্রফুল্লের মধ্যে গৃহসুখের স্পৃহা খুবই বলবতী দেখা যায়। তাঁর সংসারসুখের মোহ ছিল বলেই তাঁর শিক্ষা তাঁকে আদর্শ গৃহিণীতে পরিণত করেছে তাঁর মোহ মোক্ষসাধনে পরিণত হয়েছে। প্রফুল্ল তাই সাগর বৌকে বলতে পেরেছিলেন—'এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম'। এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আর কেউ বলতে পারতেন না। ধর্মতত্ত্ব নয়, বা ইজারাদারদের অত্যাচারের কথাও নয়, হিন্দুর চিরন্তন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দিকটাই এই উপন্যাসে বেশি করে বলা হয়েছে; দেবী চৌধুরাণীর সার্থকতা এইখানেই। তবে কোনো কোনো সমালোচকের মতে, 'এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ, ইতিহাসপ্রিয়তা ও ধর্মতত্ত্বের সম্মিলন হইয়াছে, কিন্তু সামঞ্জস্য হয় নাই।' *

* বঙ্কিমচন্দ্র: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। এখানে নিষ্কামতত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। জয়ন্তী ও শ্রীর বাক্যে ও কর্মে এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি কেমন করে মানুষকে পশুত্বে পরিবর্তিত করে থাকে, তারই চিত্র আঁকা হয়েছে সীতারামের অধঃপতনে। এই উপন্যাসের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে এইখানে পরস্পরবিরোধী ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সর্বজয়ী নিষ্কাম ধর্ম আর নিয়তির অনতিক্রম্য বিধান এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে কতটুকু মেনে নেওয়া যেতে পারে, মানুষের জীবনে এদের কোন্‌টির স্থান কোথায়, তা স্পষ্ট হয়নি। তবে মানবচরিত্রের নানা রহস্য ও বৈচিত্র্যে এই উপন্যাসখানি সমৃদ্ধ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনতার কার্যকলাপের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-নৈপুণ্য বিস্ময়কর। জয়ন্তী ও শ্রী অপেক্ষা রমা-চরিত্রের অন্তর্নিহিত মাধুর্য-অঙ্কনেই বঙ্কিম-প্রতিভা এই উপন্যাসে সমধিক সার্থক হয়েছে। 'জলে ধোঁয়া যুঁই ফুলের মত বড় কোমল প্রকৃতি'—রমার এই বর্ণনা যে কোনো প্রথম শ্রেণীর কবির ঈর্ষার বিষয়। যে ধাতুকে পুড়িয়ে পিটিয়ে দেবীপ্রতিমা গড়ে ভবিষ্যতের বাঙলার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—ভ্রমর, প্রফুল্ল ও রমা—তাই-ই। এই সত্যটি যে না বুঝল তার পক্ষে বৃথাই বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ।

'সীতারাম' উপন্যাসের বক্তব্য কি? হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার। 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?'—স্বামীর কাছে স্ত্রীর এই প্রার্থনা হিন্দুর কাছে হিন্দুর প্রাপ্য দাবী হিসাবেই দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচকের অভিমত উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'তিনি বর্তমানের দীনতা, শূন্যতা এবং হীনতাবোধকে অতীতের প্রাধান্য ও গৌরব দ্বারা খণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অতীতের শ্লাঘায় তাঁহার মন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। অতীতের হিন্দুকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া তাহার অতীত গৌরবকে ফিরাইয়া আনা এবং ভবিষ্যতে আরো সুমহান কীর্তিস্থাপনের পরিবেশ রচনার সংকল্প লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' রচনা করেন। কিন্তু অনুরাগ ও শক্তি সত্ত্বেও তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—সে যুগও আর নাই এবং সে মানুষেরও মৃত্যু হইয়াছে।'*

---

* বঙ্কিম-মানস: অরবিন্দ পোদ্দার

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচিন্তার ধারা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস-ত্রয়ীতে। বাঙলার সমস্যা, বাঙলার সমৃদ্ধি, বাঙলার স্বাধীনতা তাঁকে এই পর্বে চিন্তাকুল করেছে, ব্যথিত করেছে আবার দুর্বল আশায় চঞ্চলও করেছে। তাঁর এই জাতীয় বঙ্গচিন্তার সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের সামগ্রিক সমস্যাকে সংশ্লিষ্ট করতে পারেননি বলে বঙ্কিম-প্রতিভা প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট এবং সেই কারণেই অসম্পূর্ণ, এমন অভিমত কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 'তাঁর সমগ্র রচনাবলী পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতি বৃহত্তর ভারত-চিন্তার বিরোধী নয়। বাঙলা ও ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।'* সত্য বটে বাঙলার পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী, কল্যাণময় রূপ তাঁর ভাবনা-কল্পনায় প্রাধান্য পেয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, 'জাতির সমগ্র সত্তার যে সাড়া, তাহাই বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতীক্ষা করিতেছিল। বঙ্কিমের মধ্যে যেন একটা সমগ্র জাতির জাতিস্মরতা—অতীত জীবনের চেতনা—জাগিয়া উঠিয়াছিল।'† সেদিন এর প্রয়োজন ছিল। মাইকেলের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও প্রত্যেক বাঙালীকে আপনার থেকে আপনার জন করে ফেলেছিলেন; তাই তো তিনি সারাজীবন কেবল বাঙলার জন্য, বাঙালীর জন্য কেঁদেছিলেন। স্বজাতির হিতচিন্তার বেদীমূলে শিল্পী বঙ্কিমের এই আত্মবিলোপই তাঁর প্রতিভার মহত্ত্ব।

সবশেষে একটি কথা বলব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি দীর্ঘকাল আমাদের সামনে রয়েছে। পুরুষানুক্রমে এগুলি আমরা পাঠ করে আসছি। আমাদের উত্তরপুরুষও এগুলি পাঠ করবে। যেমন জনসন বলেছিলেন, শেক্সপিয়র কোনো একটি যুগের নন, তিনি সকল যুগের। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও এই উক্তি করা চলে। পৃথিবীর এই দুইটি মহৎ প্রতিভা সার্থক হয়েছে একটিমাত্র উদ্দেশ্যসাধনের ভেতর দিয়ে—to crystallize life; দু'জনেই ভাষার মধ্যে বিধৃত করে গিয়েছেন সর্বকালের জীবনরহস্য। দু'জনের সৃষ্টি তাই আজো জীবন্ত দ্যুতিতে ভাস্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকান্তরিত হওয়ার পর প্রায় একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত

* চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র : ভবতোষ দত্ত

† বঙ্কিম-বরণ : মোহিতলাল মজুমদার

হ'তে চললো। আজ তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমের কবি-সত্তাকে হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। বুঝতে হবে যে তাঁর উপন্যাসগুলি শুধুই যদি উপন্যাস হ'ত তাহলে এমন করে চিরকালের জন্য আমাদের মনে সাড়া জাগাতে পারত না। সুতরাং একথা আজ সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, শিল্পী বঙ্কিম তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে উপন্যাসের অতিরিক্ত উপাদান রেখে গিয়েছেন। বঙ্কিম-প্রতিভার প্রেক্ষাপটে যে সুমহৎ বা দৈবী কবিত্ব-প্রেরণা আছে, তাকেই আজ আমাদের বিচার ও অনুভূতির মধ্যে পেতে হবে। মহত্তর কবি-চেতনা ভিন্ন কেউ মহৎ শিল্পী হতে পারেন না। শিল্পী স্রষ্টা এবং নিজস্ব অনুভূতি ভিন্ন সৃষ্টিকার্য সম্ভব নয়। হোমর, দান্তে, ভার্জিল, শেক্স-পিয়র, কালিদাস প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। এই তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান আছে কি? উত্তর—হ্যাঁ আছে। শেক্সপিয়র সম্পর্কে হ্যাজলিট বলেছেন: 'He sees nothing loftier than human hopes, nothing deeper than the human heart'। আর ক্রোচে বলেছেন: 'He knows no other than the vigorous, passionate life upon earth, divided between joy and sorrow with, around and above it, the shadow of a mystery'। এই দুটি উক্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে প্রযোজ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র একজন যথার্থ কলাবন্ত শিল্পী; উপন্যাসই তাঁর প্রকৃত ক্ষেত্র। মনীষা ও সৌন্দর্য-চেতনা এই দুয়ের সমন্বয়েই উপন্যাসে বঙ্কিম যে শিল্প-সৌন্দর্যের পরিচয় রেখে গিয়েছেন তার সম্যক অনুশীলন করলে তাঁকে শুধু বাঙালী ঔপন্যাসিক বলা চলে না, বলতে হয় তিনি একজন বিশ্বশিল্পী। বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর মতো কারিগর আর কেউ নেই, আগেও না, পরেও না। তাঁর প্রতিভার শিখরদেশ আজ পর্যন্ত আর কেউ স্পর্শ করতে পারেননি। এখানে বঙ্কিম সত্যিই একেশ্বর সূর্য। উপন্যাসের উপাদান কি? আখ্যান, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোনো একখানি উপন্যাস পাঠ করলেই দেখা যাবে যে, এই তিনটি বিষয়েই তিনি সমান ও সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং তিনটিকে এক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে রসসৃজনের মধ্যে সুসমঞ্জস করে ধরেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের স্কটের মতোই বঙ্কিম একজন প্রথমশ্রেণীর গল্পকার; ঘটনাবিন্যাসে তিনি যে দৃঢ়পিনদ্ধ স্থাপত্য-রীতির পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। আর চরিত্রসৃষ্টি? সে তো জীবন্ত।

কিন্তু এহো বাহ্য। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বঙ্কিম-উপন্যাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর অন্তর্নিহিত Lyric beauty বা গীতি-কাব্যসুলভ সৌন্দর্য যা বাঙলার নিজস্ব জিনিস। তিনি বিশেষভাবেই জানতেন যে তিনি বাঙলার মাটির মানুষ; সে মাটির মহিমা স্বীকার করে নিয়েই তো ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটেছিল একশো বছর আগে। এই গীতিময়তাই তাঁর প্রত্যেকখানি উপন্যাসকে দেদীপ্যমান করে রেখেছে এবং আজো তা চিত্তস্পন্দী—কান্তগুণে চমৎকার। বাঙলার শ্যামল প্রকৃতি গড়েছে বঙ্কিম-মানস; বাঙলার পারিবারিক জীবন, এর সামাজিক জীবনের যত কিছু লালিত্য, মাধুর্য, সুষমা, সৌষ্ঠব ও পরিচ্ছন্নতা—সব কিছু তাঁর উপন্যাসের স্বল্পায়তন ক্ষেত্রে নিপুণভাবে ফুঠে উঠেছে। সেখানে আমরা গীতিকাব্যের ঐকতান কি শুনতে পাই না? বঙ্কিম-উপন্যাসের প্লট বা পরিকল্পনা বর্তমান কালের উপন্যাসের তুলনায় অল্পপরিসর হলেও সরল এবং সমস্তটির গঠন সুষম, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিবিড় ঐক্যমুখী। বিশালতা নয়, জটিলতা নয়—গীতিকাব্য-সুলভ ভাববিদগ্ধ একতন্ত্রিতাই বঙ্কিম-উপন্যাসকে একটি শাশ্বত মূল্য দিয়েছে এবং এটি ধরতে না পারলে বঙ্কিম-উপন্যাসের রসগ্রহণ বৃথা। কমনীয়তার পরাকাষ্ঠায় বঙ্কিম বাঙলা সাহিত্যে সর্বকালের জন্য অপরাজেয় হয়ে আছেন এবং আজ পর্যন্ত আর কোনো ঔপন্যাসিক এই ক্ষেত্রে তাঁকে অতিক্রম করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি মনে পড়ে: 'যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর নয়'। তাঁর প্রত্যেকখানি উপন্যাসে আছে ঘরের সামগ্রী—বাঙলার নিজস্ব প্রকৃতি—এর ঘর গৃহস্থালী, এর চণ্ডীমণ্ডপ, এর কোমলহৃদয়া নারী—এইসব উপাদানকেই তিনি গীতিকাব্যের রূপ দিয়েছেন বলেই না সেগুলি আমাদের কাছে আজো চিত্তাকর্ষক, আজো নূতন ও স্বাদিষ্ঠ।

শেক্‌সপিয়র যেমন নাট্যকার হয়েও একজন কবি, বঙ্কিমও তেমনি ঔপন্যাসিক হয়েও একজন কবি। তাঁর শিল্পীসত্তার মধ্যে তাঁর কবিসত্তা ওতপ্রোতভাবেই মিশে আছে এবং সেই তাঁর কবিসত্তাকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারছি ততক্ষণ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবে না। উপলব্ধি করতে

হবে যে, সকলের আগে বঙ্কিমচন্দ্র একজন কবি এবং মহৎ কবি। বঙ্কিম-প্রতিভার প্রেক্ষাপটে আছে কবিত্ব-প্রেরণা এবং এই প্রেরণার বলেই শুধু তাঁর ভাষা কবিত্বমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি পর্যন্ত কবিত্ব-মণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে। এইজন্যই তাঁর সৃষ্টি এমন সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁর উপন্যাসগুলির অর্ধেক সৌন্দর্যই হল কবিত্ব। এই দুর্লভ কবিত্বশক্তির বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মানব-হৃদয়ের চিরন্তন নিগূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনে আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, যেমন দেখিয়েছেন শেক্সপিয়র।

তিনি যদি কবি না হতেন তাহলে কি বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের প্রতি অমন আকর্ষণ বোধ করতেন? বঙ্কিম-সৃষ্ট প্রত্যেকটি নরনারীর মধ্যে দেখা যায় যে, জীবনের প্রতি তাদের আকর্ষণ প্রবল, জীবনকে উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তাদের অপরিসীম এবং বেঁচে থাকা বা বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাই তাদের কাছে যেন কত আনন্দময়. কত মধুর। এক সৃষ্টিশীল নব-অনুপ্রাণনায় চঞ্চল পরিবেশে যেসব মানুষের জন্ম, যারা উনিশ শতকের নূতন সংস্কৃতি নূতন জীবন-দর্শনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারী সেই পরিবেশের মধ্যেই তাদের জীবনকে জেনেছে, দেখেছে ও উপভোগ করেছে। এই মানুষকেই কবি বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিম-মানসজাত নায়ক-নায়িকা প্রত্যেকেই জীবনের অপূর্ব আস্বাদের কথা, জীবনকে সৃষ্টি করার চাঞ্চল্যের কথা আমাদের কানে কানে বলে যায়—বলে যায় জীবনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সর্বকালে সর্বদেশে চিরন্তন, বলে যায় জীবনের স্বাদ কোন-দিনই বিস্বাদ হয় না। তাই তো দেখি বঙ্কিম-সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্র—বিশেষ করে নারী-চরিত্র যেন জীবনের চেতনায় উজ্জ্বল ও উচ্ছল। তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি নরনারীর চরিত্রের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—নারীর মধ্যে সীমাহীন প্রাণপ্রাচুর্য আর পুরুষের মধ্যে সংগ্রামশীলতা। বঙ্কিমের শিল্পচেতনা যে উৎস থেকে এসেছে সেখানে জীবনের তন্ত্রী শিথিল নয়; বঙ্কিমের জীবনদৃষ্টি তাই স্নিগ্ধ, সহাস্য ও চিরন্তন মাধুর্যমণ্ডিত। তিনি কবি ছিলেন বলেই না জীবন-রহস্যের মর্মভেদ তাঁর পক্ষে অমন সহজসাধ্য ছিল। জীবনের গভীরতর সুর একমাত্র কবি ভিন্ন আর কারো পক্ষে অনুভবগম্য নয়।

॥ এগার ॥

এইবার ধর্মতত্ত্ব প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা।

গোঁড়া হিন্দু-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সনাতন ধর্মের আবহাওয়াতেই লালিত হন। 'গৃহে দেবোপম পিতা, দেবীপ্রতিমা মাতা, জাগ্রত দেবতা রাধাবল্লভ। ভট্টপল্লীর দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নিয়ত আসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন; প্রসিদ্ধ কথকেরা মধ্যে মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন; পূজার দালানে হোম, চণ্ডীপাঠ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা; দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, রাস প্রভৃতি বারমাসে তের পার্বণ; ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ।' *

বাল্যজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিবেশ থেকেই রস আহরণ করেছিলেন। স্বভাবতই এই ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁর উপর এসে গিয়েছিল। তারপর মধ্য-জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ফলে তিনি হয়ে উঠলেন ঘোরতর সংশয়বাদী, কিন্তু তখনো এই ঐতিহ্যের আকর্ষণ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শটা ছিল পৈতৃক—যাদবচন্দ্রের জীবনে যেমন, তাঁর পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও তেমন দেখা যায়; তবে এর দ্বারা তিনি কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা সঠিক অনুমান করা অসম্ভব। তাঁর জীবনেতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পারিবারিক পরিবেশ ও সাধু-সজ্জনের প্রভাব সত্ত্বেও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে অনুরাগ তা সর্বতোভাবেই ছিল একজন সুপণ্ডিত বুদ্ধিজীবীর অনুরাগ। রামমোহনের মতো সংস্কারমুক্ত চিত্ত তাঁর না থাকলেও, একথা ঠিক যে বুদ্ধির আলোকেই তিনি ধর্মের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার কথা চিন্তা করেছেন, বিচার করেছেন এবং এইভাবেই তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছিলেন। আবার সমকালীন পরিবেশও ছিল এর অনুকূল। সেই যুগটা ছিল একান্তভাবেই ধর্ম-জিজ্ঞাসার যুগ, ধর্ম আন্দোলনের যুগ।

* বঙ্কিম-জীবনী : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খ্রীষ্টধর্ম. ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজী আন্দোলন, সনাতন হিন্দুধর্ম আন্দোলন—এইসব বিভিন্ন ভাবধারা তখন মানুষের মনের মধ্যে জাগিয়েছে মানুষের সার্থক ও সুসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে মূলগত প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষী এর থেকে দূরে থাকতে পারেননি এবং তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবিক তিনি তাই করলেন হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করে একটা যুগোপযোগী মীমাংসায় তিনি উপনীত হতে চাইলেন। এই মীমাংসারই ফলশ্রুতি 'ধর্মতত্ত্ব'।

বঙ্কিম-প্রতিভার মূল বুঝতে হলে তাঁর জীবন-দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয় এবং এর ক্রমিক অভিব্যক্তির ধারাটি পর্যালোচনা করতে হয়, নতুবা আমরা উপলব্ধি করতে পারব না কেন তিনি হিন্দুধর্মকেই জগতে 'সম্পূর্ণ ধর্ম' বলে গণ্য করতেন। তাঁর এই মানস বিবর্তন যেমন তেমন করে আলোচনা করার জিনিস নয় এবং সেইজন্য তাঁর প্রতিভার এই দিকটি এক-রকম অনালোচিতই রয়ে গিয়েছে বলে আমার ধারণা। শ্রীঅরবিন্দের পরে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই বিষয়ে কতকটা আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন অগ্রগামী ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন তাঁর যৌবনকাল থেকেই। তরুণ বয়সে বেন্থামের হিতবাদদর্শন তাঁকে গভীরভাবেই আকৃষ্ট করে; তাঁর বহু রচনার মধ্যে হিতবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ। তিনি বেন্থামের মতবাদ (Greatest good of the greatest number) সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছিলেন, যদিও শেষ জীবনে তিনি বেন্থামের প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। মুক্ত হলেও হিতবাদের কার্যকারিতা তিনি চিরকাল স্বীকার করতেন। ধর্মচর্চায় হিতবাদের স্থান নির্ণয় করে তিনি যা বলেছেন* তা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

বেন্থামের পরেই তাঁর চিন্তায় দেখা যায় আগস্ট কোম্‌তের প্রভাব। কোম্‌তের মতবাদ 'পজিটিভ ফিলজফি' বা ধ্রুববাদ নামে পরিচিত। 'শেষজীবনে হিন্দুধর্মের ভিতরেই জগতের যাবতীয় দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখিলেও কোম্‌ত-প্রবর্তিত ধ্রুববাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা কণামাত্র হ্রাস পায় নাই।' সকলেই জানেন, তিনি বাঙলাদেশে এই মতবাদ প্রচারের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—যেমন অনুরাগী ছিলেন তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। একদিন

* ধর্মতত্ত্ব, ২২শ অধ্যায়: আত্মপ্রীতি

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আর বঙ্কিমচন্দ্র গাড়ি করে হাওড়া থেকে কলিকাতায় ফিরছিলেন। উভয়ের মধ্যে 'কোম্‌ত দর্শন' নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যখন তাঁকে বললেন: 'কোম্‌তের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার সময় আসেনি,' তখন তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন: 'কেন? যেটা truth তার আবার সময় অসময় কি?' * মানুষের জীবনে সমাজের গুরুত্বের কথা কোম্‌ত বলেছেন; বঙ্কিমচন্দ্রও এর পুনরুক্তি করে বলেছেন: 'সমাজকে ভক্তি করিবে। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।' এইবার আমরা দেখব কেমন করে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শন ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে হিন্দুশাস্ত্রকে অবলম্বন করেছিল, দেখব হিতবাদী বঙ্কিম কেমন করে ধর্মতত্ত্ব প্রচারক বঙ্কিমে পরিণত হলেন। য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অধিকার ব্যাপক ছিল। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। সমসাময়িক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিল, চার্লস ডারুইন, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি সম্যক পরিচিত ছিলেন। একসময়ে মিলের প্রভাব তো তাঁর উপর বিশেষভাবেই পড়েছিল।

এইভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় স্নাত বঙ্কিমচন্দ্র কেমন করে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং গীতা, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে তাঁর সেই অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছিলেন, সেইকথা এইবার আলোচনা করব। বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ শেষ হওয়ার পরেই বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের সমর্থকরূপে এক বৃহৎ মসী-যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাঁর জীবনেতিহাসে এ ঘটনাটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। ১৮৮২। শোভাবাজারের রাজবাড়ির একটা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পাদ্রী হেষ্টি সাহেব (ইনি তখন জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুসনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিই স্বামী বিবেকানন্দকে কালীসাধক রামকৃষ্ণের সন্ধান দিয়েছিলেন।) হিন্দুসমাজের প্রতিমাপূজা ও দেবদেবীগণের উপর এক বীভৎস কুরুচিপূর্ণ আক্রমণ করেন। আঘাত করেই তিনি বুঝলেন— বিশাল হিন্দুসমাজ যেন একটি নিরেট শিলা। তাতে চোট খেয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের শিঙ ভাঙবার উপক্রম হল। বহুস্তরনিবদ্ধ হিন্দুসমাজের কঠিন শিলাতটে হেষ্টির বপ্রক্রীড়ার সখ অচিরেই মিটেছিল। মিটিয়েছিলেন সব্যসাচী

* পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়): বিপিনবিহারী গুপ্ত

বঙ্কিম। রামমোহনের মতো তর্কযুদ্ধে তিনিও ছিলেন অজেয়। হেষ্টির আক্রমণের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দুসমাজের অনেকেই সেদিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় চিঠি লিখেছিলেন, তিনি সেগুলির জবাব দেননি। কিন্তু 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামের অন্তরাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন তখন আর পাদ্রী সাহেব নীরব থাকতে পারলেন না। কর্মস্থল যাজপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র স্টেটসম্যান পত্রিকায় চারখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ইংরেজী রচনায় বঙ্কিমের কি রকম দখল ছিল তার স্বাক্ষর আছে এই পত্র চারখানির মধ্যে। এই মসী-যুদ্ধে লিপ্ত হতে গিয়েই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। তার আগে অবশ্য বঙ্গদর্শনে দুই-একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে সামান্য আভাস পাওয়া যায়। এই মসী-যুদ্ধ সেই সময়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। করবারই কথা। হেষ্টির আক্রমণে নূতনত্ব ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় কিছু নূতনত্ব ছিল, তবে তাঁর সকল বক্তব্য নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। এই তর্ক উপলক্ষে তাঁকে আধুনিক হিন্দুধর্মের ইতিহাস ও বৈদিকধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক বিষয়ে অনেক কথা ভাবতে হয়েছিল, লিখতে হয়েছিল। তা আমাদের জানার দরকার আছে।

উনিশ শতকের অষ্টম দশক হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ। এইসময়েই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের অভ্যুদয়। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় স্বভাবতই বিচলিত বোধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় যুগোচিত ধারণা অবলম্বনে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন। চল্লিশোত্তর বয়সের যে বঙ্কিম তিনি হিন্দুধর্মে আস্থাবান বঙ্কিম। পিতার নিকট প্রাপ্ত শিক্ষার প্রভাবেই গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্বকে তিনি শ্রেষ্ঠ নীতি বলে বুঝলেন এবং একেই য়ুরোপীয় দর্শন ও চারিত্রনীতির শাস্ত্রের আলোকে বিচার করে অনুশীলনতত্ত্বে উপনীত হন। য়ুরোপীয় মনীষীদের কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন যে, দৈহিক ও মানসিক সর্ববিধ বৃত্তির সুসমঞ্জস পরিণতি সাধনই মনুষ্যত্ব। এর সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্র থেকে ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মতত্ত্বের সমন্বয় করে তিনি শেখালেন—সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নেই।

১৮৮৪। শ্রাবণ মাস।

ধর্মালোচনা মুখে করেই একই মাসের মধ্যে বেরুল নবজীবন ও প্রচার।

দুটোই ছিল মাসিক পত্রিকা; প্রথমটির সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, দ্বিতীয়টির সম্পাদক জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন যেমন তাঁর দ্বিতীয় যুগের মৌলকীর্তি, তেমনি তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হল প্রচার পত্রিকা। এবার নূতন বঙ্কিমের দেখা পাওয়া গেল। সেই প্রথম বঙ্কিমের লেখনী স্বতন্ত্রভাবে, একান্ত মনে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হল। শিক্ষিত সমাজে তাই ঐ আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভূত হয়। সে আন্দোলনের অধিনেতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। উভয় পত্রিকাতেই তিনি হিন্দুধর্ম বিষয়ে নিয়মিতভাবে লিখতে থাকেন। কথিত আছে, এইসময়ে তাঁর বন্ধু জগদীশনাথ রায় একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিহাস করে বলেছিলেন, ব্রহ্মা চতুর্মুখ ছিলেন, তোমার দেখছি এখন দুই মুখ। উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, কি জানো জগদীশ, দুই মুখেও কুলোতে পারছি না, মনে ভাবছি এবার থেকে আমি চতুর্মুখরূপেই আবির্ভূত হব। দক্ষিণে, বামে এবং পশ্চাতে ও সম্মুখে বহু প্রতিপক্ষ—এঁদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আমাকে জয়লাভ করতে হলে আরো দুখানা কাগজের দরকার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয়লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল।

'এই দুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন।' এই প্রচার পত্রিকাতেই তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি। নবজীবনে প্রকাশিত হয় অনুশীলনতত্ত্বের ব্যাখ্যা। বঙ্কিম-মানস তখন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত যখন তিনি শেষ জীবনে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বেন্থাম, মিল, কোমত্‌ (August Comte) প্রভৃতি য়ুরোপীয় মনীষীদের প্রচারিত ধ্রুববাদ (পজিটিভিজম্‌) ও হিতবাদ তাঁর যৌবনকালের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। এই যুগের বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বেকার সেই পজিটিভিস্ট বা হিতবাদী বঙ্কিম নন; তিনি এখন 'ঈশ্বর খুব সম্ভব কাল্পনিক,' এই ধারণা পোষণ করেন না, অথবা কেবলমাত্র 'ধর্মের সার কর্ষণ, অনুশীলন'—(The substance of religion is culture)—সিলির এই মতও তাঁর পরিণত বয়সের ধর্মচিন্তায় স্থান পায়নি। এখন তিনি সেই বঙ্কিম যিনি উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প দেখে বিমুগ্ধচিত্তে লিখেছিলেন:

'হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।' যিনি গীতার মধ্যে পেয়েছিলেন ধর্মের সার সত্য।

এই বঙ্কিমই দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র নব অভ্যুত্থিত হিন্দু সমাজের নেতা। এই দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রকে না জানতে পারলে, কিম্বা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ঠিক মতো উপলব্ধি করতে না পারলে বঙ্কিম-প্রতিভার অর্ধেকই আমাদের অনুভবের বাইরে থেকে যাবে। এই বঙ্কিমকে না বুঝতে পারলে তাঁর উপন্যাসত্রয়ীর মর্মকথাও সহজে ধারণা করা যাবে না। এই দার্শনিক বঙ্কিমের কথা খুব বেশি আলোচিত হয়নি; বঙ্কিম-প্রতিভার এই দিকটি দীর্ঘকাল একরকম অবহেলিত ছিল বললেই হয়। পরবর্তীকালে এই ক্ষেত্রে যাঁর প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে আছে, তিনি দার্শনিকপ্রবর মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর রচিত 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানি এই জাতীয় আলোচনার মধ্যে আজো শীর্ষস্থানীয় হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের পরিচয় পেতে হলে বিদগ্ধ পাঠককে এই সুচিন্তিত গ্রন্থখানির আশ্রয় নিতেই হবে। এই প্রসঙ্গে আধুনিক কালের আর একজন চিন্তাশীল লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য; তিনি অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থখানিতে বঙ্কিম-মনীষার একটি মৌলিক বিশ্লেষণ আছে।

বলেছি, ঐ সময়টা (১৮৮৪) ছিল নব অভ্যুত্থিত হিন্দুধর্মের যুগ। অক্ষয়বাবু লিখেছেন: 'সেই সময়ে কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাটরূপে বঙ্কিম-বাবু বিরাজ করিতেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া পথিমধ্যে বর্ধমান বিজয় করিয়া কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য সঙ্গীত হয়। চূড়ামণি মহাশয়ও এক-একদিন থাকিতেন। সাহিত্যসেবার সভায় ধর্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসঙ্গত ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের দোহাই জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্ত উল্টা বলিয়াই আমার বোধ হয়। 'সাধারণী'-তে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্মই সকলের আশ্রয়, ধর্মই সকলের অবলম্বন; ধর্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার

ফলে 'নবজীবন' প্রকাশিত হইল।'* এইসময় একদিন বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রকে বলেছিলেন—'বুঝলে অক্ষয়, তোমার সঙ্গে আমিও একমত—ধর্মই সকলের আশ্রয়; বিজ্ঞানের উপর ধর্মের প্রতিষ্ঠা, এ একেবারেই childish যুক্তি। তর্কচূড়ামণি মহাশয় পেছন পথে চলেছেন।'

একদিন চূড়ামণি মহাশয় আলবার্ট হলে বক্তৃতা দেবেন হিন্দুধর্ম বিষয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সেখানে গেলেন সেই বক্তৃতা শুনতে। শুনে ভাল লাগল না, বিরক্ত হলেন। অক্ষয়চন্দ্রকে বললেন, না অক্ষয়, ওর বক্তৃতা আমার ভাল লাগল না।

—কিন্তু লোকেরা দেখি খুব উৎসাহের সঙ্গে শোনে।

—মফঃস্বলের লোকের কথা বলছ?

—কেন কলকাতাতেও দেখেছি, ওঁর বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মনে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। বলেন ভাল উনি।

—তুমি কেশব সেনের বক্তৃতা শোননি? তাঁর পাশে চূড়ামণি যেন সূর্যের পাশে খদ্যোৎ। হাজার বলুন, ওঁর যুক্তি কিন্তু অচল। টিকি দিয়ে শরীরের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি pass করে, কুশাসন non-conductor of electricty বলে উৎকৃষ্ট আসন, শিক্ষিত সমাজে এসব যুক্তির মূল্য কি বলো? এই ভিত্তির উপর হিন্দুধর্মকে দাঁড় করাতে গেলে এর সনাতন মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হবে। দাঁড়াও না, আমার 'ধর্মতত্ত্ব' লেখাটা শেষ হোক, তখন দেখবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর কাছেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে

* বঙ্গভাষার লেখক: অক্ষয়চন্দ্র সরকার

ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপর তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।'*

আসল কথা, তর্কচূড়ামণি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের উপরে, বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপীয় দর্শন ও চারিত্রনীতির উপরে। য়ুরোপে চারিত্রনীতি-শাস্ত্রের প্রথম প্রবক্তা স্পিনোজা, তারপর জার্মান-কবি গ্যেটে। বঙ্কিমের য়ুরোপীয় দর্শনে অধিকার গভীরতর ছিল, যদিও একথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা যেতে পারে যে, বাধামুক্ত সর্বসংস্কারমুক্ত চিত্তে তিনি পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করেননি। এ কৃতিত্ব উনিশ শতকের বাঙলায় একজনের মধ্যেই দেখা যায়—তিনি শ্রীঅরবিন্দ। অবশ্য তাঁর মতো সুযোগও কারো জীবনে ঘটেনি। থাক সে কথা। বঙ্কিমের মত তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ সাদরে বরণ করেছিল, যদিও, কারো কারো মতে, হিন্দুধর্মের মর্মগ্রহণে ও ব্যাখ্যায় তর্কচূড়ামণির পাণ্ডিত্য বঙ্কিম অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি সমাজের অর্ধশিক্ষিতাংশের রুচির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র সে রকম ভুল করেননি।

নব্য হিন্দুধর্মের প্রবর্তকরূপ আমরা যে বঙ্কিমকে পাই, তিনি কি ব্রাহ্ম-বিরোধী ছিলেন? এই প্রসঙ্গে অন্যের অভিমত অপেক্ষা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিমতই উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র একটি নব্য হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। এই আন্দোলনের দুইটি শাখা ছিল—একটির প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র, আর একটির প্রবর্তক পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। এই নব্য হিন্দুধর্ম বহুলাংশে ব্রাহ্মবিরোধী আন্দোলন রূপে দেখা দিয়াছিল।'† প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ্য। বঙ্কিম-চন্দ্রের বহুপূর্বে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু—আদি ব্রাহ্ম সমাজের যিনি একজন দিকপাল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর 'জাতীয় গৌরব' (১৮৬১) এবং এর দশ বছর পরে (১৮৭১) 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতা দুটির মধ্যে যে চিন্তাধারার উন্মেষ দেখা গিয়েছিল, ইতিহাসের গতিপথে চলতে চলতে তাই এসে পরিণতি লাভ করল বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার

* জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

† *New Essays in Criticism:* Seal

মধ্যে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা উত্তরকালে সুপরিণতি লাভ করেছিল প্রথমে বিবেকানন্দ পরে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার মধ্যে। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম।

নব্য হিন্দুধর্ম প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় তাঁর 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার চারমাস পরে রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়ে এক সভায় 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং উহা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই আক্রমণকে বালচাপল্য মনে না করে বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের একটা সম্মিলিত ও সুপরিকল্পিত চেষ্টার নিদর্শন গণ্য করে উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার কারণ রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের পূর্বে আদি সমাজের আরো তিনজন সভ্য কর্তৃক (এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে একজন) তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সকল আক্রমণের তিনি তখনো পর্যন্ত কোনো উত্তর দেননি। 'রবির পিছনে একটি ছায়া দেখিতেছি'—এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি এইসময়ে এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। এই মসী-যুদ্ধের ঘটনাটিও সুবিদিত এবং তর্কযুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সত্যিই অপরাজেয় ছিলেন তা এই ঘটনাতেও প্রমাণিত হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। সেই তর্কযুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই তরুণ রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখে সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মহত্ত্বের কথা স্মরণ করেই পরবর্তীকালে কবি স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন: বঙ্কিমবাবু সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

এইভাবে 'নানা তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি ব্যবহারিক হিন্দুধর্ম আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পথভ্রান্ত বাঙালীকে পথের নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মবিস্মৃতিই

হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। আত্মবিস্মৃতকে আত্মসচেতন করাই তাঁহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি একপ্রকার আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।* ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, গীতা ও বেদের ব্যাখা—এইগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই আত্মোৎসর্গের পরিচয় বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর এই সময়কার চিন্তাধারা অনুশীলন করলে আমরা দেখতে পাই যে, শেষ জীবনে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে হিন্দু-সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করে তিনি একটি উদার মানবধর্মে পৌঁছিতে চেয়েছিলেন—হিন্দু-সংস্কৃতিকে তিনি একটি যুগোপযোগী রূপ দিতে চেয়েছিলেন। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশ থেকে স্পষ্টতই মানব-সংস্কৃতির সম্পদকে স্বীকার করে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে পূর্ণরূপ দিতে চেয়েছিলেন।

শেষ জীবনে এইভাবে হিন্দুধর্মে আস্থাবান বঙ্কিমের হৃদয় কি ভক্তিশূন্য ছিল? না। একটি ঘটনায় এর সাক্ষ্য মেলে। তাঁর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) লিখেছেন। 'কাকা মহাশয়ের হিন্দুস্থানী দারোয়ান পাঠক-মহারাজ একদিন পূজায় বসিয়া গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেছিল। তিনি তখন নীচের বৈঠকখানায় ছিলেন। এমন সময় আমি সেই ঘরে ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই দেখি, আর কেহ নাই, কেবল কাকা একখানি কৌচে শুইয়া আছেন; তাঁহার উভয় চক্ষু মুদ্রিত, মুখ-সংলগ্ন সটকার নল নিঃশব্দ, তিনি যুক্তকর বক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া অনন্যচিত্তে সেই ব্রাহ্মণোচ্চারিত স্তব শুনিতেছেন। মুখে অদ্ভুত ভাব।' তখনি তিনি বুঝলেন, 'কাকার ভিতরে একটা প্রবল ভক্তিস্রোত গিরিনিরুদ্ধ কল্লোলিনীবৎ লুক্কায়িত আছে'।

কিন্তু বাইরে এই ভক্তিভাবের কোনো প্রকাশ ছিল না। যাই হোক, প্রাচীন হিন্দুধর্মালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে অনেকেই অগ্রসর হয়েছিলেন, তবে এই ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র দত্তের প্রয়াসই ছিল উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রের আগেই রমেশচন্দ্র-কৃত ঋগ্বেদ সংহিতার বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম-প্রতিভা ও রমেশ-প্রতিভা যুগপৎ হিন্দু-ধর্মের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হয়েছিল; রমেশচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম'গ্রন্থেরও

* সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ

প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ; এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাথমিক আলোচনা তাঁরই বাড়িতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্র নিজেই একথা বলেছেন। কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে সমবেত হন ও সকলেই রমেশচন্দ্রের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। 'উদারমনা, উৎসাহশীল স্বদেশহিতৈষী' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রস্তাবে শুধু মৌখিক সমর্থন জানাননি, 'নিজে মহাভারত ও ভগবদ্‌গীতা অংশের সংকলনের ভার লইলেন'।* বঙ্কিমচন্দ্রের অকালমৃত্যুর দরুন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্ভবপর হয়নি। এ দায়িত্ব পরে ন্যস্ত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক স্বনামধন্য সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপর। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগিতার উপর নির্ভর করেই রমেশচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্র সংকলন কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন।

'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র বা টাইটেল পেজটি এই রকম :

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রথম ভাগ।

অনুশীলন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫নং প্রতাপ চাটুয্যের লেন।

১২৯৫

মূল্য ১॥০ টাকা

হিন্দুধর্ম (১ম খণ্ড) ভূমিকা : রমেশচন্দ্র দত্ত

এই আখ্যাপত্র থেকে মনে হয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর দরুন এ আর হয়ে ওঠেনি। এ বই নিঃসন্দেহে তাঁর বিরাট কীর্তি এবং এই বইখানির গভীর অধ্যয়ন ব্যতীত তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় অজ্ঞাত থেকে যায়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৮ সনে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল কেশবচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার নামানুসারেই কি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের এইরকম নামকরণ করেছিলেন? তখন বাঙলার চিন্তাক্ষেত্রে প্রবল ব্যক্তি ভূদেব। চুঁচড়ায় অবস্থানের সময় ভূদেবের সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভূদেবের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক চিন্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেই ভূদেবই ধর্মতত্ত্ব পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে এক পত্রে লিখলেন: 'মানবজীবনের ব্যাপকতার প্রতি আপনার দৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিয়াছি।...কে বলিবে এই ধর্মতত্ত্ব লেখকই দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি উপন্যাসগুলির রচয়িতা।'

ধর্মতত্ত্ব বেরুল।

জীবনের কুহুরব এবার ঝঙ্কৃত হল নূতন সুরে।

নব উপলব্ধির হীরকদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বাঙলার মানস-পরিমণ্ডল। জীবন সম্বন্ধে এমন পরিচ্ছন্ন চিন্তা সেযুগে ছিল অভাবনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আর এক নূতন চমকের সৃষ্টি করল। তাঁর এই নব উপলব্ধিকেই আমরা নব-হিন্দুত্ব আখ্যা দিতে পারি। কোথায় গেলেন সেই নাস্তিক বঙ্কিম? নাস্তিক্য বিসর্জন দিয়ে স্বজাতির সামনে এসে দাঁড়ালেন এ কোন্ ধর্ম প্রবক্তা, যিনি ধর্মের সুপরিচিত বুলি আওড়ালেন না উচ্চারণ করলেন এক অভিনব কথা 'এ জীবন লইয়া কি করিতে হয়?' সমগ্র ধর্মতত্ত্বে এই ঋজু, কঠিন জিজ্ঞাসাই ঝঙ্কৃত হয়েছে অভিনব মৌলিকতার সুরে। বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' আমরা পড়েছি। কেশব-প্রতিভার এও এক আশ্চর্য সৃষ্টি; জীবনবেদও বাঙলাসাহিত্যের এক পরমোৎকৃষ্ট গ্রন্থ—ধর্মজীবনের ব্যাকুলতার এক চমৎকার রূপ ফুটেছে এখানে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব আরো গভীর, আরো ব্যাপক এবং আমার ধারণা এই গ্রন্থের প্রকাশকালে যদি কেশবচন্দ্র জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন

যে তাঁর সহপাঠী কেমন শ্রদ্ধার সঙ্গেই কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন: 'ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র।' বৈদ্য কেশবকে ব্রাহ্মণ বঙ্কিম দিলেন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য—এ কিন্তু একেবারে তাৎপর্যহীন নয়। 'বুঝহ রসিক যে জান সন্ধান।'

জীবনবেদ আর ধর্মতত্ত্বের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে।

জীবনবেদ ঈশ্বর-ভক্তির প্রস্রবণ।

ধর্মতত্ত্ব নব-মানবতাবোধের গীতা।

'জীবনবেদের বক্তা গুরুর আসনে উপবিষ্ট। কিন্তু গুরুর গৌরব অতিক্রম করে উল্লসিত হয়েছে তাঁর ভক্তি বা ঈশ্বরযোগ। কিন্তু গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন দায়িত্বের দিকে ও তাঁর শিষ্যের ক্ষমতা-অক্ষমতার দিকে।' * ধর্মতত্ত্বের অন্তর্নিহিত সুরটা নব জাতীয়তা-বোধেরই সুর। জ্ঞানব্রতী, মানব-বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ব আসলে তাঁর মানবতা-বোধ। ইহাই ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। 'এই গ্রন্থই এক হিসাবে বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনব্যাপী ধ্যান ও চিন্তার ফল—তাঁহার অন্তর্জীবনের ইতিহাস বা আত্মপরিচয়ও ইহাতে মিলিবে। মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম বলিয়া সেই ধর্মের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ এই গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।'‡ পরিণত জীবনে যখন তিনি বুঝলেন, এই স্বপ্নবিলাসের দেশে নব মানবতা-বোধের ও নব জাতীয়তা-বোধের ভিত্তি রচনার প্রয়োজন আছে, সেই মুহূর্তে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র মনীষী বঙ্কিমে রূপান্তরিত হলেন। নব-চেতনার নূতন দিগন্ত রচনা করলেন কল্পনাকুশলী শিল্পী। স্বজাতিকে উপহার দিলেন একটি নূতন আদর্শ ও সাধনমন্ত্র। লোককল্যাণের বেদীমূলে এই ছিল সেদিন তাঁর আত্মোৎসর্গ।

প্লেটোর 'ডায়ালগ'-এর ধাঁচে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে তিনি বুঝিয়েছেন ধর্মতত্ত্ব। বিষয় পুরাতন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী অভিনব। তিনি নিজেই বলেছেন: 'তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক—উনবিংশ শতকের

* শাশ্বত বঙ্গ: কাজী আবদুল ওদুদ

‡ বঙ্কিম-বরণ: মোহিতলাল মজুমদার

ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য।' বিশ্বের শাস্ত্র-সাগর মন্থনে তিনি আহরণ করেছিলেন ধর্মতত্ত্বের অমৃত—এ তাঁর জীবনব্যাপী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রাদি পঠন, মনন ও অনুধ্যানের ফল। তাই মনীষী হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার ধর্মতত্ত্ব'। এই গ্রন্থের বিস্তৃততর আলোচনা আমার অভিপ্রেত নয়, অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি সে কাজ বহুপূর্বেই করেছেন। আমি শুধু প্রসঙ্গত দুই-একটি কথা এখানে বলব।

গ্রন্থের নাম ধর্মতত্ত্ব কিন্তু সাধারণ মানুষের, সংসারী মানুষের সর্ববিধ কর্তব্যের কথা ও কর্তব্যের মীমাংসা এবং কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশই এই গ্রন্থে প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, কোনো বিমূর্ততত্ত্বের আলোচনা এখানে স্থান পায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র একেই অনুশীলন ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন এবং আটাশটি অধ্যায়ে অতি নিপুণভাবে সাহিত্যোচিত ভাষায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় বিবিধ কর্তব্যের আলোচনা করেছেন। 'মনুষ্যত্ব সাধনই মানুষের একমাত্র ধর্ম এবং সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই'—সংক্ষেপে ইহাই ধর্মতত্ত্বের মূল বক্তব্য। কিন্তু এহো বাহ্য।

সুখ কোথায়?

কি উপায়ে মানুষ সুখী হতে পারে?

তাঁর সকল উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনের এই মৌল প্রশ্নটির আলোচনা করেছেন। এই ছিল তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা এবং এই ছিল শিল্পীর সৃষ্ট প্রত্যেকটি নর-নারীর অন্তরের কথা। এই জিজ্ঞাসা সার্বজনীন—এই জিজ্ঞাসা চিরন্তন। সংসারে সবাই সুখ খোঁজে, সকল মানুষই সুখের কামনা করে। সকল দেশে সকল যুগে সকল অবস্থায় এই চিরন্তন অন্বেষণই কি মানুষের মনকে বিচলিত করেনি? বাঙলাদেশে উনিশ শতকে একটি প্রতিভাকে কি এই প্রশ্নই বিচলিত করেছিল? ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বঙ্কিম মানুষের এই সার্বজনীন প্রবৃত্তিকেই খুঁজেছেন এবং একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সুখ সেই সার্বজনীন প্রবৃত্তি। এই তো তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার অথবা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার গোড়ার কথা। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই তিনি প্রশ্ন তুললেন—দুঃখ কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় হল—সুখ কি?

সুখ কি ?

সুখ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি।

কিন্তু প্রচলিত নীতিদর্শনকে জলাঞ্জলি না দিতে পারলে তো এই সহজ উত্তরকে গ্রহণ করা যায় না। হিতবাদীদের মতে বহুজনের প্রভূততম কল্যাণই জীবনের উদ্দেশ্য—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখ ও সামাজিক কল্যাণের সামঞ্জস্য বিধান। বেন্থাম বললেন, মানুষের কল্যাণসাধনই জীবনের লক্ষ্য। হিতবাদের এই সংকীর্ণতা উপলব্ধি করে মনীষী বঙ্কিম অন্যভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। মানুষের সুখ মনুষ্যত্বের বিকাশে—এই তিনি ঘোষণা করলেন। বললেন বৃত্তির স্ফূর্তি আর প্রবৃত্তির চরিতার্থতা এক হলেই সুখ। সামঞ্জস্যই সুখ। মনুষ্যত্বের বিকাশ ভিন্ন যে সুখ তা সুখ নয়, সুখের illusion বা ভ্রান্তিমাত্র। দুঃখ তাহলে একান্তভাবেই মানসিক ব্যাপার। কিন্তু এহো বাহ্য।

অথাতো মনুষ্যত্ব-জিজ্ঞাসা।

মনুষ্যত্ব কি ?

মনীষী বঙ্কিম এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে বললেন—'যাহা দ্বারা মানুষের সকল প্রবৃত্তির সম্যক অনুশীলন হয় তাহাই সুখ—শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশেই মনুষ্যত্ব। ইহাই মানুষের সুখ এবং ইহাই তাহার ধর্ম।'

তিনি আরও বললেন, সাহিত্যচর্চা দ্বারাই মনুষ্য-জীবনের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি, ও পরিণতি ঘটে। জীবনমহাকাব্যের কবি কিন্তু এইখানেই থামেননি। তাঁর ধর্মানুশীলনের মূল কথা ঈশ্বরানুবর্তিতা। ঈশ্বর সর্বলোকে বিরাজমান; অতএব সর্বলোকের প্রীতিই ধর্মের মূলে। এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক ও সুসঙ্গত জীবনাচরণ। তাঁর মতে একমাত্র হিন্দুধর্মের সূত্র থেকেই এই চেতনার উদ্বোধন সম্ভব। মিল, বেন্থাম, হার্বার্ট স্পেন্সার অধ্যয়নকারী বঙ্কিমচন্দ্র এখন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী, সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে ?'

দেশাচার ধর্ম নয়, লোকাচারও ধর্ম নয়।

শাস্ত্রব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক অহমিকাকে আঘাত করতে কুণ্ঠিত হননি বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে তিনি রামমোহনের সগোত্র। হিন্দুধর্মের অর্থহীন বহু রীতিনীতির বিরুদ্ধেও তিনি রামমোহনের মতো বিদ্রোহ করেছেন, বলেছেন, 'হিন্দুধর্ম মানি, কিন্তু হিন্দুধর্মের বখামিগুলো মানি না।' বঙ্কিমের জীবনবাদের মধ্যে আছে তাঁর সমন্বয়ী প্রতিভার আশ্চর্য স্বাক্ষর। সেটা বুঝতে হলে একটু গোড়ার কথা বলতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ এদেশের চিরপোষিত বহু সংস্কারের এমন কি প্রাচ্যসভ্যতার মূলীভূত অনেক ভাবেরই বিরোধী ছিল। কালক্রমে যখন দেখা গেল দেশীয় সমাজের পক্ষে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্জন ব উপেক্ষা করে চলা একেবারেই অসম্ভব, তখন সে ধীরে ধীরে স্বীয় আদর্শের সঙ্গে এর সমন্বয়সাধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করল। ইতিহাসের দিক্ পরিবর্তন এখান থেকেই সূচিত হল। শুক্তি যেমন নিজ দেহনিঃসৃত রসদ্বারা তার অভ্যন্তরস্থ বালুকণাকে মুক্তায় পরিণত করে, উনিশ শতকের বাঙলার সমাজেও সেই প্রক্রিয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। কাজটি বড় সুসাধ্য ছিল না। ইতিহাসের প্রসববেদনা দেখা দিল। সমাজমাতৃকা একে একে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যভাবের মধ্যে সমন্বয় সাধনক্ষম কয়েকটি প্রতিভাবান পুত্র প্রসব করলেন। রামমোহন রায় জন্ম নিলেন সর্বপ্রথমে—তারপর একে একে এলেন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব, কেশব ও বঙ্কিম। এঁদের জীবন ও জীবনসাধনার সফলতা পরিমাপ করতে হবে একটিমাত্র মানদণ্ডে—এঁদের মধ্যে কে কি পরিমাণে ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষিত পূর্বোক্ত সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এই সত্যটি না বুঝতে পারলে তাঁর মনীষার প্রকৃত মূল্যায়ন অসম্ভব।

বঙ্কিম বাঙলার শেষ সমন্বয়বাদী প্রতিভা।

সনাতনী হিন্দুদের কাছে রামমোহন যেমন অপাঙক্তেয় ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যেও অনেকটা সেই রকম অবস্থা ঘটেছিল। 'পাছে লোকে কিছু বলে'—এই মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল না এবং সেই কারণেই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি সনাতনীরা সহ্য করতে পারেননি। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ১৮৯২

সনে শোভাবাজারের কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব যখন সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত জানতে চেয়ে এক পত্র লেখেন, তখন তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :
'আমি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। আমি এইরূপ বুঝি, ধর্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম নহে; হিন্দুধর্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্মে এবং এই ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্মে এবং হিন্দুধর্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না।...শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না।'

এ যেন বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে রামমোহনের কথা।

এই বঙ্কিমচন্দ্রই বলতে পেরেছিলেন—'ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা।'

তাঁর ধর্মমত বিচার ও বুদ্ধিভিত্তিক ছিল বলেই তিনি খুব উদার ছিলেন। খাদ্যবিশেষ গ্রহণে বা সমুদ্রযাত্রায় বা বিলাতগমনে যে ধর্ম যায়, তা তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আগে কেউ সাহস করে প্রকাশ্যে বলেননি—সমুদ্রযাত্রা হিন্দু ধর্মানুমোদিত। 'সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া হিন্দু ধর্মানুমোদিত। প্রাচীন উদার হিন্দুধর্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মার্তদিগের হাতে পড়িয়া সংকীর্ণ হইয়াছে'—বঙ্কিমচন্দ্র যখন থেকে এইরকম মত প্রকাশ করতেন, তখন থেকেই গোঁড়া হিন্দুর দল তাঁকে বলত 'বাবু সাহেব' এবং তাঁকে উমেশ বাঁড়ুয্যে, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও রমেশ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে একদলভুক্ত করেছিল।

পরিশেষে আমরা বলব, 'ধর্মতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান। ধর্মের সারাৎসার অনুশীলন—এইটাই তাঁর একমাত্র বক্তব্য; তিনি আরো অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর অনুশীলনতত্ত্বকে যাঁরা বিলাতের অনুশীলনতত্ত্বের অনুকরণ বা অনুসরণ বলে উল্লেখ করেন তাঁরা ভ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এর প্রতিবাদ করে গিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন বিলাতী অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ মাত্র—ভারতীয় অনুশীলনতত্ত্বের (যা গীতোক্ত ধর্মেরই একটি নূতন ব্যাখ্যা মাত্র) উদ্দেশ্য মুক্তি—মুক্তিতেই সুখের পরাকাষ্ঠা।

মুক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব। অন্যত্র বলেছেন, ঈশ্বরে ভক্তিই মনুষ্যত্ব। 'অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নাই ও অনুশীলন নাই।' এই উক্তির একটিমাত্রই অর্থ আছে—ঈশ্বর ভিন্ন জীবন নেই, জীবনের স্ফূর্তি বা বিকাশও নেই। জীবন-মহাকাব্যের কবি বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের আবরণে এই জীবন-বাণীই আমাদের শুনিয়ে গেছেন। এখানে শিল্পী এবং দার্শনিকে কোনো বিরোধ নেই, বিভেদ নেই।

॥ বারো ॥

বঙ্কিমচন্দ্রকে বলা হয় সনাতনী হিন্দু, কিন্তু এই সনাতনী বঙ্কিমই চেয়েছেন ঐহিক জীবনের কল্যাণ। তাই তাঁর দেবতা কুরুক্ষেত্রের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ; বৈষ্ণবের ভাবৈকসর্বস্ব রসময় নন। এবং সেইজন্যই তিনি আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন এই মহান চরিত্রের মানুষটির মধ্যে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে তিনি একটি 'sublime human character' হিসাবে অনুভব করতেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার এই ছিল প্রত্যক্ষ প্রেরণা। 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিমের এক অপূর্ব গ্রন্থ। 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর আগে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৮৮৬)—তারো দু'বছর আগে থেকে 'প্রচার' পত্রিকায় ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: 'কৃষ্ণচরিত্র প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।...আগে 'অনুশীলন-ধর্ম' পুনর্মুদ্রিত করিয়া তৎপরে 'কৃষ্ণচরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেননা, অনুশীলন-ধর্মে যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহাবশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।'

বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বৎসরে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' শীর্ষক একখানি পুস্তকের সমালোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখন থেকেই কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। দশ বছর ধরে সেই অনুসন্ধান চলতে থাকে, সম্ভবত কেউ তা জানত না, তারপর দশ বছর পরে প্রচার পত্রিকায় কৃষ্ণচরিত্র ধারাক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থের প্রথম ভাগ যখন বেরুল, তারপরেও ঐ বিষয়ে উক্ত পত্রিকায় আরো কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার ছয় বছর পরে (১৮৯২) 'কৃষ্ণচরিত্র'

সম্পূর্ণ গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী পাঠকসমাজে উপহার দিলেন—এই তাঁর মনীষার শেষ দান। সম্পূর্ণ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 'আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার পিছনে কম করে বঙ্কিমচন্দ্রের দশ বছরের চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা রয়েছে এবং এই চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা তাঁর জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ছত্রিশ থেকে চুয়ান্ন—জীবনের এই আঠারটি বছর বলতে গেলে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি কৃষ্ণচরিত্রের অনুধ্যান ও অনুশীলন করেছেন; তাঁর অপর কোনো পুস্তকের পিছনে এত শ্রম ও পাণ্ডিত্য তিনি নিয়োজিত করেননি। এই একখানি গ্রন্থই তাঁকে অমর করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। সাতটি খণ্ডে সমাপ্ত এই বিপুলায়তন গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে মনীষী বঙ্কিমের গভীর ও ব্যাপক গবেষণার স্বাক্ষর। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'কৃষ্ণচরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমত মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম, তাহার পর হরিবংশ ও পুরাণ।'*

পাণ্ডিত্যের কথা থাক, একমাত্র শারীরিক শ্রমের কথাটা বিবেচনা করলেই বিস্মিত হতে হয়। ঋগ্বেদের বাঙলা অনুবাদে রমেশচন্দ্রের পরিশ্রমের কথা আমরা জানি, কিন্তু তার সঙ্গে 'কৃষ্ণচরিত্র'-প্রণেতার পরিশ্রমের তুলনা হয় না।

* দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

যেসব গ্রন্থ অবলম্বন করে ও বিশ্লেষণ করে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেসব গ্রন্থের প্রত্যেকটিই বিশাল ও বিরাট। এক অষ্টাদশপর্ব মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেই মানুষের জীবন কেটে যায়। সরকারী চাকরি করে, বিবিধ সাহিত্য-কর্মে লিপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর কমই থাকত। তবে কি রমেশচন্দ্রের মতো তিনিও নৈশচারী ছিলেন? পৃথিবী যখন সুপ্ত, মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র তখন কৃষ্ণচরিত্রের গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন। শেষজীবনে ক্ষীণ স্বাস্থ্যের মধ্যে তিনি এই গ্রন্থের সংশোধন ও পরিবর্ধনের জন্য বিপুল পরিশ্রম করেছিলেন। হিন্দু-পুরাণগুলি পড়ে শেষ করা, এবং পড়ে তাদের সারমর্ম উপলব্ধি করা—এ কী কম শ্রমসাধ্য ব্যাপার? 'এইসব বিরাট গ্রন্থ হইতে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, কখন কখন বিস্তৃত, প্রমাণ উদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক সত্য বিবৃত করা যে প্রতিভার পক্ষে সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রতিভা এই 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।'*

'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনার পূর্বে সাধারণ ভাবে আমাদের কয়েকটি কথা জানা দরকার। চৈতন্যদেবের নির্দেশে তাঁর প্রধান শিষ্য সনাতন ও জীব গোস্বামী সর্বপ্রথম কৃষ্ণের জীবনকথা আলোচনা করেন। সে আলোচনা অবশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষায়। সে আলোচনা ছিল তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের আলোচনা, কৃষ্ণভক্তের আলোচনা। সে আলোচনার মূল কথা—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। সুতরাং গোস্বামীপাদের আলোচনা ভক্তজনেরই আস্বাদনের বিষয়। তথাপি বাঙালী শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণজীবনকথা আলোচনার সূত্রপাত করে গেছেন। বাঙালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। চৈতন্যদেবের বহুকাল পরে উনিশ শতকের বাঙলায় শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষিত বাঙালীর সামনে প্রথম উপস্থিত করার কৃতিত্ব ছিল কেশবচন্দ্রের। বঙ্কিমকে তিনি এইক্ষেত্রে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় লিখেছেন:

'আজকাল শ্রীকৃষ্ণের জীবন এদেশে অনেকেই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনেকে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তিও প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু চতুর্দশ বৎসর পূর্বে (১৮৭৪) কেশবচন্দ্র এক বন্ধুব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে দেশীয় লোকের যে অনুচিত সংস্কার আছে, সে সমুদায়ই মিথ্যা।

* বঙ্কিমচন্দ্র : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বন্ধুগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তবে কেন তাঁহাকে জনসমাজে উপস্থিত করা হয় না? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, আজও এদেশ শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয় নাই। তাঁহাকে আনয়ন করিলে, তাঁহার জীবনের পবিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া, লোকসকলের চরিত্র, নারী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার যে বিশেষ ভাব আছে, তদনুসরণে কলঙ্কিত হইয়া পড়িবে।.. কতকদিন পর একজন বন্ধু (রংপুরের কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস) শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান।'*

উপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংযোজন করে, 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশ করেন। ইহা ১৮৭৬ সনের কথা। এই বছর থেকেই তিনি সুলভ সমাচার পত্রিকায় 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' গ্রন্থের প্রথমাংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন এবং পূর্ণাঙ্গ পুস্তকাকারে উহা ১৮৮৯ সনে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের প্রথম ভাগ এর ঠিক একবছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি যখন বেরুল, উপাধ্যায় মহাশয়ের বইখানিরও দ্বিতীয় সংস্করণ তখন প্রকাশিত হয়। উপাধ্যায়ের বই প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণবিহারী সেন এর একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। উপাধ্যায়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি ঐ বই পাঠ করে বলেছিলেন: 'গৌরবাবু একজন সুপণ্ডিত লোক; শাস্ত্রাদিতে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এজন্য তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্র ঘটনাপূর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুক্তিদ্বারা তিনি সেই সমস্ত ঘটনাবলীর বাস্তবিকতা ও শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যের মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই জাতীয় আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াস প্রথম ও সর্বাগ্রবর্তী ছিল না। তাঁর আগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টাপর হন। তারপর কেশবচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় উপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনা করেন। তিনি এ দুটি সংবাদ অবগত ছিলেন না; কালীনাথ দত্তের কাছেই তিনি প্রথম জানতে পারেন। কথাটি সত্য হ'লে আশ্চর্য বটে—

* শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম (ভূমিকা): উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

সাহিত্য সম্রাট হয়েও সমকালীন বাঙলা সাহিত্যের তিনি বিশেষ কোনো তত্ত্ব নিতেন না, বা ধর্মমূলক আলোচনার কোনো সংবাদ রাখতেন না—আশ্চর্যের বিষয়ই বটে!

'কৃষ্ণচরিত্র' রচনায় প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র যেসব যুক্তি ও পরম্পরা অবলম্বন করে মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত ও মৌলিক অংশ নির্দেশ করেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচারশক্তির পরিচায়ক। যদিও কোনো কোনো সমালোচকের মতে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-চরিত্র হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টায় তিনি অতি অল্পই সিদ্ধকাম হয়েছেন, তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণের যে অনুচিত ধারণা ছিল তিনি তার অনেকটা অপনয়ন করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার কেউ কেউ এর মধ্যে ভক্তির বিলক্ষণ অভাব দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন; বলেছিলেন, 'এই শ্রীকৃষ্ণ শান্তিপুরের ধুতি আর মলমলের পাঞ্জাবী-পরা শ্রীকৃষ্ণ—এমন 'কৃষ্ণচরিত্র' নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেই অঙ্কিত হইতে পারে। ইহা হিন্দুর গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।'* বাঙলার বৈষ্ণব সমাজে 'কৃষ্ণচরিত্র' আদৌ সমাদৃত হয়নি। না হোক—সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না।

স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। এমন প্রভাবশালী ব্যক্তি ভারতবর্ষে—পৃথিবীর কোথাও জন্মগ্রহণ করেননি। গীতা-প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাচার্য; আবার তিনিই সর্বজনমান্য রাষ্ট্রসংগঠক, আদর্শ গৃহী, লোকপ্রিয় জননায়ক ও মহাকুশলী কূটনীতিজ্ঞ—এইরকম নানা ভূমিকায় আমরা তাঁকে দেখেছি। মহাভারতীয় যুগে বেদব্যাস, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির সকলেই তাঁকে জগদীশ্বরের অবতার হিসাবে গ্রহণ করে যথাবিধি পূজা করেছেন। হিন্দু-জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—এই বিশ্বাসে অটল। তারপর

* অধুনাবিলুপ্ত 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম যে, কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হওয়ার পর নবদ্বীপস্থ হরিসভার প্রতিষ্ঠাতা ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

মহাভারতের যুগ শেষ হল। অরাতিসূদন শ্রীকৃষ্ণের সেই চক্রধারী রূপও পরিবর্তিত হল; জয়দেব, চণ্ডীদাস ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবকবিগণের কল্পনায় (অথবা তাঁদের আচরিত মধুর আরাধনায়) তিনি হয়ে দাঁড়ালেন বংশীধারী রাধাকান্ত—'গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর'। এলো যুগল-উপাসনার যুগ; দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনায় এ উপাসনা গুরুত্ব লাভ করলেও ব্যবহারিক জীবনে তথা রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এর মূল্য কম।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে।

ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য ধর্মপরায়ণতা।

ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড—এ কথা স্বামী বিবেকানন্দের।

ভারতীয় দৃষ্টিতে ধর্ম শুধু আচারসর্বস্ব কতকগুলি গতানুগতিক প্রথা নয়। সমাজে সার্বজনীন কল্যাণমূলক আদর্শ ও নীতিকে ভারতবাসী ধর্ম বলে মনে করে থাকে। হয়ত কালধর্মে বহু প্রাচীন প্রথা ও অনুশাসন অকার্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবু ধর্মের মৌল উপকারিতা আধুনিক সমাজে কোনো অংশেই হ্রাস পায়নি। সমাজের উন্নতি বলতে মহাভারতীয় যুগে যা বুঝতাম, আজো কি আমরা তাই বুঝি না? অহিংসা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরোপকার, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয়সংযম—এইসব বিবিধ গুণরাজির অনুশীলনকে কি আমরা আজো সামাজিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করি না? ধর্ম ও নীতিশিক্ষা ভিন্ন মানুষের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বলাভ সেদিনও যেমন আজো তেমনি অসম্ভব। মানুষের জীবনে মহত্ত্ববোধ ভিন্ন মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ কোথায়? আদর্শহীন, ভ্রষ্টচরিত্র ও লক্ষ্যহীন কোন্ জাতি বা দেশ উন্নতিলাভ করতে পেরেছে? বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েই দেখা গেল, ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজ ভারতীয় ভাবাদর্শকে মধ্যযুগীয় বলে উপহাস করেছে, উপেক্ষা করেছে। যখনই তিনি তাঁর কালের এই সত্য উপলব্ধি করলেন তখনই শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন। এই একটিমাত্র চরিত্রের মধ্যেই তিনি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন।

প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী বহু অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ।

পৃথিবীর ধর্মপ্রবর্তকদের জীবনেও বহু অতিমানবিক ও দৈবী ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। রূপকের আবরণে ধর্মশিক্ষা তখন প্রচলিত ছিল। যুগ

পা্ন্টাল; মানুষের চিন্তায় দেখা দিল নূতন দিগন্ত। ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির আবরণ ভেদ করে নবযুগের মানুষের বুদ্ধি মার্জিত হল, চিন্তা হ'ল স্বচ্ছ। ধর্মপ্রবর্তকদের জীবন ও জীবনাদর্শের নূতন মূল্যায়নের প্রয়োজন হ'ল। য়ুরোপে এর প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন স্যর জন সিলি, যিনি ১৮৬৭ সনে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে একখানি নূতন জীবনচরিত রচনা করে খ্রীষ্টান সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। খ্রীষ্ট-জীবনের যাবতীয় myth ও miracle কে অপসারণ করে, এই মনীষী লেখক তাঁর *Ecce Homo* গ্রন্থে যীশু খ্রীষ্টকে উপস্থাপিত করলেন মানবতাবোধের মূর্তবিগ্রহরূপে। নব জেরুজালেমের স্রষ্টাকে তিনি একটি উন্নত ও সভ্যসমাজের স্রষ্টা হিসাবেই দেখেছেন, দেখেছেন একজন যথার্থ সংস্কারক হিসাবে। বিশ্বমানবের তথাকথিত 'ত্রাণকর্তা' হিসাবে নয়। মনীষী স্যর অলিভার লজ, সিলির এই যুগান্তকারী খ্রীষ্ট-চরিত সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন: 'Forty years ago the majority of religious people were surprised and somewhat shocked when a book was written to recall them to a recognition of the thorough humanity of Christ' *

আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র সিলির বইখানি পড়ে থাকবেন; কারণ, কোম্ত-বেন্থামের মতো সিলিও তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন; তাঁর জীবনে দীর্ঘকাল যাবৎ আদরের 'মটো' ছিল সিলির সেই বিখ্যাত উক্তিটি—'The substance of religion is culture'. সিলি প্রণীত এই খ্রীষ্ট-চরিত গ্রন্থখানি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী মানবীয় বিচার-বুদ্ধির আলোকে বিশ্লেষণ করে তাঁকে একজন আদর্শ মানব বলে ঘোষণা করা সেযুগে একমাত্র বঙ্কিম-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর মতে মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রই ভারতীয় ভাবাদর্শের মূর্ত প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদের সাহায্যেই কৃষ্ণচরিত্র বিচার করেছিলেন ভক্তিবাদের সাহায্যে নয়। তিনিই প্রথম উপলব্ধি

* Introduction by Sir Oliver Lodge to *Ecce Homo* (A Survey of the Life and Work of Jesus Christ); Sir John Seeley.

করেছিলেন যে, দার্শনিক কূটজালের শতহস্ত দূরে থেকে আমরা আধুনিক মন নিয়ে কৃষ্ণচরিত্র অনুধাবন করতে পারি। 'কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥' শ্রীকৃষ্ণকে অবতার হিসাবে গণ্য না করলেও আমাদের মূল্যায়নে কোনো ক্ষতি হবে না। কৃষ্ণচরিত্রকে মানবিক মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলে তাঁকে অবতার বলার প্রয়োজনীয়তা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করে মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শকেই ভারতীয় সমাজের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আমরাও একমত যে, আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্মতত্ত্ব যদি ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রযুক্ত হয় তবে সমাজদেহ গ্লানিমুক্ত হবে। মোট কথা, আধুনিক যুক্তি ও মননের দ্বারা কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মনীষী বঙ্কিম সত্যই এদেশে চিন্তার ক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত উন্মোচন করে গিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত স্মর্তব্য। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন : 'যে সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইয়াছে সেই সময়ের গতি এবং বঙ্কিমের চতুর্দিকবর্তী অনুবর্তীগণের ভাবভঙ্গী বিচার করিয়া দেখিলে, এই কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থে প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়।...যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীরদর্প সহকারে কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তিদ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।...কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃত কৃষ্ণ যে অনেক বিভিন্ন, বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে তাহা আমরা শিক্ষা করিয়াছি।'* শ্রীকৃষ্ণ দেবতা নন, মানুষ—সেই মানুষ যাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ—এই মত প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকীয় জাগরণকে সার্থক এবং সম্পূর্ণ করে গিয়েছেন, বলা যায়।

ব্রাহ্মনেতাদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'কৃষ্ণচরিত্র' পাঠ করে একদিন

* আধুনিক সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনো একটা বিশেষ অভাব তিনি লক্ষ্য করেছেন কিনা। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তিনি প্রেম-ভক্তির অভাব লক্ষ্য করেছেন। আর কিছু?—প্রতাপচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—'হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বৈরাগ্যের অভাব ছিল এবং আমার ধারণা এই বৈরাগ্যহীন জীবনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে একজন ধর্মসংস্থাপকের গৌরব দেওয়া যায় না।' প্রতাপচন্দ্র এই কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, তিনি যেন এই অভিমত প্রকাশ্যে বেশি আলোচনা না করেন।

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করতেন (ধর্মতত্ত্ব, ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু তিনি লিখেছেন, 'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।' শ্রীকৃষ্ণকে তিনি মানুষরূপে—স্বপ্রচারিত অনুশীলনতত্ত্বের আদর্শরূপেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তাঁকে বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমাজতত্ত্বে সুপণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত শিক্ষিত সমাজের জন্যই এই গ্রন্থখানি লিখেছিলেন এবং সেই কারণেই ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বর্জন করে তিনি মহাভারতীয় শ্রীকৃষ্ণকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শ্রীকৃষ্ণ তাই একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের দেশে তিনিই একরূপ পথপ্রদর্শক। বঙ্গদর্শনেও তিনি এই বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন; তখন অবশ্য বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ভাববার ও বুঝবার অবকাশ তিনি পাননি। ঐ প্রবন্ধের ভ্রম তিনি শেষে স্বীকার করেছিলেন। তবে এ কথা ঠিক যে, তখন থেকেই শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে তাঁর হৃদয়ে লীলালোক বিস্তার করলেও ভক্ত বৈষ্ণবের ভাব তিনি আদৌ অঙ্গীকার করতে পারেননি। তাই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তিনি তেমনভাবে বুঝতে পারেননি—বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তই ছিল যুগোচিত—শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত নন। তাঁর মতে, এই ঐতিহাসিক কৃষ্ণই আদর্শ মানব, কারণ তাঁর মধ্যে সমস্ত মানবিক বৃত্তি স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস। এই বিরাট চরিত্রটিকে উপলক্ষ করে, বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বের

আদর্শ প্রচার করে তাঁর স্বাধীন চিন্তারই পরিচয় দিয়েছেন। এমন করে শতাব্দী-সঞ্চিত অতিরঞ্জন ও অলৌকিকত্বের আবর্জনা থেকে, অত্যুক্তির ফেনপুঞ্জ থেকে স্বীয় বিচারশক্তি ও বিশ্লেষণ বলে সত্যের উদ্ধার সাধনের প্রয়াস আমরা আর কারো মধ্যে প্রত্যক্ষ করিনি। সর্বগুণসমন্বিত একটি অসাধারণ চরিত্রকে সর্বসাধারণের অনুভবের সীমায় এনে দিয়েছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যিই সব্যসাচী।

কৃষ্ণচরিত্র রচনার মূল প্রেরণাটা কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা, ইতিহাসচিন্তা ও দার্শনিকচিন্তা—এই ত্রিবিধ চিন্তার ধারা যাঁরা গভীর ভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মে ইহা যুগপৎ সক্রিয় ছিল এবং একটির সঙ্গে অপরটি অনুস্যূত হয়েই দেখা দিয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, তাঁর সারস্বত সাধনার উৎস ছিল লোক-কল্যাণ। বঙ্কিম-প্রতিভার ভিত্তিই হল কল্যাণবোধ। তাঁর উপন্যাসগুলির ক্রম-পরিণতির ধারাটা লক্ষ্য করলেই এই সত্যটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষজীবনে এই কল্যাণবোধই তাঁকে দার্শনিক চিন্তায় উদ্‌বোধিত করে থাকবে। কৃষ্ণচরিত্র তাঁর এই চিন্তারই উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি। প্রৌঢ় বয়সে লিখিত এই গ্রন্থে এবং 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমের ধর্মচিন্তা, দার্শনিকতত্ত্ব বিচার এবং ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রীতি যুগপৎ একত্রবদ্ধ হয়েছে। এই ঘন-পিনদ্ধ চিন্তার সম্পদই তিনি তাঁর স্বজাতির হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সাহিত্য স্বাদ স্বতন্ত্র। অখণ্ড বঙ্কিম-প্রতিভার হীরকদ্যুতি এখানে পূর্ণ বিম্বিত। কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচিন্তার একটা পার্থক্য আছে। একজনের মূলে ছিল আবেগ-পূত বিশ্বাস, অন্যজনের মূলে আছে চিন্তার ভার ও বুদ্ধির ধার। বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় কৃষ্ণচরিত্র যেমন প্রদীপ্ত, তেমনি সাহিত্য-স্বাদুতায় ঋদ্ধ হয়ে আছে। পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। 'কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।' —বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই কৃষ্ণচরিত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সুন্দররূপে

ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একখানি চিঠিতেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থের অভিপ্রেত-তত্ত্বটির উল্লেখ করেছেন, দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না; রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি ছিলেন—'তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি।' কৃষ্ণচরিত্রের গবেষণায় বঙ্কিম-প্রতিভার এই প্রকৃতি সুপরিস্ফুট। একদা বিস্তৃত হিন্দুধর্মের উদ্ধারসাধনে ব্রতী রামমোহনকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সর্ববিধ বিরোধিতার ভিতর দিয়ে পথ কেটে চলতে হয়েছিল, উনিশ শতকের শেষভাগে আমরা দেখলাম রামমোহনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে ঠিক সেইরকম বিরোধিতার ভিতর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকেও অগ্রসর হতে হয়েছে। অবতারবাদে অবিশ্বাসী যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্ব-আরোপের বিরোধী ছিলেন এবং অন্যদিকে যাঁরা শাস্ত্র ও লোকাচারকে অভ্রান্ত বলে মনে করতেন, কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণে বঙ্কিম-মনীষার প্রশংসা তাঁরাও করতে পারেন নি। মহত্তম মানবসত্তার প্যাটার্ন অনুসারে দেবতার রূপায়ণ এঁদের সমর্থন পায় নি। আসল কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র দেশানুরাগের সাহায্যেই শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁর প্রবল সত্যানুরাগ তাঁকে শাস্ত্রের অমূলক বা কাল্পনিক অংশ বর্জনে প্রণোদিত করেছিল। জীবনে যেমন, সাহিত্যকর্মেও তেমনি আতিশয্য আর অসঙ্গতি—এই দুটি জিনিস তিনি সর্বদা পরিহার করে চলতেন এবং একমাত্র এই কারণেই বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' গতানুগতিক হয়ে ওঠেনি—এই গ্রন্থে তিনি সত্যিই 'স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা' উড্ডীন করতে পেরেছিলেন। তাই দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে উপলক্ষ করে কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি'-কেই ফুটিয়ে তুলেছেন। আর এই দুটি জিনিস ব্যতিরেকে মনুষ্যত্বের আদর্শের সম্পূর্ণতা কোথায়? একটা ব্যাপক যুগসচেতনতাই যেন কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়েছে। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম-প্রতিভার একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছে দেখা যায়। তাঁর এমন জীবনের পাশ্চাত্য দর্শনের অনুরাগ আর পরবর্তী জীবনের ভিন্নতর সন্ধান, দুই-ই সার্থকভাবে মিলিত হয়েছে। হিন্দু হিতবাদে পাশ্চাত্য হিতবাদ অঙ্কিত হয়েছে। ইহাই 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার ফলশ্রুতি। সেদিন এর প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন আজো আছে।

॥ তেরো ॥

দীপনির্বাণের পূর্বে বঙ্কিম-জীবনের শেষ মাঙ্গলিক রচিত হয়েছিল গীতার শ্লোক দিয়ে। দুর্গেশনন্দিনী-কপালকুণ্ডলার স্রষ্টা কি পরিণত বয়সে তাঁর প্রতিভার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রীমদ্ভগবদগীতার মধ্যে? বঙ্কিম-প্রতিভার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, প্রথম জীবনে তাঁর যে বিশ্বাস স্পষ্ট হয়নি, শেষজীবনে তা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। বয়সে ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি সর্বত্র ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানের সম্পর্ক দেখেছেন। তাঁর সেই অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা কি এতদিনে শান্ত হল? একটা সীমাহীন মনের আকুতির স্পর্শ আছে বঙ্কিম-সাহিত্যে। আকুতি নয় আত্ম-চেতনা। সেই তাঁর প্রখর চেতনা প্রথম জীবনে ছিল কল্পনার শতবর্ণে রঞ্জিত, তখন তিনি ছিলেন সমাজের নবরূপায়নের আশায় উদীপ্ত, চঞ্চল। এই আত্মচেতনার ফলেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিম সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন দুটি জিনিস। প্রথম—বিশ্বের বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যের আবিষ্কার; দ্বিতীয়—প্রত্যক্ষ জগতে রূপের যে প্রকাশ হয়, তার সততা, সংকীর্ণতা, অস্পষ্টতা অতিক্রম করে অব্যক্ত, উন্নত ভাবের রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

আবার এই আত্মচেতনার ফলেই পরিণত বয়সে মনীষী বঙ্কিম দৃষ্টি ফেরালেন গীতার দিকে। জীবনমোহ দ্বারা অনুরঞ্জিত দৃষ্টি এবার বুঝি নূতন চেতনায় প্রদীপ্ত, আত্মোপলব্ধিতে সুস্নিগ্ধ হতে চাইল। রোমান্স রস-স্রষ্টার লেখনী এইবার গীতার ব্যাখ্যা রচনায় নিয়োজিত হল। বঙ্কিম-প্রতিভার এই যে পরিণতি বা পরিসমাপ্তি, এর মধ্যে কি কোনো অসঙ্গতি আছে? এটা আমাদের আগে বোঝা দরকার। মহৎ প্রতিভার লক্ষণ sincerity বা আন্তরিকতা। এই প্রসঙ্গে মনীষী কার্লাইলের একটি উক্তি আমাদের মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন: 'A genius stands by truth, speaks by it, works and lives by it. He has a basis of sincerity. To

his large, open, deep feeling heart, the unspeakable greatness of the mystery of life is ever present to him...He must have truth, truth which he feels to be true. How shall he stand otherwise. He is under the noble necessity of being true.'*

এই যে 'virtue of sincerity বঙ্কিম-প্রতিভা এই লক্ষণ দ্বারা বিশেষভাবেই চিহ্নিত। এবং এইজন্যই তাঁর শেষজীবনের আশ্রয় ছিল গীতা। আশ্রয় এবং অবলম্বন। গীতার অধিকাংশ শ্লোক তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কৃষ্ণচরিত্র রচয়িতার পক্ষে ইহাই তো স্বাভাবিক। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তাঁর কণ্ঠে তাঁর স্বজনবর্গ গীতার আবৃত্তি শুনেছেন, অন্য কিছু শোনেন নি। বয়সে পাঁচ বছরের বড়ো হলেও স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মৃত্যুর ঠিক একমাস আগে একদিন তিনি দেখতে এলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। তিনি তখন ঔষধ খাওয়া একরকম বন্ধ করেছেন। তখন তিনি একেবারেই শয্যাগত। শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল। দাঁতের গোড়া দিয়ে অবিরাম রক্ত নির্গত হচ্ছে, তবু ঔষধ গ্রহণ করবেন না। মহেন্দ্র ডাক্তার এসে অনেক করে বোঝালেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত তর্কে চির অজেয় বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন আর তর্ক করলেন না; শুধু একটু হাসলেন। হাসি নয়—'স্থির বিশ্বাসের বিদ্যুৎস্ফুরণ।' পাশে দাঁড়িয়ে বিষাদের প্রতিমা রাজলক্ষ্মী দেবী।

—ওষুধ খাও না কেন?

—কে বললে আমি ওষুধ খাই না?

—ঐ তো শিশির ওষুধ শিশিতেই ধরা রয়েছে।

—বিশ্বাস করো ডাক্তার, ওষুধ আমি খাই।

—কই তোমার ওষুধ?

—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

শোনা গেল ক্ষীণ কণ্ঠের আবৃত্তি। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, দুর্বল, কিন্তু উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথার মধ্যে স্থির বিশ্বাসের বিদ্যুৎস্ফুরণ অনুভব করলেন প্রবীণ চিকিৎসক। ঐটুকু আবৃত্তি করে, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী-সংকেতে পাশের

* *On Heroes and Hero-Worship*: Carlyle

টেবিলের উপর রক্ষিত গীতাখানি দেখিয়ে দিলেন তিনি। ডাক্তার সরকার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। *

গীতা হিন্দুর শেষ আশ্রয়।

বঙ্কিমচন্দ্রেরও ইহা শেষ আশ্রয় ছিল।

'ঈশ্বর জানিব কিসে?' এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন—'হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে—প্রধানত গীতায়।' তাই তো তিনি লিখলেন গীতার ব্যাখ্যা। তাঁর শেষ এবং অসম্পূর্ণ সাহিত্যিক প্রয়াস। এই গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মাতামহের লোকান্তর গমনের দু'বছর পরে এই অসমাপ্ত রচনা প্রকাশ করেছিলেন; এই গীতা-ব্যাখ্যার কিছু অংশ প্রচার-পত্রিকায় বেরিয়েছিল; প্রকাশিত অংশের সঙ্গে অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি যা পাওয়া গিয়েছিল, তাই-ই এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদও তিনি শেষ করে উঠতে পারেন নি। সকল উপনিষদের সার হিন্দুর এই মহাগ্রন্থখানি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কি অভিমত পোষণ করতেন আমাদের সেটা জানা দরকার।

গীতাভাষ্যের একস্থলে তিনি লিখেছেন: 'এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।' এর আগে তিনি লিখেছিলেন: 'যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকার। ভগবদ্‌গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য-প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। এমন আশ্চর্য ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই।'‡ আবার কৃষ্ণচরিত্রের উপসংহারেও দেখা যায়, গীতোক্ত ধর্মকে লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: 'কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত সর্বলোক-হিতকর সর্বজনের

* বঙ্কিম-জীবনী: শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

‡ ধর্মতত্ত্ব

আচরণীয় ধর্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। ঐ ধর্ম যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত।'

এখন আমাদের দেখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে গীতাধর্ম বুঝেছিলেন। গীতায় যুগপৎ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 'সেইজন্য গীতায় দেখি কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্ত-ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করিয়াছেন—যে পুণ্যতর কল্যাণকর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, সমস্রোতে বহমান! বঙ্কিমচন্দ্র কি এই পুণ্যসঙ্গমে কোনদিন স্নান করিয়াছিলেন?' *

বঙ্কিম-সাহিত্য এর কি সাক্ষ্য দেয়? আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম—এই উপন্যাস-ত্রয়ী যাঁরাই গভীরভাবে পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, কর্মযোগের উপরই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাত ছিল বেশি। তবে তিনি নিষ্কাম ধর্মকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে আছে—'প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে।' আবার ধর্মতত্ত্বে দেখা যায় ভক্তির কথা বলছেন: 'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ভক্তি।' তা'হলে কি গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনেরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন? তিনি কি এই ত্রিমার্গের সামঞ্জস্য করতে পেরেছিলেন? অনেকের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের গীতানুশীলন সম্পূর্ণ নয়; তাঁর গীতাভাষ্য অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্য অধিকতর গভীর। যদিও জীবনের শেষ দশবছর তিনি হিন্দুধর্ম আলোচনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তথাপি জীবনের প্রায় প্রান্ত-সীমায় উপনীত হয়ে গীতাভাষ্য রচনার মতো দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করে তিনি আশানুযায়ী ফললাভ করতে পারেন নি। উপন্যাস-ত্রয়ী রচনাকালে তাঁর মনে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রীতি সম্পর্কে যেসব চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়েছিল, এই অসমাপ্ত রচনায় অল্প-বিস্তর তারই পুনরুক্তিমাত্র দেখা যায়। গীতাভাষ্যে বঙ্কিম-প্রতিভার কোনো মৌলিক স্বাক্ষর আছে বলে আমাদের মনে হয় না। গীতা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং গীতোক্ত ধর্মই 'জগতে একমাত্র সর্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম', কেবলমাত্র এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেই বঙ্কিমচন্দ্র যেন নিরস্ত হয়েছেন। তাই

* দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দেখা যায় যে, ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় তিনি যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, গীতাভাষ্যে তার কিছুমাত্র পরিচয় তিনি রেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তখন মৃত্যুর ছায়া তাঁর উপর নিপতিত হয়েছে, তাই এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থে বঙ্কিম প্রতিভার স্বাক্ষরটা তেমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটতে পারে নি। যিনি হিন্দুর পুরাণ-সাগর মন্থন করে কৃষ্ণচরিত্ররূপ অমৃত উদ্ধার করেছিলেন, তাঁর পক্ষে গীতার উপর কিছু নূতন আলোকপাত করা আদৌ অসম্ভব ছিল না। শেষ জীবনে তিনি বেদ অধ্যয়নেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল, 'বেদের আলোচনা-ফল লিপিবদ্ধ করে প্রতীচীর পণ্ডিতগণের ভ্রান্তির' অপনোদন করবেন। বৈদিককালের একটি স্ত্রীচরিত্র নিয়ে একখানি উপন্যাস রচনা করবেন, এমন ইচ্ছার কথাও তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কাছে একদিন ব্যক্ত করেছিলেন। বেদ সম্বন্ধে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুটে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ বোধ হয় তাঁর শেষ জীবনের সর্বশেষ ঘটনা। প্রতিভা তখনো অপরিম্লান ছিল, কিন্তু রোগজীর্ণ শরীরের পূর্বের ন্যায় শ্রমশক্তি আর ছিল না। তাই, রবীন্দ্রনাথের কথায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া' অস্তাচলে অস্তমিত হয়েছিলেন।

শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে ধর্মের আলোচনায় কেন আত্মনিয়োগ করেছিলেন? এর উত্তর দিয়েছেন রমেশচন্দ্র। তিনি লিখেছেন: 'জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন।... তিনি হিন্দুধর্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটি লক্ষণ—একটি চিহ্নস্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য সংগঠন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্মের জ্ঞান বিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজি বঙ্গসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র।'*

অনুরূপ কথা এন. এন ঘোষও বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩০১

লিখেছিলেন : 'He had discovered in his latter days his serious function, his chief mission in life, to be exponent of the philosophy of religion and in particular of Hinduism in its different aspects.' এই বঙ্কিমের সম্পূর্ণ পরিচয় বাঙালী আজো নিতে পারেনি। এই বঙ্কিমকে বাঙালী আজো গ্রহণ করেনি।

উনিশ শতকের বাঙলার সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—বঙ্কিম-প্রতিভার আলোকে এই তিনটি ক্ষেত্রই আলোকিত হয়েছে। বাঙলা রঙ্গমঞ্চও বাদ যায় নি। জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা আর বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একই বছরের ঘটনা, একথা আগেই বলা হয়েছে। জাতীয় রঙ্গালয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, তারপর যখন থেকে তাঁর উপন্যাসাবলী নাটকান্তরিত হয়ে বাঙলা রঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করতে থাকে তখন থেকে সেই সহানুভূতি অনুরাগে পরিণত হয়েছিল। যেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ পৌরাণিক ও গীতিনাট্যের ধারা চলে আসছিল সেই রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম-নাটকের মাধ্যমে রোমান্সের রসধারা প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কি রকম গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল, সেই ইতিহাস সুবিদিত হলেও, বহু আলোচিত নয়। অনেকের মতে, বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপই বাঙলা থিয়েটারের ধারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্রের একটি অভিমত এখানে উদ্ধৃত হল। তিনি লিখেছেন : 'বঙ্কিমবাবুর প্রায় সকল উপন্যাসই বাঙলার নাট্যশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতি বাঙলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্সের যুগ আনিল। বাঙলার সাহিত্যেও যেমন, বাঙলার নাট্যশালায়ও তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক। প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাঙালী দর্শককে সমানভাবেই আনন্দ দান করিয়া আসিয়াছে।···এ পর্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যত উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ভিন্ন কোনো উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই—যেমন আগ্রহের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে এত

আদর, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার প্রায় উপন্যাসগুলিই ড্রামাটিক এবং ড্রামাটিক বলিয়াই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পক্ষে রসবিকাশের পক্ষে অনুকূল। রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে, প্রায় সব থিয়েটারেই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ই বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে যখনই দর্শক ও অভিনেতারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টি পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের প্রায় সকল উপন্যাসই নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন।'*

বাঙলা উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম নাট্যরূপ ও অভিনয়ের গৌরব দুর্গেশ-নন্দিনীর প্রাপ্য। উপাখ্যানের সৌন্দর্য রঙ্গমঞ্চকে কতখানি জীবন্ত করে তুলতে পারে তা বাঙালী দর্শক প্রথম দেখল নাটকাকারে পরিবর্তিত এই উপন্যাসে। বাঙলা রঙ্গালয়ের যিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-প্রতিভা বঙ্কিম উপন্যাসকে আশ্রয় করে অপূর্বভাবে বিকাশলাভ করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত মৃণালিনী নাটকে পশুপতির ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকায় অভিনয় করতেন। গিরিশচন্দ্র ভিন্ন, তৎকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অমৃত-লাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তবে বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদানে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্বই ছিল সর্বাধিক। চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা ও সীতারাম— বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাস তিনখানির নাট্যরূপই বাঙলা থিয়েটারে সেদিন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আবার এই তিনখানির মধ্যে চন্দ্রশেখরের জনপ্রিয়তাই ছিল অসাধারণ। সেযুগের কত অভিনেতা ও অভিনেত্রী বঙ্কিম-নাটকের কোনো না কোনো একটি চরিত্রে অভিনয় করে রঙ্গমঞ্চে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

বঙ্কিম-প্রতিভায় স্বদেশচিন্তা কতখানি স্থান জুড়ে ছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা অনেকেই করেছেন এবং বর্তমান আলোচনার নানা স্থানেও এ

---

* রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর : অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিষয়ে কিছু কিছু উল্লিখিত হয়েছে। আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনব্যাপী চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁর স্বদেশ। তাই ধর্মতত্ত্বের শেষেও বঙ্কিমচন্দ্র শেষবারের মতো বললেন: 'সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।' তাঁর এই উক্তিটিকে আমাদের সামনে রেখে যদি বলি, বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলার জাতীয় জীবনের নির্মাতা, তা হলে কি অত্যুক্তি হবে? তাঁর স্বদেশচিন্তা তাঁর গভীর স্বাজাত্যবোধের ফল। তাঁর এই স্বদেশচিন্তাকে আমাদের বুঝতে হবে বঙ্কিমের রাজনৈতিক চিন্তা ও ইতিহাস-চিন্তার ভিতর দিয়ে। বাঙলাদেশে জাতীয়তার প্রশ্ন, এবং সেই সঙ্গে জাতীয় উন্নতির প্রশ্ন প্রথম দেখা দিল সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে। তারপর নীলকর-অত্যাচারের সময় থেকেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চেতনা এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তখন থেকেই প্রকৃত পক্ষে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। এরই ফলে এলো অতীত-চেতনতা, অতীত-মুখীনতা। কিন্তু তখনো পর্যন্ত দেশকে এমন একজনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল যাঁকে এইসব প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোড়িত করবে—যিনি যুগের সমস্যায় বিশেষভাবে বিচলিত হবেন।

তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর পূর্বগামীদের অপেক্ষা বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। তিনিই বোধ হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলায় প্রথম চিন্তানায়ক যিনি জাতীয়তাবাদকে কালগত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন এবং যিনি জাতির ইতিহাস, তার অবনতির কারণ ও বর্তমান অবস্থা—এ সবই সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করেছেন। জাতি অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতেন হিন্দু জাতি এবং তাঁর স্বাজাত্যবোধ হিন্দু স্বাজাত্যবোধ। তাঁর প্রচারিত জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণভাবেই Hindu Nationalism বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তখনকার শিক্ষিত বাঙালী সর্বাংশেই হিন্দু এবং বঙ্কিম ছিলেন এদেরই প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই দেখা যায় যে, বঙ্কিমের মনন-ভূমির ধাঁচটাই ছিল এই রকম এবং শেষ পর্বে বঙ্কিম-মানসের পরিণতি পরিপূর্ণ হিন্দু স্বাজাত্যবোধের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ইহাই তাঁর প্রতিভার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

আমরা দেখেছি, জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। সেযুগ নবীন জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনের কাল হিসাবে

চিহ্নিত। স্বদেশচেতনার উন্মেষ হয়েছিল এর আগে রামমোহনের নেতৃত্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, কিন্তু পরবর্তী দুই দশকে তাকে কিছু সংশয়, কিছু সন্দেহ উত্তীর্ণ হতে হল। সংশয়ের বহ্নি যাঁরা প্রজ্বলিত করেছিলেন তাঁরাও বঙ্গসন্তান এবং ইংরেজী শিক্ষায় কৃতবিদ্য। নবলব্ধ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাঁরা দেশপ্রেমের সংজ্ঞায় নব্যচিন্তা প্রয়োগ করলেন। অবশেষে সিপাহী বিদ্রোহের পর ক্রমশ এই দ্বিধার অবসান হয়ে এলো, একদিকে পাশ্চাত্যমোহ, পুঁথিগত দেশপ্রেম থেকে জাতীয় চিন্তা মুক্তিলাভ করল, অপরদিকে অকৃত্রিম ভারতচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সুসমন্বিত দেশপ্রীতির উন্মেষ হল। এই শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে বাঙলা দেশে একটি সর্বাত্মক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাসাগরের সংস্কার-ব্রত আর কেশবচন্দ্রের ধর্মান্দোলন মুখ্যত এই প্রস্তুতির উপকরণ জুগিয়েছে। সেই যুগসন্ধিক্ষণেই বাঙলার সাহিত্যজগতে হল বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। এই আত্মপ্রকাশ ঘটল একটি দৃঢ় উদারনৈতিক আদর্শের পরিবেশের মধ্যে। এক মহাব্রত সাধনে এইবার নিয়োজিত হল একটি দৈবী প্রতিভা। ইতিহাসকে আশ্রয় করে প্রাণের কেন্দ্র থেকে বঙ্কিম জানালেন জাগরণের আহ্বান। য়ুরোপীয় শিক্ষার আলোকে তিনি বিস্মৃত পুরাতনের দিকে অনুরাগ-ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন এবং সেখান থেকেই তিনি স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যাভিমানের রস আহরণ করলেন।

সেযুগে তিনিই বুঝেছিলেন, আমাদের হিন্দুত্ব ও ঐতিহ্য-গৌরবের মধ্যেই আছে আমাদের জাতীয়তার মূল। 'কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে প্রথমাবধি তিনি দেশগত ভিত্তির চেয়ে ধর্ম ও সামাজিক ভিত্তির উপরেই নির্ভর করেছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই হিন্দুত্বের ধারণাকে পুষ্ট করার জন্য পরবর্তীকালে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। জাতীয়তা এবং হিন্দুত্বের ধারণা সম্পূর্ণ সমার্থক কি না, এ বিষয়ে বঙ্কিমের মনে অবশ্যই প্রশ্ন ছিল এবং এই কারণেই পরবর্তীকালে উভয়ের আদর্শ যে সমার্থক এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি নিজের সমস্ত চিন্তাকে নিয়োজিত করেছিলেন।'*

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের ধ্যানধারণা সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি আজো অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। তাঁর ইতিহাস-দৃষ্টি ছিল স্বতন্ত্র রকমের। তিনি

* বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা : অসিতকুমার ভট্টাচার্য

জানতেন, ঐতিহাসিক কারণ ও ঘটনা-পরম্পরা থেকে য়ুরোপের ন্যাশনালিজম, পেট্রিয়টিজম্ প্রভৃতি শব্দদ্বারা সমাজের একটা সম্মিলিত অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়ে জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, আমাদের দেশে তেমন ঘটনার সমাবেশ হয় নি। অথচ বঙ্কিমের যুগেই ঐ শব্দগুলি আমাদের রাজনৈতিক বক্তৃতায় শোনা যেত এবং তারই বাঙলা তর্জমা জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা এবং দেশাত্মবোধ। এগুলি বিলাতি অভিধান থেকে ধার করা মুখস্থ বুলিমাত্র—ঐ সব সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় দেশব্যাপী এমন কোনো আন্দোলন শিক্ষিত-শ্রেণী সৃষ্টি করতে পারেন নি, লোকসাধারণকে ডাকও দেন নি। ইংরেজ-শাসন, ইংরেজী শিক্ষা ও পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় যে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী গড়ে উঠেছিল, সেদিনের ভারত (এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে অন্যতম প্রদেশ হিসাবে বাঙলা দেশ) ছিল সেই ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ। এই ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীরা যখন ভিক্ষার দ্বারা (রবীন্দ্রনাথের কথায় 'আবেদন-নিবেদন') অধিকার অর্জনের জন্য ব্যস্ত, তখন এক অংশে এই বাঙলা দেশেই খাটি স্বদেশ-প্রেম প্রথম জাগ্রত হয়। সে স্বদেশ ইংরেজের পুঁথিগত স্বদেশ, বিদেশী ছাঁচে ঢালা অবাস্তব স্বদেশ নয়। বহুকাল বহু সাধনায় মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেম ও কর্মদ্বারা যে দেশকে সৃষ্টি করেছে তাই-ই তার স্বদেশ। তার সঙ্গে তার জনমণ্ডলীর সঙ্গে বত্রিশ নাড়ীর যোগ অনুভব করার একটা সাধনা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবিতকালে অতদূর অগ্রসর হতে না পারলেও একথা সত্য যে, সচেতন মন নিয়ে তিনি সেই সাধনা করেছিলেন বলেই স্বদেশের সমগ্র রূপ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার প্রকৃত উত্তর সাধক হিসাবে বোধ হয় দু'জনেরই নাম করা যায়, যথা বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ।

কিন্তু আমাদের স্বদেশ প্রেমের প্রথম উদ্গাতা রামমোহন। তাঁরই ছিল সত্যকারের মোহমুক্ত দেশানুরাগ। স্বদেশপ্রেমের বজ্রভেরী বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বার বার ধ্বনিত হয়েছে রামমোহনের লেখায় ও বক্তৃতায়। প্রত্যক্ষ দেশপ্রেমমূলক কাজের সূত্রপাত তিনিই করে যান। বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তিনি ছিলেন দর্শনে সুপণ্ডিত এবং যুক্তিবাদী। তিনি আমাদের সামনে স্থাপন করলেন একটি জীবনবাদী আদর্শ। রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি তাঁর কাছে ছিল গৌণ, চিন্তার মুক্তিই ছিল তাঁর কাছে

মুখ্য। চিন্তার পরাধীনতা তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করত। রামমোহনের পর তাঁর স্বজাতিকে চিন্তার জড়ত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আর কেউ অমন অস্থির হন নি। তাই তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে, হৃদয়ের ব্যগ্রতা নিয়ে যে স্বদেশমন্ত্রে তাঁর স্বজাতিকে দীক্ষিত করে গিয়েছেন, তারই মধ্যে আভাসিত হয়েছে বঙ্কিম-প্রতিভার চরম চরিতার্থতা।

ইতিহাস থেকে তিনি কখনো স্বদেশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ইতিহাসের আলোকেই তিনি মানুষের এবং জাতির জীবন ও চরিত্রশক্তির মহিমা বুঝতে চেয়েছিলেন। তাই তো তিনি গভীর প্রেমে ও গভীর দুঃখে এ জাতির 'নষ্ট সাধনার ইতিহাস এবং বহু ভ্রষ্ট-লগ্নের আত্মঘাত কাহিনী' পর্যালোচনা করেছিলেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-সৃষ্টির ইহাই ছিল প্রেরণা। অতীতকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি ভবিষ্যৎকেই সৃষ্টি করেন। এই করতে গিয়ে, নিজের আগোচরেই বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদী ভারতের অন্যতম স্রষ্টারূপে আবির্ভূত হন। হয়ত আরো কিছুকাল জীবিত থাকলে তাঁকেই আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারূপে পেতাম। সেই আন্দোলন যখন তাঁর মৃত্যুর পর এক দশকের মধ্যেই প্রবাহের মতো এলো, তখন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন না; ছিল তাঁর প্রতিনিধি—অমোঘ বীজশক্তিসম্পন্ন একটিমাত্র মন্ত্র—'বন্দেমাতরম্'।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার মর্ম অনুধাবন করতে হলে তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। গান্ধী-যুগের এক বাঙালী কংগ্রেসী নেতাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাজনীতির চর্চা করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে আপনাদের কি কোনো পরিচয় আছে? তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে বিস্ময় ও বেদনা অনুভব করেছিলাম। 'বঙ্কিমবাবুর নবেলই তো পড়েছি, তাঁর রাজনৈতিক কোনো লেখা তো পড়িনি কখনো'—ঠিক এই কথা কয়টি তাঁর মুখে শুনেছিলাম। বিষয়টি তাই একটু আলোচনা করব এখানে। তাঁর শেষজীবনে যাঁরাই তাঁর পটলডাঙার বাড়িতে যেতেন তাঁরাই প্রতি কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিশেষ আনন্দলাভ করতেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সমকালীন বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী বিজয়লাল দত্ত লিখেছেন: 'একদিন সুযোগ পাইয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম, আপনি এখন রাজকার্য হইতে অবসর পাইয়াছেন, এখন যদি আপনি কংগ্রেসে যোগদান করেন, তাহা হইলে উহার বিশেষ হিত সাধিত হইতে পারে; আপনি কি উহাতে যোগদান করিবেন না? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আপাতত নয়। আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, যোগদান করিবেন না? তিনি বলিলেন, তুমি একজন কংগ্রেসের চেলা, সুতরাং উহার বিশেষ পক্ষপাতী। আমি কি জন্য উহাতে যোগ দিতে পারি না তাহা বলিলে হয়ত তুমি ব্যথিত হইবে তোমাদের নেতা সুরেন্দ্রবাবুও ব্যথিত হইবেন, এজন্য উহা না বলাই ভাল। কংগ্রেসে তাঁহার যোগদান না করিবার কারণ জানিবার জন্য আমি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'শোনো, কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, একথা আমি কখনই বলিতে পারি না। উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আজ পর্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আয়োজন যেন ক্ষণস্থায়ী অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই।'*

সর্বভারতীয় প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তখন শৈশব অবস্থা—মাত্র সাত বছর হল ইহার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি সেই সময়ের। কেন তিনি এইরকম মন্তব্য করেছিলেন, সেটা আমাদের জানা দরকার। তাঁর রচনাবলী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায়, সাধারণ প্রজার সুখই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মুখ্য জিনিস॥ রাজনীতিকে তিনি ধর্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত করেছিলেন—ধর্ম ও জাতীয়তাকে এক স্বর্ণসূত্রে গেঁথে-ছিলেন এবং তাঁর মতে স্বাধীনতা সেই অবস্থা যা সর্বসাধারণের ধর্মাচরণের উপযোগী। তাঁর কাছে ভারতবর্ষের প্রথম প্রশ্ন—এক জাতীয়ত্বের প্রশ্ন। তখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের কর্মপ্রণালী বা চিন্তাধারার মধ্যে বৃহত্তর জাতীয়তাবোধের স্বীকৃতি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এক জাতীয়ত্বের কথা নেতারা বলতেন সত্য,

* ভারতী, আষাঢ়, ১৩০১৮

কিন্তু সে বিষয়ে তাঁদের নিজেদের ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল না॥ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল আরো প্রসারিত। তিনি মনে রেখেছেন, 'ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদ, ভাষার প্রভেদ, বংশের প্রভেদ, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি।' তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'ঐক্য জ্ঞান কিসে থাকিবে? বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রি, রাজপুত, জাট, হিন্দু, মুসলমান ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে?'

এই প্রশ্নের একটি সদুত্তর তিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যাকে আমরা স্বাধীনতা বলি, বঙ্কিমচন্দ্র তার উপর খুব বেশি জোর দেন নি। রাজা যে দেশীয়ই হোক তাতে যায় আসে না। তিনি মাপকাঠি করেছেন—প্রজার সুখ। রাজনীতির আলোচনায় এই ছিল তাঁর মাপকাঠি। তিনি দুই-একটি শ্রেণীর লোকের শিক্ষা ও গৌরবকে অগ্রাহ্য করেছেন। আপামর জনসাধারণের উন্নতিকেই তিনি প্রকৃত উন্নতি বলে স্বীকার করেছেন। এজন্য সমকালীন রাজনৈতিক কার্যকলাপ যা প্রধানত কংগ্রেসনেতাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। আপামর জনসাধারণের উন্নতির জন্য মুষ্টিমেয় লোকের আন্দোলন, তাঁদের গর্জন, তাঁদের স্বাজাত্যবোধের প্রতি তঁ র শ্রদ্ধা ছিল না। একেই তিনি বাবুদের আন্দোলন বলে বিদ্রূপ করেছেন। বাঙলায় তিনি শিক্ষা ও সম্পদ দাবী করেছেন শ্রমিক ও কৃষকের জন্য—হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত ও রামধন পোদের জন্য। এদেশে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান নেতা বঙ্কিমচন্দ্র। 'নীচ শ্রেণীর প্রজারা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর অধিকারগত বৈষম্য থাকিতে পারে না'—বঙ্কিমচন্দ্র এই মত প্রমাণ ও প্রচার করেছেন। জমির উপর প্রজার অধিকার শাশ্বত; তাই তিনি দাবী করেছেন জমিদার ও ধনীর সঙ্গে কৃষক ও প্রজার সমানাধিকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে তিনি চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলে মনে করতেন এবং এর উচ্ছেদ না হলে এদেশের উন্নতি হতে পারে না, এই সুস্পষ্ট মত তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করেছেন কতকাল আগে। এইখানেই তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র নিছক রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনকে তুচ্ছ করেছেন এবং 'লোক-

রহস্য' গ্রন্থে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অসারতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর কাছে সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে দুটি জিনিস—ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং আপামর জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা। এ শিক্ষা তিনি য়ুরোপের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকেই পেয়ে থাকবেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এদেশে তিনিই বর্তমানকালের সবচেয়ে প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান অগ্রদূত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রবলতম অভিব্যক্তি হয়েছে সাম্যবাদে। বঙ্কিমের রাজনৈতিক চিন্তায় সাম্যবাদ কি তাঁর অজ্ঞাতসারে আভাসিত নয়? জনসাধারণের কল্যাণকে যিনি স্বদেশপ্রীতির মূলমন্ত্র করেছেন, যিনি দেশপ্রীতি ও লোকপ্রীতির সামঞ্জস্য প্রয়াসী ছিলেন, সেই বঙ্কিমের দেশবাৎসল্য বা জাতীয়তা-বোধ নিশ্চয়ই ভাবুকের স্বপ্নবিলাস ছিল না। 'It is Bankim Chandra who taught us that nationalism is not politics but a religion, a creed, a faith.' শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শ এবং তাঁর স্বদেশচিন্তার মর্মকথা সুন্দরভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

বঙ্কিম-প্রতিভার দানে বাঙালীর মানসলোক যে কত ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, তা বলবার নয়। রামমোহন তাঁর স্বজাতির মনে জাগালেন আশা, বঙ্কিম দিলেন আমাদের মুখে ভাষা। বিদ্যাসাগরের গদ্যে আমরা পেয়েছিলাম একটা রসঘন মাধুর্য; বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে সেই মাধুর্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অপূর্ব গতি। যে মাধুর্য পূর্বে ছিল আত্মসমাহিত, তাই-ই এখন দিকে দিকে সঞ্চারিত হল। এই চলমানতাই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরীতির প্রাণ। যে নূতন জীবনচেতনায় সমকালীন মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, যে মুক্তিপিপাসা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে, জীবনের প্রতি যে একটা অপরিমিত মোহ তাকে আন্দোলিত করে তুলেছে, সেই গতি ও প্রাণময়তাই শব্দনির্বাচন এবং সাহিত্যরীতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে। এখানে তাই পরিচিত শব্দও অপরিচিত অর্থে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত। জানা এখানে অজানার মাধুর্য ধারণ করেছে; অর্থাৎ, নূতন চোখ নিয়ে মানুষ জীবনকে উপলব্ধি করতে চাইছে নূতন সঙ্গীতে, নূতন ভঙ্গীতে। বঙ্কিমের ভাষা তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। জীবনকে তিনি শুচিশুভ্র করে পরিচ্ছন্ন করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তাই তো তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল

এমন একটি ভাষা যাকে আশ্রয় করে একটি জাতির শতাব্দীর সাধনা সার্থকতা-লাভের পর, তার ঈপ্সিত চরিতার্থতার পথে উত্তীর্ণ হল। বঙ্কিম-প্রতিভার সৃজনীশক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে তাঁর ভাষা, তাঁর প্রকাশভঙ্গী।

বঙ্কিম-সৃষ্ট ভাষার তাৎপর্য বুঝতে হলে একটু ইতিহাসের কথা বলতে হয়। একথা সুবিদিত যে, ধর্মবিপ্লবের সূত্র ধরেই বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি হয়, আর সেই গদ্যের সৃষ্টিকর্তা একজনই। তিনি রামমোহন রায়। এই বিপ্লব ঘটেছিল বলেই না বাঙলা সাহিত্যের অমন দ্রুত উন্নতি দেখা গেল। একমাত্র ইংলণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনো দেশের ইতিহাসে আমরা এই জিনিস দেখতে পাই না। চৈতন্যদেবের সময় আমরা একবার এই জিনিস প্রত্যক্ষ করেছিলাম; তখন বৈষ্ণব ও শাক্তের বিবাদের ফলে, অনেকগুলি বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব ঘটে। ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ দেখা দিয়েছিল। এরই পরিণতি—একাধিক প্রতিভার আবির্ভাবে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি। তেমনি বাঙলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ বাধল তখনই মৃতপ্রায় বাঙলা সাহিত্য পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছিল। এই পুনর্জীবনকে ত্বরান্বিত করে দিল মুদ্রাযন্ত্র। এই মুদ্রাযন্ত্র ইংরেজ নিয়ে এসেছিল। এই ঘটনা পলাশির যুদ্ধের বিশ বছর পরের কথা।

ধর্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয় ছিল রামমোহনের নিজস্ব প্রেস। বেদান্ত ও উপনিষদ্ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করলেন রাজা। এই অনুবাদ বাঙলা গদ্য তথা সাহিত্যে নিয়ে এলো নবযুগ। বাঙলাভাষা উন্নতির পথে প্রবাহিত হল। পদ্যের শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে এলো গদ্যের যুগ। তারপর এলেন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার। এলেন প্যারীচাঁদ। রামমোহনের যুগের পর বিদ্যাসাগরের যুগ। এই যুগেই প্রথম বাঙলা উপন্যাস, প্রথম বাঙলা নাটক আমরা পেলাম। তথাপি এ যুগ অনুবাদের যুগ। তারপরেই বাঙলাভাষায় এলো তৃতীয় যুগ—বঙ্কিমের যুগ। তিনি এসে প্রবাহিনীতে বান ডাকালেন। বিদ্যাসাগরের যুগে বাঙলা গদ্য অনেক উন্নতি করল বটে, কিন্তু আদর্শ বাঙলার সৃষ্টি হল না, হল বঙ্কিম-যুগে—সৃষ্টি করলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। এই ভাষা-সংস্কার বঙ্কিমের প্রধান অক্ষয় কীর্তি।

তিনি সংকল্প করেছিলেন, ইংরেজীভাষাপ্রিয় কৃতবিদ্যগণকে বাঙলাভাষা পড়াবেন, বাঙলাভাষা শেখাবেন। তিনি সেই ব্রত উদযাপন করেছিলেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য-প্রয়াসের মূলে ছিল এই মহৎ প্রেরণা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের দেবদত্ত প্রতিভার সাক্ষী তাঁহার সৃষ্ট ভাষা।' যে ভাব, শক্তি, লালিত্য, কবিত্ব আর উপমা বাঙলাভাষায় এতকাল অপরিচিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেসব একে একে সৃষ্টি করে বাঙলাভাষাকে সুশোভিত করলেন। বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে তিনি ভাষার সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সারল্যেই ভাষার সৌন্দর্য—এই-ই ছিল তাঁর আজীবনের অভিজ্ঞতা। বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় গদ্যরচনায় মুগ্ধ হয়ে বহু-ভাষাবিদ্ অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন:

মরুতে ফোটাল কেবা রক্তিম গোলাপ,
গদ্যে কে শুনেছে এত মধুর আলাপ?

রক্তিম গোলাপই বটে। এই একটিমাত্র উপমাদ্বারা বঙ্কিমের ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য শ্রীঅরবিন্দ যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা আর কেউ পারেন না। কল্পনার স্ফটিক-আধারে হৃদয়ের গাঢ় অনুরাগ আর অন্তরের উষ্ণ অনুভূতি মিশিয়ে এমন প্রাণ-প্রোজ্জ্বল গদ্যরচনার সৃষ্টি বাঙলাসাহিত্যে আজো বিরল। বাঙলাসাহিত্যে বঙ্কিমকে বলা হয়েছে যৌবনমুক্তির শিল্পী; বাঙালীর যৌবনমুক্তির বিধাতা তিনিই। কল্পনাতীত মাধুর্য আছে তাঁর ভাষায়—সেই মাধুর্য দিয়েই তিনি তাঁর স্বজাতির জীবনের পথ-রেখা রচনা করেছেন। বঙ্কিমের গদ্যরীতির সঙ্গে বাণভট্টের গদ্যরীতির অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সেই cadence বা ছন্দময়তা, সেই effect সৃষ্টির অনায়াস দক্ষতা বঙ্কিমের গদ্যেও আমরা পাই। 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি'—অর্থাৎ গদ্য হচ্ছে কবিদের কষ্টিপাথর। যে অলঙ্কৃত গদ্যের পরম প্রকর্ষ বাণভট্টের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে, বঙ্কিমের গদ্যও ঠিক সেই শ্রেণীর এবং উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তি ভিন্ন এইরকম গদ্যরচনা অন্যের পক্ষে অনায়ত্ত। বাণভট্টের মতোই বঙ্কিমচন্দ্র তাই একাধারে কথাশিল্পী ও চিত্রশিল্পী। কলমের মুখে কালি না দিয়ে, তিনি কলমের মুখে বিচিত্র রং নিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন। সে রং রক্তিম গোলাপেরই রং।

উনিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে গদ্যরচনায় যাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে [illegible] দেওয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকের মধ্যে যিনি [illegible] বলে পরিগণিত—নীটশে, এমার্সন প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকগণ যাঁকে এক[illegible] থাকেন 'The prince of English prose writers'—তি[illegible] ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যানডোর। এই ল্যানডোর ও তাঁর গদ্যরচনা সম্পর্কে হ্যাভলক এলিস লিখেছেন: 'Here we meet a poet embodying revolutionary aspirations in classic and concrete language, a critic also in the largest sense, a critic of life and of the human spirit as it is expressed in literature...Landor stands among substantial men. To say great things greatly is an achievement on the level of a deed of heroism or devotion, It stirs the pulses of blood and lifts the common lives of men into a larger and sweeter air.' * বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। মহৎ বিষয় মহত্তরভাবে কেমন করে প্রকাশ করতে হয় ভাষা কেমন করে আমাদের রক্তে শিহরণ জাগাতে পারে, প্রকাশভঙ্গী কেমন করে সাধারণ জীবনকে উচ্চতর ও মধুরতর স্তরে উন্নীত করতে পারে—জীবন মন্ত্রে সিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বাঙলাসাহিত্যে তারই সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে আছে। আসল কথা এই যে, বঙ্কিমের ভাষার সৌন্দর্যের মূলে আছে ভাব ও ভাষার অপূর্ব পরিণয় যা তাঁর আগের অন্য কোনো বাঙলা লেখকের রচনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। বিদ্যাসাগরের ভাষা নবকিশোরী; সাজসজ্জার বাহার আছে, কিন্তু ভাবাবেশের ছায়া তার মুখে চোখে তখনো ফুটে ওঠেনি। বঙ্কিমের রচনার ভাষা মুগ্ধা যুবতী তুল্যা; বড়ো স্নিগ্ধ, বড়ো চিত্তাকর্ষক অথচ যেন আপনার পূর্ণ লাবণ্য ব্যক্ত করতে সঙ্কুচিতা। শ্রীঅরবিন্দ বৃথা বঙ্কিমের ভাষাকে রক্তিম গোলাপের সঙ্গে তুলনা করেন নি। আমরা দেখেছি, জীবন-মূল্যের আবিষ্কারে আযৌবন বঙ্কিমচন্দ্র অগ্নিজ্বালাময় তপস্যায় রত ছিলেন; তাই তো আমরা তাঁরই সাধনায় যুগপৎ দেখতে পাই রেনেসাঁ-

* Introduction to the Selected writings of W. S. Landor: Edited by Havelock Ellis.

সমৃত্তর বাঙলাসাহিত্যে বাঙালী জীবনের যৌবনমুক্তি আর যৌবনদীপ্ত আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বর্ণদ্যুতি আজো তাই রক্তিম গোলাপের মতোই অম্লান। বঙ্কিম পুরাতন হয়েও আজো নবীন, ক্লাসিক হয়েও আধুনিক। ল্যানডোরের মতো তিনিও দাবী করতে পারেন :

I have since written what no tide
Shall ever wash away, what men
Unborn shall read o'er ocean wide.

বঙ্কিম-জীবন-পরিক্রমা শেষ হল।

বঙ্কিম-প্রতিভার কথাও কিছু আলোচিত হল।

তাঁর জীবন-পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি শতাব্দীকেও পরিক্রমা করে এলাম, বলা চলে। সেই উনবিংশ শতাব্দী (অথবা বাঙলা ত্রয়োদশ শতাব্দী) বাঙলা তথা ভারতের একটি স্বর্ণযুগ। এই শতাব্দীর বাঙলাদেশের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে আমরা কি দেখতে পাই? তিনটি প্রধান আন্দোলনের দ্বারা এই শতাব্দীর বাঙলাদেশ [illegible] মহিমান্বিত হয়েছে, যথা—ভাষা সংস্কার, ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার। এই শতাব্দীতে বাঙলা দেশে বহু মনীষীর আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপ্রয়াস দ্বারা জাতির স্তিমিত জীবনে এসেছে নবীন প্রাণের বসন্ত। এঁদের মধ্যে ইতিহাসে অনেকেরই যুগপৎ ছিল যুগ-স্রষ্টা ও পথিকৃতের ভূমিকা। কিন্তু এই শতাব্দীতে আবির্ভূত বিশাল মনীষী-সাগর যদি মন্থন করা যায়, তাহলে আমরা এমন পাঁচটি রত্নকে পাই যাঁরা শুধু অসাধারণ প্রতিভাশালীই ছিলেন না—যাঁরা তাঁদের স্ব স্ব সৃজনধর্মী প্রতিভা দ্বারা বাঙালী তথা ভারতবাসীকে নূতন পথের বার্তা শুনিয়েছেন, দিয়েছেন নূতন জগতের স্বপ্ন আর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন নূতন সত্যের সঙ্গে।

সেই পাঁচটি পুরুষ-রত্ন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র। পূর্বোক্ত তিনটি আন্দোলন আর এই পাঁচটি প্রতিভা, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাসকে পাওয়া যায় এরই মধ্যে এবং এঁদেরই

মধ্যে। অন্য যেসব আন্দোলন, সেগুলি ঐ তিনটির শাখা-প্রশাখা মাত্র এবং আর যেসব মনীষী এসেছেন, তাঁরা অল্পবিস্তর এই পাঁচজনের ছায়া বা প্রতিধ্বনি। কিন্তু এই পাঁচজনই বাঙলায় নবযুগের প্রকৃত স্রষ্টা। নবীনের বিদ্রোহ অথবা প্রাচীনের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস—এর নাম নবযুগ নয়। নবযুগের প্রকৃত সংজ্ঞা হল—নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পুরাতনকে নবরূপ দান। এই নবরূপ তখনি পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তা জাতির দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্মের ভিতর দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত হয় এবং ইতিহাসের নিয়মই এই যে লোকোত্তর প্রতিভাকে আশ্রয় করেই নবযুগের আবির্ভাব ঘটে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র—এই পাঁচজনই উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চ-প্রধান।

জ্ঞান-বুদ্ধিতে রামমোহন,
হৃদয়ের বিশালতায় বিদ্যাসাগর,
কাব্যের গরিমায় মধুসূদন,
সাগ্নিক প্রেরণায় কেশবচন্দ্র,
আর প্রতিভার প্রসন্ন দীপ্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র—

এই পাঁচজনই তো নবজাগরণকে তার ইতিহাস-অভিপ্রেত সিদ্ধির পথে, ঋদ্ধির পথে নিয়ে গিয়েছেন; আর পৌঁছে দিয়েছেন জাতিকে উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে। উনিশ শতকের বাঙলার ইতিহাস এঁদেরই কার্যকলাপে পূর্ণ আর এই পাঁচজনের প্রতিভাই ছিল বহুমুখী। এই পঞ্চ-প্রধানকেই আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার যুগমানবরূপে অভিহিত করব। এঁদের প্রত্যেকেই জাতীয় জীবনের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই সঞ্চারিত করেছিলেন নূতন ভাবধারা যার ফলে এক বলিষ্ঠ আত্মচেতনায় জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জাতির ইতিহাসে যে যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, সে যুগান্তরের প্রাণান্ত বিক্ষোভকে নবজীবনধারায় নূতন সৃষ্টির পথে প্রবাহিত করিবার জন্য যে প্রতিভার ও মনীষার স্ফুরণ আমরা ঐ যুগে নানা ভাবে হইতে দেখিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রে তাহাই সার্থক হইয়াছিল।' *

জাতীয়-জীবনের সেই স্বর্ণযুগের শেষার্ধের শেষ প্রতিভা, শ্রেষ্ঠ বাঙালী

* বঙ্কিম-বরণ : মোহিতলাল মজুমদার

বঙ্কিমচন্দ্র। আমরা দেখলাম, কাঁটালপাড়ার বাঁকাচাঁদ কেমন করে কলায় কলায় পূর্ণতা পেয়ে, রাকাচাঁদে পরিণত হল—পরিণত হল 'শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদী'-তে আর সেই চন্দ্রিমায় সমুদ্ভাসিত হয়েছে বাঙলার মানস-গগন, বাঙালীর চিত্তলোক। দেখলাম, তাঁর জীবনব্যাপী সারস্বত সাধনার ভিতর দিয়ে জগৎ ও জীবনবোধের, মানবপ্রীতি আর দেশপ্রীতির নবদৃষ্টিভঙ্গী স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হয়ে গেল তাঁর স্বজাতির জীবনে, তাদের প্রতিদিনের কর্মে ও চিন্তায়। দেখলাম, অকুণ্ঠ সত্য-প্রীতি এবং জীবনকামনায় পরিশুদ্ধ একটি প্রতিভা সৃষ্টির যাত্রায় কেমন করে দিয়ে গেলেন 'অনাগত যুগের পাথেয়' যা অবলম্বন করে আমাদের অগ্রগমনের পথ হল বাধামুক্ত। জাগরণ-যজ্ঞের প্রথম হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান করে রামমোহন একদিন যে প্রচণ্ড বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, আমরা দেখলাম, বঙ্কিম-প্রতিভার প্রাণদ স্পর্শে সেই বহ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল বাঙালীর সমাজে, তাঁর সাহিত্যে ও ধর্মে। দেখলাম সর্বাঙ্গীণ জীবনের বিলাস আর বিস্তারকে গ্রহণ করে বাঙলার সমাজ-জীবনে একটি মানুষ কেমন করে নিয়ে এলেন প্রবল বেগ আর ঊর্মিলীলা, নূতন সুর আর নূতন বাণী।

মিলটন সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন :

In his hands
The thing became trumpet, whence he blew
Soul-animating strains—alas, too few!

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও আমরা এই উক্তি প্রয়োগ করতে পারি।

নবযুগের নূতন মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ও উদ্গাতা কবি, নব মানবধর্মের প্রবর্তক, পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রবক্তা, বরুরুচি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম।